উড়োচিঠি

দিব্যেন্দু পালিত

জ্যোতি প্রকাশন
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ।। কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৮

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
দি তারকেশ্বর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯/৬, নরসিং লেন
কলিকাতা

হাওয়ায় ভোরের গন্ধ; ঘাস পাতা ভিজে ধুলোয় মেশা সেই গন্ধ ছাপিয়েও, তবু, আর একটা গন্ধ বার বার অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে তাকে। মেয়ে হওয়ার গন্ধ, মা হওয়ার গন্ধ। মেয়ে হলে মা হতে হবে। হালকা পায়ে পার্কের রেলিং ঘেঁষে আরও অনেকটা চলে এসে যখন হঠাৎই আবার নার্সিং হোমের বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল, বাড়িটা চোখে পড়লেও ঠিক কোন ঘরটায় তারা ছিল চিনতে পারল না—যেতে যেতে ভাবল টুপুর, গন্ধটা একটানা। কিংবা মেয়ে হওয়া ও মা হওয়ার মধ্যে গন্ধের তফাতটুকু এতোই সূক্ষ্ম, কিংবা ডেটল, বরিক-তুলো আর লাইজলের গন্ধে মিশে এমনই এলোমেলো যে, তফাতটা সত্যিই ধরা যায় না। বুঝে নিতে হয়। কিংবা ধরা যায় মুখের দিকে তাকিয়ে, বুকের দিকে তাকিয়ে। একটু আগে নীলাকে দেখে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে সে। কতো সহজে বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নিল ছোট বউদি—যেন এই রকমটিই সে করে আসছে এতোদিন। তারপর নার্স যখন বলল, 'এখনো দুধ দেবার সময় হয়নি, হলে বলে দেব—', সেই মুহূর্তে, মনে পড়ল, চোখে কেমন ঝিমুনি এসেছিল নীলার, মুহূর্তের জন্যে আলস্যময় ঘোলাটে চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। ঠিক যে তাকেই দেখেছিল তা নয়; তবু এক রকম অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল টুপুর। লজ্জায়? হয়তো। এতোটা পরে সব মনে থাকার কথা নয়। শুধু মনে আছে, হঠাৎ শীতের মতো কী একটা ঢুকে পড়েছিল শরীরে। তখনই সে চলে আসার কথা ভাবে। কোনোদিকে না তাকিয়েই দেয়ালকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'চলি—'

তখনই কোনো উত্তর দেয়নি নীলা। দেবার কথাও নয়। ওর বাচ্চাকে বুকে ধরে রাখার একাগ্রতা থেকেই টুপুর বুঝেছিল, নীলার জগৎ ছোট হয়ে এসেছে—এখন নিজেকে উজাড় করে দেবার চেষ্টা করছে; টুপুরের থাকা না-থাকায় কিছু যাবে আসবে না। আশ্চর্য, কিছু না বুঝেও এই কথাটি সে ভেবেছিল কী করে!

লেবার রুম থেকে নীলাকে এখানে আনবার পর মাসীমা সেই যে সোফার ওপর ঘুমোতে গেল সুখে, তাঁর ঘুম ভেঙেছে এই একটু আগে। এখন ক্যাবিনের লাগোয়া টয়লেটে। রাত দেড়টায় ডেলিভারির খবর পাবার পর ছোড়দা আর দাঁড়ায়নি; সকালে ভিজিটিং আওয়ার্সের আগে সম্ভবত আর আসবে না। একা ঘরে অনভ্যস্ত চোখে ছোট বউদির ওই নতুন রূপের দিকে তাকাতে অস্বস্তি হচ্ছে। টুপুর এখন কী করবে!

অনেকক্ষণ পরে নীলা বলল, 'তোমার দাদা কখন আসবে কিছু বলেছে?'

টুপুর আঁচ করল নীলা জানে শেখর কখন আসবে। তবু জানতে চাইছে, হয়তো তার মুখে শেখরের কথা শুনতে ভালো লাগবে। এমনও হতে পারে আর কোনো প্রসঙ্গের অভাব থেকে নীলা এখন যে-কোনো কথা বলত। খবর দেবার মতো করে সে বলল, 'সকালেই আসবে—'

'ওকে বোলো, যা যা আনার সব যেন গুছিয়ে নিয়ে আসে—'

টুপুর ঘাড় নেড়েছিল। জানত, সে কিছু না বললেও ছোড়দা ঠিকই আনত।

'তুমি কি আজ আর আসবে?'

'দেখি—'

'অসুবিধে হলে আসতে হবে না—'

নীলা চলে গেছে একটা আলাদা জগতের মধ্যে। কাছাকাছি বয়সের ননদ, ভাবটা তার সঙ্গেই ছিল বেশী। আগে 'তুই' বলত, আজ 'তুমি'। হয়তো এ-রকমই হয়। একদিনেই অনেকটা বয়স বাড়িয়ে নিল নীলা—বড় চেহারার ভার ঢুকে গেছে মগজেও। যেতে যেতে টুপুর ভাবল, কী আশ্চর্য, এসব সেও ভাবছে; নীলার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও আজ অনেকটা বড়ো হয়ে গেল নাকি!

একটু অন্যমনস্ক ছিল হয়তো। একটু আড়ালে। চোখের সামনে থেকে হুস করে কিছু একটা সরে যেতে সম্বিৎ পেয়ে বুঝল দিন শুরু হয়ে গেছে—ফুটপাথ থাকতেও সে হাঁটছিল রাস্তার ওপর দিয়ে, আর এক হাতের এদিক-ওদিক হলেই বাসটা চাপা দিয়ে যেতে পারত তাকে। কী হতো তাহলে! ভাবতে না ভাবতে ঠা-ঠা রোদ্দুরে হেসে উঠল চারিদিক। সাবধানে হাঁটো, টুপুর, আশপাশের সবটাই কিছু ভোরের মতো স্বচ্ছ, সুন্দর আর নির্জন নয়। ইচ্ছা-হীন নয়। বিপদ জানিয়ে আসে না।

ফুটপাথে উঠতে উঠতে এভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে ভালোই লাগছিল টুপুরের। এই মুহূর্তে বলে নয়, যখনই একা তখনই কি সে কথা বলে না নিজের সঙ্গে! ভোর জড়িয়ে একটু আগে যা যা ভাবছিল—সেই ভাবনাগুলো—সত্যি বলতে সেও তো নিজের সঙ্গে কথা বলা! হয়তো সকলেই বলে, সকলের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ একা করে নেয় নিজেকে। চোখ-কান-অনুভূতি খাড়া করে রাখলে এ-রকম অনেক কথাই শোনা যায়।

রোদ উঠলেও হাওয়ার টান যায়নি। উড়ন্ত আঁচলটাকে সামলাবার ছলে মুঠো-করা ডান হাতটা একটুক্ষণ বুকের সেই জায়গায় ছুঁইয়ে রাখল টুপুর, যেখান থেকে, সে ভাবছিল, ছিটকে বেরোয় কথা। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল, যেভাবে সাবধান হতে হয়। অন্যমনস্কতায় যে ভুল করেছিল একটু আগে, আর তা করবে না। ট্রাফিক সচল; বন্ধ হলে রাস্তা পেরিয়ে ওইদিকের বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াবে। বাসে উঠবে। দূরত্ব বেশী নয়; দেখতে না দেখতে বাড়ি।

দূরত্ব বেশী নয়, তবু, একটু আগে সত্যিই যদি সে চাপা পড়ত ওই ডবল-ডেকারের নীচে, তাহলে কী হতো! কাছাকাছি নার্সিং হোম ছিল, হাসপাতালও দূরে নয়। তবু সে এ-সব জায়গাগুলোতেই যে যেত তার নিশ্চয়তা ছিল না কোনো। থাকলেও, সম্ভবত নিজে টের পেত না কিছু। এই রকম হঠাৎ আঘাতে মেয়ে হওয়া না-হওয়ায় যায় আসে না কিছু। বাসের চোখ নেই, মন নেই, অনুভূতি তো নেই-ই। শুধু আছে গতি, আর পিষে ফেলার ইচ্ছে; কী হলো না হলো তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কোনো। ভবানীপুর থানার সামনে

একদিন এ-রকম একটি বাসকে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল টুপুর, চাপা দেওয়া না-দেওয়ার মধ্যে তফাৎ ছিল না কোনো। কিন্তু ইচ্ছে করলেই যে ঘটনা ঘটাতে পারে তা বুঝিয়ে দিয়েছিল স্পষ্ট। টুপুরের কিছু হলেও সে দাঁড়িয়ে থাকত ওইভাবে। যা হবার হয়ে যেত—তার মানে মৃত্যু, তার মানে সে যা যা হতে পারে, তার কিছুই আর হয়ে উঠত না।

বাব্বা, ভাবলে কাঁটা দেয় গায়ে!

বাসে উঠে, বাসটা ছেড়ে দেবার পর সীটে বসে, অনেকটা সহজ হয়ে এলো টুপুর। অনেকটা খোলামেলা আর নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবল, বেঁচে থাকায় সার্থকতা আছে। হুট করে মরে যাবার চেয়ে ধীরেসুস্থে বেঁচে থাকা অনেক ভালো—অনেক সুখের আর আনন্দের। সুখ কাকে বলে তা অবশ্য সে জানে না। হয়তো এটাই ঠিক, ভালো লাগার ছোটখাটো অনুভূতিগুলো জড়িয়েই সুখ। এই কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ভাবনা যেসব সুখের মধ্যে টেনে নেয় তাকে, তার কিছুই তো পাওয়া হয়নি এখনো! আস্তে আস্তে বয়স যতো বাড়বে, তার অনেকগুলোই ধরা দেবে একে একে—কান্নার আবেগ থেকে যেমন সত্যি সত্যিই ক্রমশ জলে ভরে ওঠে চোখ, টলটল করে, তারপর ঝরে পড়ে এক সময়।

দূর ছাই, এ কি একটা ভাবনা হলো! সুখের কথায় চোখের জলের উপমা আসে কী করে! কথায় কথায় নীলা একদিন বলেছিল, 'তোর বয়সটাই কুড়ি হলো, টুপুর, মাথাটা খুকীর।' ঠিকই বলেছিল। নীলা বোধ হয় সুখের একটা নতুন ধাপ পেরিয়ে এলো আজ। আশ্চর্য, কীভাবে মানুষের শরীরের ভিতর ক্রমশ জন্ম নেয় আর একটা মানুষ; তুলতুলে তার শরীর জুড়ে কান্না ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, অবুঝ তার ঠোঁট দু'টি ঠিকই চিনে নেয় কোনখানে আছে বেঁচে থাকার রহস্য। না, হোক না কান্না, সুখের সঙ্গে কোথায় যেন এর একটা গোপন সন্ধি আছে। কাল রাতে, নার্সিং হোমের বেডে শুয়ে যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল ছোট বউদি, জল গড়িয়ে পড়ছিল চোখ দিয়ে, মাসীমা জিজ্ঞেস করল, 'কষ্ট হচ্ছে খুব!' তখনও তো চোয়াল শক্ত করে মাথা নেড়েছিল নীলা—না, না! এতো যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েও তাহলে ধরা দেয় সুখ! সে কেমন!

ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হলো শরীর। মরে যাবার ভাবনায় যেভাবে কাঁটা দিয়েছিল সারা গায়ে, এই কাঁপুনিটা তার চেয়ে আলাদা। যেতে যেতে নিজের আবিষ্কারে নিজেই অবাক হলো টুপুর। আজ তার হলো কী, কতো সহজে প্রত্যেকটা অনুভূতি চিনে নিতে পারছে আলাদা করে! মরে যাবার ভাবনা থেকে একটুও জট না পাকিয়ে সরে আসছে বেঁচে থাকার ভাবনা—যেন সত্যি সত্যিই মরতে মরতে বেঁচে এলো সে; যেন মরে যাবার যন্ত্রণাটা পুরোদস্তুর টের পেয়েছে বলেই বেঁচে থাকার ভাবনাটা চাগিয়ে উঠছে আরও। চোখের সামনে একটি জন্ম দেখলে কি এ-রকমই হয়! আর কারুর হয়েছে! দেখতে

দেখতে আবার স্পষ্ট হচ্ছে ছোট বউদির চোখ জড়িয়ে আসা, আবেগে অস্ফুট গলা। যেন নীলার একারই নয়, নীলাকে ভাবতে ভাবতে তার নিজেরও শরীরে খুলে গেছে অনেকগুলো পাঁপড়ি। নিজের মধ্যেই বড়ো লাগছে নিজেকে।

কাল রাত ন'টায় তাকে নার্সিং হোমের গেট পর্যন্ত পেঁপছে দিয়েছিল রজত। যাবার তাড়ায় জোর পায়ে হাঁটছিল টুপুর। রজত ঠাট্টা করল, 'এমন-ভাবে হাঁটছিস, যেন তোর জন্যে তোর বউদির ছেলে হওয়া আঁটকে আছে!' এ-সব কথায় গম্ভীর হতে হয়। 'ফাজিল!' টুপুর বলেছিল, 'মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানিস না! যা, বাড়ি যা।' রজত বলল, 'কী করব বল! মেয়ে তো দেখি নি!' কাল না হয়ে আজ হলে রজতকে বলা যেত। যেত? যেত কী! অনেকক্ষণ পরে, ভাবতে ভাবতে, এই প্রথম নিজেকে ধাঁধায় জড়িয়ে ফেলল টুপুর। সব কথা সবাইকে বলা যায় না। এসব কথা তো নয়ই।

ছ'টা বাজেনি এখনো। রোদ উঠলেও ভোর-ভোর ভাবটা লেগে আছে চারিদিকে। রাস্তার দু'ধারের দোকানপাট, বাড়িগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ফুট-পাথ দিয়ে যারা হাঁটছে, তাদের সব্বাইকেই মনে হচ্ছে অনেক দূরে যাবে, পায়ে ব্যস্ততা নেই কোনো। বাসের গা ঘেঁষে সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ছুটে গেল কাগজের হকার। রাস্তা জুড়ে দানা খুঁটছে পায়রারা, বাসের হর্ন শুনে ঝটপট উড়ে গেল সবদিকে। সকালের বাস, লোকজন একেবারেই নেই প্রায়। স্টপে যাত্রী না থাকলে থামছে না, ছুটছে স্পীড তুলে, খানাখন্দে গা ঝাঁকিয়ে। সে এখন নীচে বা আশেপাশে নেই। ঝাঁকুনির জন্যেই সম্ভবত আলস্য লাগছে চোখে, ছোট ছোট হাই গলার মধ্যে উঠেই নেমে যাচ্ছে আবার। আর একটু পরেই নামতে হবে। ভালো হতো যদি এইভাবে ভাবনাগুলোকে নিয়ে চলে যাওয়া যেত অনেক দূর। কিন্তু, না—তা হবার নয়। তুমি যতো দূরেই যাও না কেন, গণ্ডিকাটা দাগটাও ছুটবে সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ি ভরতি পেয়াদা, খোঁজ-খোঁজ পড়ে যাবে চারিদিকে।

এমন নয় যে আজই হঠাৎ তার দূরে যাবার ইচ্ছে হলো; কিংবা একা-একা নিঃসঙ্গ সুখে ভেসে যাবার। টুপুর দেখেছে, যখন আর যেখানেই হোক, এ-রকম ভাবনাগুলো গড়াতে পারে না বেশিদূর। যেতে যেতে হঠাৎই থমকে দাঁড়ায় এক জায়গায় এসে। তখনই মনে হয়, ভাবনাগুলো আছে, গতি নেই কোনো। তখনই মনে হয়, সবই ঘুমের মধ্যে ভাবা, স্বপ্নের মধ্যে দেখা।

নিজের মনে অল্প থিতিয়ে এলো টুপুর। ফুটন্ত বুদ্বুদগুলো ফেটে গিয়ে সর পড়তে শুরু করেছে। মেয়ে হলে মা হতে হয়—একটু আগে সে কি ভেবে-ছিল এ-কথা! নীলাকে দেখে নিজেকেও টেনে নিয়ে গিয়েছিল নীলার জায়গায়! নীলা প্রত্যক্ষ, সে তো তা নয়। হওয়া আর হতে পারা'র মধ্যে এই দূরত্বও তো অনেক দূর। ঠিক ঠিক যাওয়া যায় কি!

ওই দ্যাখো, রাস্তার ধাবে একটি দোতলা বাড়ির জানলা খুলছে। এক পাটের

আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা একটি হাত চোখে পড়ল টুপুরের—চেহারাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই বাসটা তাকে টেনে নিয়ে গেল অনেক দূরে। দৃশ্যটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় একলা হাতটাকেই সে ছুঁয়ে এলো আবার। স্পষ্ট কোনো অবয়ব ধরা পড়ল না।

ফুলশয্যার পরের দিন দুপুরে একা পেয়ে নীলাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বউদি, কী হলো বলো ?'

এক রাতেই চোখমুখ অন্য রকম হয়ে গেছে নীলার; মুখের কথা আর চোখের দৃষ্টি এক হচ্ছে না কখনো। এটা লক্ষ করেই কৌতূহলটা আরও চাগিয়ে উঠেছিল মাথায়। অন্যমনস্ক, হাই তুলতে তুলতে নীলা বলল, 'জিজ্ঞেস করছ কেন!'

'এমনি।' টুপুর বলল, 'আ-হা, বলোই না!'

'এভাবে জিজ্ঞেস করতে নেই—'

'কেন ?'

হাতটা কনুই ভেঙে আড়াআড়ি কপালের ওপর রেখে একটু ভাবল নীলা।

'টুপুর, তোমার জীবনেও একদিন এই দিনটা আসবে। সেদিনই জেনে নিও। আমি যদি সব বলে দিই, সেদিন কোনো মজা পাবে না।'

বলতে বলতে বুকের ওপর আঁচল টেনে দাঁতে নখ কাটতে শুরু করেছিল নীলা। ভারিক্কি এই চালটা অবশ্য ছোট বউদির পুরনো। শুনে, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে টুপুরের হঠাৎ মনে হয়েছিল, তার আর নীলার মাঝখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দিনটা। দিন গুনছে। বেড়ার এদিক-ওদিক যেন। ভাবতে না ভাবতে ওর গাল টিপে দিয়ে হেসে উঠেছিল নীলা।

'তুই খুব সরল, টুপুর। যদি খুব শোনার ইচ্ছে থাকে, আর একদিন বলব।'

টুপুর অবশ্য আর জিজ্ঞেস করেনি কোনোদিন। ভাবত, যদি মজা না পায়! যদি সত্যি সত্যিই হারিয়ে যায় মজাটা, কনুইভাঙা হাতটা অমন সুখী লোকের মতো কপালের ওপর রাখতে পারবে কি!

এগোতে এগোতে, এইভাবে, কতোবার যে সে থমকে দাঁড়ায়! আর যাওয়া হয় না। কিংবা, কিছুই বুঝতে না-পারা একবুক মন-খারাপ নিয়ে ইচ্ছে করে যেদিকে খুশি চলে যেতে। অবেলায় ঘুম ভেঙে উঠে যদি দেখে ঘরবাড়ি খালি করে সবাই চলে গেছে সিনেমা দেখতে—জানলার বাইরে খুব দ্রুত পড়ে আসছে বিকেল, তখন যেমন মনে হয়, সে এখানে কেন!

খুব মন খারাপ করা গলায় রজত একদিন বলল, 'জানিস টুপুর, মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছিরি লাগে সব কিছু! মনে হয় স্যুইসাইড করি।'

'স্যুইসাইড করবি! কোন দুঃখে!'

'তুই বুঝবি না।'

রজত এমনভাবে তাকাল যেন ফেলনা কিছু দেখছে, টুপুর একটা নন-

এনটিটিট। রাগ নেই, তবু কী যেন ছিল চোখে। চাউনি-বদলটা টুপুর বেশ ভালোই বুঝতে পারে।

'বুঝব না কেন! বল?' চকিত বদলটাকে আড়াল দেবার চেষ্টায় নিজেকে আলগা করে দিল টুপুর। পাশাপাশি এই যে ছেলেটা, তাকে দেখে টান হবার কারণ নেই কোনো। তবু যে কেন টানে!

খানিক চুপচাপ হেঁটে রজত বলল, 'তুমি শালা মেয়ে। তোমার কোনো দুঃখ নেই, স্ট্রাগল নেই। পরিষ্কার শাড়ি-জামা পরে ফিটন-চড়া হয়ে ঘুরছ।'

ময়দানের মধ্যে রেড রোড। ব্রিটিশ কাউনসিল থেকে বেরিয়ে হাঁটছিল মাঠের গা ঘেঁষে। টুপুর হঠাৎ থেমে দাঁড়াল।

'শুধু শুধু গালাগালি করছিস কেন! এই জন্যে ডেকেছিলি! তুই কে রে!'

থমকানো ভঙ্গি দেখে মনে হলো রজত এতোটা ভাবেনি। তাড়াতাড়ি সামাল দেবার জন্যে লম্বা হাত বাড়িয়ে পিঠে রাখল টুপুরের।

'রাগ করিস না। অনেকদিন শালা বলিনি কাউকে, তাই বললাম। জেন্ডার ঠিক করলে আরও খারাপ শোনাত।'

আজকাল কেউ গায়ে হাত দি'ল কেমন জ্বালা করে চামড়ার নীচে। ঠিক জ্বালা না হলেও অস্পষ্ট কিছু। শান্ত জলে ঢিস পড়ার মতো কিছু একটা ছড়িয়ে যায়। এমন কি রজতকেও বড়ো লাগে। হাতে জলের গ্লাস এগিয়ে দেবার মুহূর্তে সাবধানে ছাড়িয়ে নিতে হয় আঙুলগুলো।

এই তো কিছুদিন আগে, বিয়ের পর নতুন বর নিয়ে বেড়াতে এসেছিল শর্মিলা। কথায় কথায় বেশ ভাব জমে গিয়েছিল অশোকের সঙ্গে। ওই, কথার মধ্যেই, জলের গ্লাসটা অশোকের হাতে এগিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ কেমন সচেতন হয়ে উঠেছিল টুপুর—অশোকের এগিয়ে আসা আঙুলগুলো হঠাৎ রূপান্তরিত হয়েছিল হাড়ে। স্পর্শ এড়াবার জন্যে দ্রুত আঙুল সরাবার চেষ্টা করতেই গ্লাসটা পড়ে গেল হাত থেকে। কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দে খেয়াল হলো ঠিক হয়নি। 'তেষ্টা বেড়ে গেল--', তারপর, টুপুর যখন কাচ কুড়নোর জন্যে ঝুঁকেছে, অশোক বলল, 'এরপর কিন্তু আর এক গ্লাসে হবে না।' কেন, তা বোঝেনি টুপুর। ছোঁয়া-কাতর এই ভাবটা যতো দিন যাচ্ছে ততোই যেন বেড়ে যাচ্ছে আরও।

রজতের হাতটাকে চটপট সরিয়ে দিতে দিতে একসঙ্গে যতোটা পারা যায় আশেপাশে তাকিয়ে নিল টুপুর।

'রাস্তার মাঝখানে কী যা তা করিস! কেউ দেখলে কী ভাববে বল তো!'

'কী ভাববে! প্রেম করছি! তুই মাইরি হাসালি।' ঝকঝকে ভাব থেকে অন্যমনস্ক হয়ে এলো রজতের গলা, 'কাকা নোটিস দিয়েছে। আমার এখন অনেক প্রব্লেম। তোমার সঙ্গে প্রেম করতে বেরাইনি—'

স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে প্রেম হয় না। কখনো মনে হলে ভাবনাটা নুইয়ে

দেয় তাকে। রজত তার অনেকটাই দেখেছে—ভেবে, টুপুর ফিরে এলো নিজের মধ্যে। আরও দুটো স্টপ, তারপর নামতে হবে। রাত জাগার জন্যে এই যে ঘোর-ঘোর ভাব, এটা কাটানোর জন্যে বাড়ি গিয়ে সোজা উপুড় হতে হবে বিছানায়। অন্তত ঘণ্টাদুয়েক। বারোটা দশের আগে ক্লাশ নেই। এখনও তাব অনেক—অনেক দেরি।

নামবার আগে গলা দিয়ে পর পর অনেকগুলো হাই নামিয়ে দিল টুপুর। তার ধরনে ছিল ওঠার ভঙ্গি; সম্ভবত তাই লক্ষ করে এতোক্ষণ চুপচাপ বসে-থাকা কন্ডাক্টর টিকিট চাইতে এগিয়ে এলো কাছে। টিকিট কাটার নামে, ওই দ্যাখো, এ লোকটাও কেমন দেখে নিচ্ছে তার আঁচল ঠিকঠাক আছে কি না। অতো পারা যায় না!

দিব্যি সকাল হয়ে গেছে চারিদিকে। লোকজন ফুটে উঠেছে এখানে ওখানে। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটরের যা ছুটোছুটি, এখন সাবধানে রাস্তা না পেরোলে নির্ঘাত অ্যাক্সিডেন্ট হবে। এই ভাবনাটায় ভয় নেই—ভিড়ের জন্যেই কি ' ফাঁকা রাস্তায় আচমকা ডবলডেকারটা গায়ের ওপর এসে পড়ায় কী ভয়ই না পেয়েছিল তখন, সত্যি ' এখন মনে হচ্ছে সবই স্বাভাবিক। চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছিল ট্যাক্সিটা. সহজ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল টুপুর। রাস্তা পার হলো। সামনেই ফুটপাথের ওপর লাল লেটারবক্সটা। কাল সন্ধ্যেয় ওইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল রজত। আগেই কথা হয়েছিল। খানিকটা হেঁটে এসে, বাসে ওঠার আগে ওকে এক প্যাকেট চারমিনার কিনে দিয়েছিল টুপুর। দোতলায় উঠে, টিকিট কেটে, ছোড়দার দেওয়া দশ টাকার নোটটা ভাঙিয়ে তার থেকে দুটো দিয়েছিল রজতকে। এটা তার ভালোই লাগে।

'নে ব্যাটা, বেগাব। এটা তোর বকশিস।'

'বাঁচালি, টুপুর। আমার যা অবস্থা যাচ্ছে না!' টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে রজত বলল, 'আশীর্বাদ করি, তোর বউদির রোজ একটা করে ছেলে হোক!'

যখন বলে এইভাবেই বলে। টুপুরের মনে পড়ে সে যখন ফ্রক পরত, তখনই কখনো সখনো রজত তার হাঁটু দেখেছে। হয়তো হাঁটুর ওপরেও খানিকটা। আজকের মতো এতোগুলো শাড়ি ছিল না তখন। এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত রজত; বাসে দেখা হয়ে যেত প্রায়। সরস্বতী পুজোর দিন প্রতিমা সাজাতে গিয়ে ভাব হয়ে গেল। তারও কিছুদিন পরে একদিন পুলিসের গাড়ি এলো স্কুলে। ওরা দেখল, অনিচ্ছুক ছাগলের মতো গলার দড়ি ছিঁড়ে বেরুবার চেষ্টা করছে রজত; জামার কলার চেপে ধরেছে একটা কনস্টেবল, আর একজন টানছে হাত ধরে। বুটের খটখটানি তুলে বেটন হাতে ইনসপেক্টর এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, কোমরের বেল্টে খোলসপরা রিভলবার। স্কুল কম্পাউন্ড থেকে যতোই এগোচ্ছে কালো গাড়িটার দিকে, ততোই চিৎকার করছে রজত,

'স্যার, আমাকে বাঁচান। স্যার, আমি কিছু করিনি—'

গোটা স্কুলের সমস্ত ক্লাসই উঠে এসেছে বারান্দায়। টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হেডমাস্টারমশাই। ইতিহাসের মৈত্রেয়ীদি এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এ কি, মাস্টারমশাই, ছেলেটাকে তো মেরে ফেলবে! আপনি প্রতিবাদ করছেন না কেন!'

'আমি প্রতিবাদ করবার কে! পুলিসের অর্ডার!' বললেন হেডমাস্টার-মশাই, 'একটা নিরীহ ছেলেকে এইভাবে ধরে নিয়ে গেল! জাস্টিস কি আমার হাতে—!'

ওইভাবে গেঁথে গেল রজত। সেদিন কয়েকটা নতুন শব্দ শিখেছিল টুপুর। আর বুঝেছিল, সব ঘটনার পিছনে কারণ থাকে না।

দিনটা মনে আছে আরও একটা কারণে। সেদিন, অসময়ে হঠাৎই সে ভিজতে শুরু করে—লজ্জা মেশানো এক রকম অস্বস্তিতে গরম হয়ে ওঠে মুখের ভিতরটা, অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় থমথম করতে থাকে শরীর। শুধু সেদিনই নয়, তারপর থেকে বেশ কয়েকদিন রাতে ঘুরেফিরে স্বপ্ন দেখত রজতকে। তারপর—

ভুলে গিয়েছিল? হয়তো। সত্যি বলতে, কোন ভাবনা, কার ভাবনাটাকেই সে আঁকড়ে থাকছে! একটু আগে ভেবেছিল ছোট বউদির কথা; ইতিমধ্যে কখন ঢুকে পড়েছে রজত, খেয়ালই করেনি। আবার যাকে নিয়ে শরীর, মন, স্বপ্নের এতো ছড়াছড়ি, দু'তিন মাস যেতে না যেতে সেই রজতই আবার হারিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

আমি তখন রোজই শাড়ি পরি—লিখলে এইভাবেই লিখত। অনেকদিন পরে একদিন বিকেলে সে, শর্মিলা আর ঈপ্সিতা গড়িয়াহাটের মোড়ে ফুচকা খাচ্ছে, ঢ্যাঙা চেহারার রোগাটে একটা ছেলে হাসি-হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা বুঝতেই পারেনি কিছু, ভেবেছিল মোড়ে আড্ডা-দেওয়া দল থেকে কেউ সাহস দেখাতে এসেছে। কাছে দাঁড়িয়ে দু' একটা টিপ্পনী কাটবে, চলে যাবে। শর্মিলাই খেয়াল করল প্রথমে; মুখভর্তি ফুচকায় বিষম খেতে খেতে বলল, 'আ-রে, রজত না!'

'আজ্ঞে, ঠিকই ধরেছেন। আমার নাম রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায়।' স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে, তারপর, ফুচকাওয়ালাকে অর্ডার করল, 'দেখি, এদিকেও একটা ঠোঙা বাড়াও।'

অবাক চোখে রজতের ভাবভঙ্গি লক্ষ করতে করতে টুপুর বলেছিল, 'তুমি বেঁচে আছ?'

'কী একটা প্রশ্ন, মাইরি! আমি গেলাম মরে, আর সেই আনন্দে তোমরা খাচ্ছ ফুচকা!'

ঈপ্সিতা কথা বলে কম, লাজুকও। কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'এতো লম্বা

হয়ে গেছ যে চেনাই যায় না!'

রজত টলল না একটুও। ঠোঙাটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কী করব! পেঁদিয়ে লম্বা করে দিয়েছে। আর কি জানতে চাস?'

ঠিকই, ভুলে গিয়েছিল। তবু, একটু ধরিয়ে দিলেই এ-সব ছবি পুরো-পুরি ধরতে পারে টুপুর। যে-কোনো সময়। (স্মৃতি যেন ডাকনাম, যে যখনই ডাকুক, তাকাতে হবে পিছন ফিরে!) অ্যালবামের ছবিগুলো যেমন, সবগুলোই মনে পড়িয়ে দেয় বয়স, কিংবা বয়সমেশা কোনো কোনো ঘটনা। সেই যে ইজের-পরা খালি গায়ে বাগানে দাঁড়ানো ছবিটা—কেউ জানে না, ডান হাত দিয়ে কেন সে বাঁ হাতের কাঁধ ও কনুইয়ের মাঝামাঝি একটা জায়গা আড়াল করে রেখেছিল! টুপুর জানে। টিকে শুকিয়ে ওই জায়গায় ফুটেছিল চাকার মতো দুটো গোল বড়ো দাগ—যেন ক্যামেরা সবচেয়ে আগে চোখ ফেলত ওই দাগগুলোয়, সে বড়ো লজ্জার ব্যাপার হতো।

দাগ দুটো কবে যে মিলিয়ে গেল খেয়ালই করেনি। তার বদলে অন্য জায়গায় ফুটেছে অন্য দাগ। হাত দিয়ে আর সব আড়াল করা যায় না। সত্যি, সবই কেমন বদলে যায়। সকলেই যায়? কাল এক রকম ছিল ছোট বউদি, আজ একেবারে অন্যরকম। টুপুর শুধু তার বাইরেটাই দেখছে; আর দেখছে শরীর থেকে যে বেরিয়ে এলো তাকে। ভাবলেও সিরসির করে ওঠে গা—যেন সে নিজেই অভিজ্ঞতাটা পার হয়ে এলো। কিছু জিজ্ঞেস করলেই ছোট বউদি বলবে, জানতে চাইছ কেন! তার মানে মজা কেটে যাবে। তাছাড়া, এখন সে বোঝে—অনেক কিছুই বোঝে। এসব কথা অমন খোলাখুলি জিজ্ঞেস করা যায় না।

একটা নিঃশ্বাস চাপল টুপুর। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেমন ভারী হয়ে উঠেছিল বুকটা, হালকা হয়ে নিল। যতো এগোচ্ছে ততোই মন্থর হয়ে আসছে পা দুটো, ঢুলুঢুলু করছে চোখের পাতা। ঘুমোবার জন্যে আনচান করছে শরীর। বাড়ির কান থাকলে বলত, কাছে এসো। রাস্তা যেন আর ফুরোতেই চায় না!

সেদিনও, আরও অনেকটা হেঁটে সে আর রজত গঙ্গার ধারে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসেছিল দোতলায়। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বহুদূর নদীর জল, দূরে কাছে অনেকগুলো জাহাজ—কোনটা কোথা থেকে এলো, কোনটা কোথায় যাবে, তাদের স্থির হয়ে থাকা থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

শূন্য কফির কাপে চুপচাপ সিগারেটের ছাই ঝাড়ছিল রজত। মন খারাপের কথাটা সে আগেই বলেছিল। অনেকক্ষণ পরে, সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে, জিজ্ঞেস করল টুপুর, 'এই জাহাজগুলো কোথায় যাবে বলতে পারিস?'

মুখ না তুলেই রজত বলল, 'সমুদ্রে—'

'এটা একটা উত্তর হলো?'

'কেন হবে না! জাহাজ সমুদ্রেই যায়। গহন, গভীর সমুদ্রে।' চোখ ফিরিয়ে

এবার জাহাজগুলোর দিকে তাকাল রজত, 'আমি এখনই সেখানে পোঁছে গেছি—'

'ন্যাকামি করিস না!' টুপুর বলল, 'চল, ওঠ। সন্ধ্যে হয়ে আসছে—'

রজত যেভাবে উঠে দাঁড়াল, মনে হয় তারই যাবার তাড়া বেশী। টুপুরকে বেরুতে দিল আগে।

সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ধপধপ শব্দ হয়। একাকার হয়ে যায় জলের শব্দের সঙ্গে। পিছন থেকে রজত বলল, 'তোর যাওয়াটা ঠিকই আছে—'

'কোথায়?'

'শ্বশুরবাড়ি।' হালকা গলা রজতের। নীচে এসে বলল, 'তখন আমি এখানে এসে একা-একা জাহাজ দেখব।'

'তুই একটা বিয়ে করে নে, রজত। তাহলেই আর কোনো প্রব্লেম থাকবে না—'

কথাগুলো মনে পড়ায় নিজের মনেই হেসে উঠল টুপুর। সামনে বাড়ি। সিঁড়ি। কলিং বেলে হাত দেবার আগে যতোটা সম্ভব গুছিয়ে নিল নিজেকে। নার্সিং হোম থেকে ফিরছে, জানে, দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষুনি এক-রাশ প্রশ্ন ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। জ্যাঠাইমা, মা, জ্যাঠামশাই, আর— ছোড়দা তো আছেই। বেচারা শেখর। কাল অনেক রাত পর্যন্ত অনেকটা সময় সিগারেট মুখে পায়চারি করেছে গেটের সামনে রাস্তায়। লেটেস্ট বুলেটিন পাঠাবার মতো এক-একবার নীচে গিয়ে খবর দিয়ে আসছিল টুপুর। ডেলিভারি নর্মাল হয়েছে ও দুজনেই ভালো আছে শুনে এমন ভঙ্গি করল, যেন এই ক'ঘণ্টা তার কাঁধের ওপর দু' মণ ভারী পাথর চাপিয়ে রেখেছিল কেউ! বাব্বা, বাবা যেন আর কেউই হয় না—, কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল টুপুরের; বলেনি। হাসতে হাসতে, এইভাবে, কখনো সে জড়িয়ে যায় মায়ায়।

দরজা শেখরই খুলল। উৎসুক মুখ দেখে মনে হয় এতোক্ষণ সে টুপুরেরই অপেক্ষায় ছিল।

'কী ব্যাপার! এতো হাসছিস যে!'

পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে অল্প গম্ভীর হবার চেষ্টা করল টুপুর। স্লিপার দুটো পা থেকে র‍্যাকের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'ছেলে হলো তোমার, আমি শুধু শুধু হাসব কেন!'

ফিরে এসে চুলের গোছা ধরে টানল শেখর।

'খুব ফাজিল হয়েছিস!'

'ছাড়ো, তোমাদের জন্যে সারারাত ধকল সইতে হলো। দশ টাকায় এতো হয় না, বুঝেছ!'

'তাই বল'' শেখর বলল, 'ঠিক আছে। কী চাস বল?'

'বলব ?' কোণাকুণি শেখরের মুখের দিকে তাকাল টুপুর, কিছু ভাবল যেন। তারপর বলল, 'আগে কী দিয়ে ছেলের মুখ দেখবে, সেটা ভাবো। আমারটা পরে হবে। তোমার বউ ওদিকে তোমাকে দেখার জন্যে ছটফট করছেন।'

গলা শুনে মা, জ্যাঠাইমা—দু'জনেই ছুটে এসেছেন ততোক্ষণে। জ্যাঠাইমা বললেন, 'কেমন দেখলি, টুপুর ?'

আড়ে তাকিয়ে টুপুর দেখল চোখেমুখে আগ্রহ নিয়ে শেখর দাঁড়িয়ে আছে তখনো। না শুনে নড়বে না। কিন্তু, ওইটুকু বাচ্চার আবার ভালো মন্দ কী, একটা তুলতুলে মাংসের পিন্ড বইতো নয়, বাকী সবই তো ঝাপসা! কিন্তু সেটা এখানে দেবার মতো খবর নয়।

কিছু একটা বলবার আগে হাসল টুপুর। বলল, 'ছোড়দারই মতো। নাক নেই—'

'নাক থাক না থাক, বংশের বাতি।' মা বলল, 'তুমি মেয়ে, দু'দিন বাদে চলে যাবে বিয়ে হয়ে। ওই-ই থাকবে—'

কোন কথা থেকে কোন কথা। মাকে শুনিয়ে জ্যাঠাইমা বললেন, 'এখন থেকেই আর বিয়ে বিয়ে করে নাচিও না তো, চাঁপা। কর্তা তো বলেই দিয়েছে, ও নিজে না চাইলে বিয়ে দেবে না।'

'তা বললে হয়!' কথাটা পাশ কাটিয়ে গেল মা, 'নে টুপুর, মুখটুখ ধুয়ে নে। চা দিচ্ছি। আমরা আবাব নার্সিং হোমে যাব—'

পর্দা সরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল টুপুর। 'ঠাট্টা-ইয়ার্কি থেকে কথাগুলো কেমন বেঁকে গেল মান-অভিমানের দিকে। এটা হয়, প্রায়ই—যদিও উপলক্ষ থাকে না তেমন। এ-বাড়িতে ছেলেমেয়ের চেয়ে বুড়োবুড়ী বেশী; স্বত্ব নি'য়, তাই, সব সময়েই চলে এক অবুঝ খেলা। কে কাকে ধরে রাখবে, কে যাবে! নীলা হাসপাতালে, তাই শেখর এসে উঠেছে এখানে। না হলে বউ নিয়ে সে থাকে আলাদা ফ্ল্যাটে, আলাদা সংসারে। ছাড়াছাড়ির এই ব্যাপারটা কেউই সহজ মনে নেয়নি। বিশেষত জ্যাঠামশাই। টুপুর লক্ষ করেছে, ছেলে আলাদা হবাব পর থেকেই কথা কমে গেছে জ্যাঠামশাইয়ের।

দেয়ালের দু'দিকে দুটো ছবি। বাবার। আর ডাম্বলের। তার চেয়ে দু' বছরের ছোট। যখন মারা যায় টুপুর তখনও ছোট। অ্যালবামে ছাড়া আর কোথাও কোনো স্মৃতি নেই তেমন। শুধু শেখরকে নিয়ে যখন এলোমেলো দুঃখে চুপ করে যায় সবাই, তখন মনে হয়, হয়তো ডাম্বল বেঁচে থাকলে এই দুঃখটা কাটিয়ে ওঠা যেত। আর মন খারাপ করে ভাইফোঁটার দিনে, যখন অন্য কোনো বাড়ি থেকে ভেসে আসে শাঁখের শব্দ। গতবার, মনে আছে, সারা সকালটা সে কাটিয়ে দিয়েছিল বিছানায় শুয়ে, মাঝে মাঝে ডাম্বলের ছবির দিকে তাকিয়ে। কিন্তু, বাবা এখনো জ্বলজ্বলে। যেন যে-কোনোদিন রাতের

প্লেনে ফিরে ঘুমন্ত তাকে কোলে তুলে নিয়ে শুরু করে দেবে হৈ-চৈ!

এই মুহূর্তে মার দুঃখটা ছুঁয়ে যায় টুপুর। ফর্সা আঁচল দিয়ে কখনো-সখনো মা যখন একমনে বাবা আর ডাম্বলের ছবি দুটো মোছে, বড়ো করুণ লাগে তাঁকে। কী দরকার বিয়েটিয়ের, ভাবে মাঝে মাঝে। স্কুলে দেখেছে, কলেজ ইউনিভার্সিটিতেও দেখছে, বিয়ে না করে অনেকেরই চলে যাচ্ছে দিব্যি। কিন্তু, মা যখন থাকবে না? জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাইও চলে যাবে?

'মাঝে মাঝে সব এমন শূন্য লাগে কেন! কেন মনে হয়, এইসব সম্পর্কের মধ্যে কোথাও আছে অপূর্ণতা, এদের ওপর সত্যি সত্যিই কি আর নির্ভর করা যায়! বরং প্রত্যেককেই আলাদা করে খুঁজে নিতে হয় নিজের জগৎ, নিজের সঙ্গী। কেন, তা ভাবতে গেলে এলোমেলো ভাবনায় জট পাকিয়ে যায় চিন্তা-গুলো, থই পাওয়া যায় না।

চা নিয়ে এলেন জ্যাঠাইমা।

'হ্যাঁ রে, সারারাত তো জেগে কাটালি। আজ কি কলেজ যাবি?'

টুপুর ঘাড় নাড়ল।

'চানটান করে ঘুমিয়ে নেব একটু। ক্লাস তো অনেক দেরিতে—সেই বারোটায়—'

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল টুপুর। জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যে একটাই সরলরেখা; সত্যি, তার নিজের ওপর, ভাবনাগুলোর ওপর কন্ট্রোল নেই কোনো।

'শর্মিলা ফোন করেছিল তোকে—।' দরজার বাইরে শেখরের গলা, 'ফোন করতে বলেছে।'

টুপুর জবাব দিল না। সময় নিয়ে, শেখর আছে না গেছে আন্দাজ করে বলল, 'ছোড়দা, তোমার কি কি নিয়ে যাবার ছিল নার্সিংহোমে, সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে যেও—'

২

ফেনাভর্তি গালের ওপর রেজর বসাতেই হাত নেমে এলো কনুই পর্যন্ত। এতোটুকু জোরের দরকার হলো না। দিশি ব্লেডে এ-রকম মসৃণতা এর আগে লক্ষ করেনি রজতশুভ্র। নাকি তার মনটাই খুশি আছে, এখন যা করবে তাই মনে হবে ভালো--ফুরিয়ে-আসা টিউব থেকে টিপে টিপে পেস্ট বের করার মতো মেজাজ খারাপের সময় যে-কোনো কাজেই যে জোর লাগে, তার দরকার হবে না।

ঘরে আলো কম। আকাশে বোধহয় মেঘ আছে, সেইজন্যে আলোটা কম লাগছে আরও। না হলে আয়নায় নিজেকে অতোটা মলিন দেখাত না। টানা পনের মাস জেলে কাটিয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল চেহারা। প্রায়ই মার খেয়ে আর যা তা চিবিয়ে যখন বেরিয়ে এলো, রোগা, গালভাঙা, ঢ্যাঙা ভাবটা ছাড়া তখন নিজেকে নিজেই আর চিনতে পারত না ঠিকঠিক—শরীরের ভিতর প্রকান্ড এক পুরুষ যেন ঢুকে পড়েছিল ইতিমধ্যে। অবুঝ রাগে সারাক্ষণ রি-রি করত শরীর, চোখে ফুটে উঠত আক্রোশ। আর যখনই এ-রকম হতো, রজত টের পেত, শরীর আর মন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে দারুণ অসহায় ভাব। একদিন না একদিন প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে, ভাবত; কিন্তু কার ওপর এবং কীভাবে, বুঝতে পারত না ঠিক। এই ক'বছরে সেই সারাক্ষণ কুঁকড়ে-থাকা ভাবটা কেটে গেলেও রাগটা যায়নি এখনো। থেকে থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

দাড়ি কামিয়ে, মুখটা ভালো করে দেখার জন্যে আলোর স্যুইচ টিপে দেখল জ্বলছে না, ফিউজ হয়ে আছে বাল্‌বটা। কালও বাড়ি ফিরে দেখেছিল ঢাকা বারান্দায় আলো নেই। ব্যাপারটা তিতিবিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত বাল্‌ব বদলানোর কথা ভাববে না কেউ। এই বারান্দাটা রজতই ব্যবহার করে বেশী, সুতরাং শম্ভুনাথের গরজ হবে না চট করে। যখন তখন আলো নিবিয়ে আর ফিউজড বাল্‌ব না বদলে মিতব্যয়িতার মানে শেখায় শম্ভুনাথ। মিতব্যয়িতা না হাতি। আসলে কঞ্জুষ, হাড় কঞ্জুষ। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেকে খড়্গপুরে হস্টেলে রেখে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াচ্ছে। খরচাপাতি যা করার করছে সল্ট লেকের বাড়িতে। এখন বাল্‌বের কথা বলতে গেলেই অন্য কথা তুলবে। পয়সা আসুক। তারপরেই শুরু হয়ে যাবে বক্তৃতা।

আলোর অভাবে মুখের ঔজ্জ্বল্য খুঁজে না পেলেও সদ্য-কামানো গালে হাত বুলিয়ে খুশি হলো রজত। গাল ফুলিয়ে শিস দিতে লাগল। কথায় কথায় বক্তৃতা দেবার ব্যাপারটা ছাড়া শম্ভুনাথকে খারাপ লোক বলা যায় না। নিজের কাকা বলে নয়, সত্যি বলতে, ঠিক এতোটা কেউ করে না। সে জেলে থাকতে থাকতেই কৃষ্ণনগরে দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিল বাবা। রিটায়ার করেছিল তারও অনেক আগে। দাদা উঠে গেল সরকারী ফ্ল্যাটে। ছাড়া পাবার পর দাদা তাকে সঙ্গে রাখতে রাজী হয়নি। সরকারী চাকরি, তার ভয়-ভাবনা আছে; এমন ছাপ-মারা একটা ভাইয়ের সঙ্গে থাকা মানেই যখন-তখনের ঝুঁকি। আসলে দাদা আলাদাই থাকতে চেয়েছিল। রজতকে রাখা মানে শুধু কিছুদিনের জন্যে পোষা নয়, যতোদিন না পাশ করে চাকরি পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে ততোদিন তার সমস্ত হেপা পোহানো। এই অবস্থায় কাকাকে ধরেছিল বাবা। এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল শম্ভুনাথ।

দেখতে দেখতে পাঁচ ছ' বছর কেটে গেল এখানে। আরও কতোদিন কাটাতে হবে জানা নেই। তবে বেশীদিন নিশ্চয়ই নয়। আর এক-দেড়টা বছর কোনো-রকমে কাটাতে পারলেই এম-এ-টা তরে যাবে। তারপর একটা চাকরি, তারপর নিজের মতো করে জীবনটাকে ভাবা। অনীশদা বলেছে, মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করতে পারলে এই বাজারেও একটা চাকরি জোটানো খুব অসুবিধে হবে না। জোরটা, রজতের মনে হয়, অনীশদার নিজেরই। মাসে ষাট টাকার টিউসনটা জুটিয়ে দিয়েছিল এক কথায়। ভাগ্যিস দিয়েছিল, এই এক্সট্রা ইনকামটা আছে বলেই রজতবাবুর ব্যালান্সশীট রেড শো করছে না এখনো। না হলে মাসে মাসে দাদা যে ষাট টাকা দেয়—অর্থাৎ দৈনিক দু' টাকা, তা দিয়ে চালাতে হলে শনিপুজোর থালা পাততে হতো রাস্তায়।

এ-সব যখন আলাদা করে ভাবে, কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে রজতের। যারা ভালোবাসে বা একটু দয়ামায়া দেখায়, ইচ্ছে করে তাদের জুতো পালিশ করে দিতে। তখন মনে হয় ভাগ্য ব্যাপারটা সত্যিই ভুয়া নয়--অলক্ষ্যে থেকে ভগবান বা কেউ একটা কার কী হবে তার ছকটা পালটে দিচ্ছে ক্রমাগত। যদি তা না হতো, তাহলে, এই যে অনীশদা—অনীশদার মতো একটা মানুষকে সে পেত কী করে! নিতান্তই দাদার বন্ধু ছিল, কালেভদ্রে আসত বাড়িতে। শরতের ভাই হিসেবে তাকে চিনত বা চিনত না। তারপরেই, সম্পর্কটা যেন বদলে গেল কী করে! পুলিসে টেনে নিয়ে যাবার পর প্রায় তিন মাস বাড়ির লোকজন বা চেনাশোনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। প্রথম দেখা করতে এলো অনীশদা; বলল, সহ্য করে থাক, আমি তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। মনে আছে, অযাচিত এই আশ্বাসে কান্নায় গুমরে উঠেছিল সে। তারপর থেকে অনীশদাই আসত, প্রায়ই; বার দুয়েক বাবাকে এনেছিল সঙ্গে। দাদা আসেনি। জেল থেকে বেরিয়ে দেখতে পেল দাদার একটা নতুন ছেলে হয়েছে; তার

মানে, সে যখন জেলে দাদা তখন নিজের মনে ছেলে তৈরি করছিল। হয়তো এইরকমই হয়; রক্তের সম্পর্ক-টম্পর্ক এগুলো শুধুই কথার কথা—ঠেকায় পড়লে বোঝা যায়, ঠেকায় পড়লে যার যার ভিতরের চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। অনীশদার মধ্যে থেকেও, সত্যি, একটা আলাদা চেহারা বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর, এই টিউসনটা না পেলে দৈনিক দু' টাকার হিসেবে কী করত সে! কাঁচ কচি দাড়ি রাখত, ছেঁড়া, ময়লা জামার কলার উঁচিয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরত রাস্তায়। দৈনিক চার টাকার হিসেবটাই কি খুব মধুর! দুঃ-শা-লা, এর চেয়ে একটা লেবার ক্লাসে-ট্লাসে জন্মালে ভালো হতো, খালি গায়ে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ানো যেত রাস্তায়—ইনহিবিসন থাকত না কোনো। জেলে, যেদিন মারের চোটে তার কনুইয়ের ওপর মাংস ফেটে রক্ত বেরুচ্ছিল, প্রায় জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছিল সে, সুখন নামে একটি ছেলে বলল, ভদ্দরলোকদের ছেলেদের লাগে বেশী। নরম চামড়া তো! আমাকে দ্যাখো, খুন করেছি, কিন্তু সাবুদ নাই কোনো। খালাস হয়ে আবার শালা খুন করব! রজত ভেবেছিল, সে খুনটুন করেনি কোনো, জানেই না কেন ধরে আনা হলো তাকে। তবে যদি ছাড়া পায়, খুন তাকেও করতে হবে।

ঠিকই বলেছিল সুখন--ভদ্দরলোকের ছেলে! তাই এতো বায়নাক্কা! শক্ত হয়ে ওঠা চোয়াল দুটো আলগা করতে করতে প্রায় হারিয়ে-যাওয়া খুশির ভাবটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল রজত। ছেলে তো নয়, বাচ্চা! নামের বাহারেই চিনিয়ে দিচ্ছে মাখনতোলা জিনিস একখানা! কেষ্টনগর থেকে পাঠানো বাবার চিঠিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা থাকে—শ্রীমান রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায়। একা রজতে থই মেলে না, তার সঙ্গে আবার শুভ্র এসে জুটেছে! ইনহিবিসন আসবে না! এ-সব ভাবলেই তো ঠান্ডা মেরে যায় সবকিছু!

একদিন বৃষ্টিতে, মনে আছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে রিক্সায় উঠেছিল সে আর টুপুর। এমনি, খেয়াল হয়েছিল, তাই। ইচ্ছে ট্রাম-রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে নেমে পড়বে। কিছুটা জোরই করেছিল সে; আর, তার মনের কথাটা বুঝেই যেন হ্যান্ডেলে ঠুং-ঠাং ঘণ্টি মারতে মারতে পিছন পিছন হেঁটে আসছিল রিক্সাটা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে জোর ছিল না তেমন, টুপুরও রাজী হয়ে গেল। ওই সিকি মাইল রাস্তা যেতেই রিক্সাওয়ালা দু' টাকা চাইল। রজত বলেছিল, 'হামলোগ স্টুডেন্ট হ্যায়। কনসেশন রেট বোলো—'

রিক্সাওয়ালা বলল, 'কনসান কেয়া বাবু, হাম ভি তো গরীব আদমি—'

টুপুর বলল, 'চ চ। আমার কাছে আছে, দিয়ে দেব---'

'তুই কেন! আমার প্রেস্টিজ নেই!'

'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে—', টুপুর বলল, 'রিক্সাভাড়া নিয়ে দর-দস্তুরে প্রেস্টিজ এমনিতেই থাকে না।'

'দেখ, ভাই', তখন রিক্সাওয়ালাকে বলল রজত, 'যদি দু' টাকা লেগা তো এই মহিলাকো গলার হার ছিনতাই করকে ভাড়া দেনা পড়ে গা। এক টাকা মে জায়গা?'

তাতেই রাজী হয়ে গেল। টুপুর আগে, সে পরে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে মাথার চুল ভিজে গেছে ততোক্ষণে। ওঠবার পর রিক্সাওয়ালা পর্দা নামাতে যাচ্ছিল, রজত হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'দু' টাকা যেদিন দিতে পারে গা, সেদিন পর্দা নামায় গা।' টুপুরকে বলল, 'দিস ইজ কল্‌ড্ প্রেস্টিজ!'

জড়োসড়ো, তবু বলেছিল টুপুর, 'দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল, উঠলে পারতিস।'

'ও ব্বাবা, ট্যাক্সি! ট্যাক্সিতে উঠলেই আমার প্রেম করতে ইচ্ছে করে--'

'ফাজিল!' কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিল টুপুর। তাড়া দিয়ে রজত বলেছিল, 'এই ভাই, জলদি চল। ইয়ে দিদিমণি লজ্জা পাতা হ্যায়—'

'রাস্তা বহুৎ পিছল হ্যায় বাবু—'

'হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো পর্দা নেহি টানা—'

'কী ফাজিল!' হাসিতে ঠোঁট কামড়ে বলেছিল টুপুর, 'এইসব লোয়ার ক্লাসের লোকেদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে লজ্জা করে না!'

'কে লোয়ার ক্লাস!' সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলেছিল রজত, 'ও আমার চেয়ে সলভেণ্ট। দেখবি? রিক্সাওয়ালা, রোজ কেতনা রোজগার হোতা হ্যায়?'

'ও কোই ঠিক নহি হ্যায় বাবু। কভি সাত-আট রুপেয়া হোতা হ্যায় কভি দশ-বারো ভি হো যাতা হ্যায়—'

'দেখলি! আর আমি? নো ফ্লেক্সিবিলিটি। ফোর রুপিজ, ডেলি।'

'সেই জন্যেই—', টুপুর বলেছিল, 'কোনো মেয়েই প্রেম করবে না তোর সঙ্গে।'

'যা বলেছিস—'

শেষবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আনমনে শিস দিতে দিতে সেদিনের গোটা দৃশ্যটা পেরিয়ে এলো রজত। কলেজ দেরিতে। তবু চানটান যা করার সেরে নিতে হবে তাড়াতাড়ি, ন'টা বাজতে না বাজতে ফুরিয়ে যাবে কলের জল। তাছাড়া, এ'তাটা সময় এই চাপা একতলা বাড়িতে থাকলেই কোনো না কোনো কাজে ফাঁসিয়ে দেবে কাকীমা। তার চেয়ে তাড়াহুড়ো দেখানো ভালো। পড়াশুনো ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব পায় এ-বাড়িতে, কলেজ আছে শুনলে কাকীমাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একবার বেরুতে পারলে অজুহাতের অভাব হবে না। আজ টিউসনও নেই। ভাবছিল অনীশদার ওখানে ঘুরে যাবে। বাসস্টপে শিখা বউদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল—'ব্যাপার কি, অনেকদিন দেখি না!' বলতে গেলে বলেই রেখেছে আজ যাবে। সেখান থেকে বেরিয়ে পল্লবদের বাড়ি সেখান থেকে--। হ্যাঁ, অনীশদার বাড়ি টেলিফোন আছে, সেখান থেকে—।

অল্প এলোমেলো হয়ে গেল রজত।

হয়তো ঠিকই বলেছিল টুপুর, প্রেম-ট্রেম করা তার হবে না। অবশ্য সে-জন্যে সে যে খুব চিন্তিত তাও নয়। প্রেম ব্যাপারটা সত্যিই সে বোঝে না তেমন। ভাবসাব দেখে মনে হয় অনেকেই বোঝে। চার-পাঁচ মাস আগে বিয়ে হয়ে গেল শর্মিলার; কিন্তু বিয়ের আগেও বেশ কিছুদিন ধরে ঘোরাঘুরি করেছিল একজনের সঙ্গে। নাকভর্তি সর্দি, অথচ নাক টানা যাচ্ছে না এমন একটা থমথমে মুখে ঘুরত সারাক্ষণ। বিয়ের সময় মনেই হলো না টান-ভালোবাসা ছিল কোথাও। ওর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিল একসঙ্গে, কথা উঠল।

'এক একটা মেয়ে এ-রকমই হয়।' পিনাকী বলল, 'চিট করে—'

'তোকে কেউ করেছে বুঝি!' বেনারসী গায়ে সাজলে মেয়েরা হঠাৎই ভরে ওঠে। হাসিটা আরও মানিয়ে গেল টুপুরকে।

'আমায় করলে রিভেঞ্জ নিতুম।'

পিনাকী সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে দেখে টিপ্পনী কাটল পল্লব, 'কী করতিস! অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়তিস? তারপর ধরা পড়লে রজতের মতো পুলিসের ধোলাই—'

কথাটায় জ্বালা আছে। পল্লবকে শেষ কবতে না দিয়ে গম্ভীর হলো রজত। 'এ সব ডিসকাসনে আমাকে টানবে না—'

ঈপ্সিতা এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ বলল, 'শর্মিলা ঠিকই করেছে। বিয়ে একবারই হয়। সেটা বুঝেসুঝে করতে হয়। সিকিউরিটি আছে কিনা ভাবতে হয়। শর্মিলার বর এঞ্জিনীয়ার, দুর্গাপুরে ভালো চাকরি করে। বিলিতি ফার্ম। গাড়ি আছে—'

চেহারাটা চোয়াড়ে।' পিনাকী বলল, 'গাড়োয়ান মার্কা—'

'চেহারাটাই একটা মানুষের সব নয়। কী বল, টুপুর?'

ঈপ্সিতার গম্ভীর-গম্ভীর ভাব দেখে টুপুর বলল, 'আমি বাবা ওসব বুঝি না। বিযে আসুক, তখন দেখা যাবে—'

ঈপ্সিতা আর টুপুর, তারপর, উঠে গিয়েছিল ট্রামে। অভাবের জায়গাটা ভরে উঠেছিল বেনারসী আর সাজগোজের গন্ধে। সেই হাওয়া টেনে চুপচাপ আরও অনেকটা হেঁটে গিয়ে পিনাকী বলল, 'মেয়েরা অনেক বেশী ম্যাচিওরড্ হয়, বুঝলি। ওদের দেখলি, কিরকম রাইপ লাগছিল আজ—যেন তৈরিই হয়ে আছে বিয়ের জন্যে।'

কথাগুলো কানে নিলেও জবাব দিল না কেউ। খানিক পরে পিনাকী বলল, 'রজত, ঈপ্সিতা কি অন্য কোথাও লাইন দিচ্ছে মনে হয়?'

রজত হাসল। কী বলবে তখনই বুঝে উঠতে পারল না। প্রেম-প্রেম বাতিক আছে পিনাকীর, জানে অনেকদিন ধরেই ওর ঈপ্সিতার ওপর দুর্বলতা। মাঝে

খুব ঘন ঘন ঈপ্সিতাদের বাড়ি যেত। একদিন ঈপ্সিতা বলেছিল, 'যখন তখন ওইভাবে যাও, আমাদের অ্যালসেসিয়ানটা কিন্তু খুব ফেরোসাস!' কথায় কথায় পিনাকীই বলে ফেলেছিল একদিন। তাতে বাড়ি যাওয়া কমলেও হাল ছাড়েনি। নিজেদের মধ্যে তুইতুকারি চললেও ঈপ্সিতাকে 'তুমি' বলে ও। শালা ন্যাকা! চেহারাটা ভালো পিনাকীর, ওর ধারণা ওতেই হবে। লাইফে হবে না! তবে, আজ বোধহয় একটু ঘা খেয়েছে।

ভাবতে ভাবতে রজত বলল, 'শুনলি তো, শুধু রাজেশ খান্না মার্কা চেহারা হলেই হবে না। সিকিউরিটি চাই—বিলিতি ফার্মে চাকরি চাই—'

জবাব না দিয়ে চুপচাপ নিজের ভিতরে গুটিয়ে গিয়েছিল পিনাকী।

রজত ভাবল, পিনাকীর মতো মন খারাপ-করা সমস্যা তার নেই। তবে এটা ঠিক, এরা—টুপুর, ঈপ্সিতা, পল্লব, পিনাকী, চন্দনা, অসিতরা আছে বলেই সে অনেকটা আছে। বাড়ি থেকে বেরুনো থেকে আবার বাড়ি ফিরে আসার মাঝখানের সময়টুকু না থাকলে হাঁফ ধরত নিঃশ্বাসে। একা থাকার সময়গুলোয় কী যেন একটা ভর করে তার ওপর—পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিরতির করে একরকম জ্বালা, জট পাকিয়ে যায় ভাবনাগুলো, মাথাটা, মনে হয়, শূন্য থেকে শূন্য হয়ে যাচ্ছে আরও। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর গোড়ার দিকে খুব হতো এটা। এখন অনেকটা কমে গেলেও জ্বালা-ধরা অনুভূতিটা ফিরে আসে প্রায়ই। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে নিজেকে, কেন! কী করেছিলাম! এইভাবেই থাকতে হবে আমাকে! ভাবতে ভাবতে, চোখের সামনের সাদা দেয়ালটা শুধুই সাদা হয়ে যায় আরও। এ-সব কথা কাউকে বলা যাবে না, বললেও যে বুঝবে তার মানে নেই কোনো। যা করার তাকে একাই করতে হবে।

বাইরে বোধহয় রোদ উঠেছে চড়া। ঘরের মধ্যেটা হঠাৎই আলো হয়ে উঠল। সোঁদা দেয়ালে ফি-বর্ষায় পলেস্তরা খসে যায় অনেকটা করে; অবসর সময়ে চুণ-বালি-সিমেন্ট মিশিয়ে নিজের হাতে প্লাস্টার করে শম্ভুনাথ। এ-বছর এখনো সে-রকম কিছু করেনি, হয়তো চোখে পড়েনি। পরিচ্ছন্ন রোদ্দুর লেগে চুণ-বালিখসা দেয়ালটাই অন্যরকম লাগছে এখন—যেন অসুখের বিছানা ছেড়ে এইমাত্র পা রেখেছে মাটিতে। খানিক সেদিকে তাকিয়ে থেকে চটপট তৈরি হয়ে নিল রজত। শম্ভুনাথের গলা পাচ্ছে; বোধহয় বাজার করে ফিরল। তার মানে কাকীমাও রেডি। বাল্‌বের ব্যাপারটা নিয়ে এখনই বললে ভালো হতো; বলা কি উচিত হবে? একটা বাল্‌ব বই তো নয়, ইচ্ছে করলে সে নিজেই কিনে নিতে পারে। পারে না?

কী আছে না আছে দেখার জন্যে মানিব্যাগটা খুলেছে, দরজার বাইরে শম্ভুনাথের গলা পেল।

'রজত আছ?'

'আছি—।' তৈরি হয়েই ছিল, ব্যস্ত হাতে জুতোর ফিতে বেঁধে বাইরে এলো রজত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শম্ভুনাথ; ধুতি, গেঞ্জি ও না-আঁচড়ানো কাঁচাপাকা চুলে বয়সের চেয়ে বেশী বুড়ো লাগছে এখন। চশমাটা ঠিক যেখানে থাকা উচিত সেখানে নেই। হাতে পাতা-খোলা খবরের কাগজ, মনে হয় পড়তে পড়তেই উঠে এসেছেন।

'কিছু বলছেন?'

বলার আগে আপাদমস্তক রজতকে দেখে নিলেন শম্ভুনাথ। চশমাটা বসিয়ে নিলেন জায়গামতো।

'আজকের কাগজটা দেখেছ? প্রাইভেট টিউটরের বিজ্ঞাপন?'

শুনেই তেঁতো হয়ে গেল মুখটা। শম্ভুনাথের মুড বুঝবার জন্যে যে সময়টুকু দরকার এখন তা পাবে না। টাইমীংয়ে গণ্ডগোল হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি একটা অজুহাত না পেলে বেরুতে দেরি হয়ে যাবে।

গম্ভীর হয়ে রজত বলল, 'না—'

'কেন, দেখনি কেন! কাগজটা তো তোমার মাথার কাছেই ছুঁড়ে দেয়—'

'দেখা হয়নি আজ। পড়ছিলাম।'

'পড়াটা গৌণ। বুদ্ধিমান লোকেরা প্রয়োজনটাকেই প্রাধান্য দেয়। বিজ্ঞাপনটা দেখ, আজকেই যোগাযোগ করো—'

কাগজটা তার দিকে এগিয়ে ধরেছিলেন শম্ভুনাথ, না নিয়ে ঈষৎ পিছিয়ে গেল রজত।

'একটা টিউসন তো করছি। আবার একটা ধরলে পড়াশুনোর ক্ষতি হবে—'

'ক্ষতি হবে!' কিছু রাগ কিছু বিস্ময় মিশিয়ে অদ্ভুত চোখে খানিক রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন শম্ভুনাথ। তারপর, যেন কী বলবেন ভেবে না পেয়ে হাঁটতে লাগলেন পিছন ফিরে। বারান্দায় অনেকদিনের পুরনো একটা ইজিচেয়ার পাতা থাকে সব সময়—কেউ বসে, কেউ বসে না; তবে এই মুহূর্তের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হবে শম্ভুনাথ ওইখান থেকেই উঠে এসেছিলেন। বসে, আর তার দিকে তাকানো প্রয়োজন মনে করছেন না।

'ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে—', থেমে থেমে বললেন শম্ভুনাথ, 'যে একবার খুন করে সে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে না। পড়াশুনো করে কি জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবে! ওই ছাপ দেখে কে দেবে চাকরি!'

রাগটা আসছিল। রজতের মনে হলো শরীরের ভিতরে কোথায় কী একটা ঘটে যাচ্ছে। ঘটনার চাপে বেঁকে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় সে বলল, 'আমি খুন করিনি—'

'হতে পারে; সে আমিও জানি। কিন্তু, পুলিসের খাতায় সে-কথা লেখা আছে, তুমি আমি কেউ তা মুছতে পারব না। এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে।

নিজে ভুগবে, অন্যদেরও ভোগাবে। এখনও ভোগাচ্ছে—'

'ভোগাচ্ছি!' নিজের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার আগে কথা হারিয়ে ফেলল রজত। ছোটবেলা থেকেই এইরকম বা প্রায় এইরকম মুহূর্তে তার সমস্ত অনুভূতি এসে জড়ো হয় চোখে। এখনও তাই হলো। চাপা কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'আগে বললে পারতেন। চলে যেতাম। আমি কাউকে ভোগাতে চাই না—'

'চলে যাবার কথা হচ্ছে না।' একটু জোর দিয়েই বললেন শম্ভুনাথ, এতোক্ষণ পরে তাকালেন রজতের দিকে, 'তোমার বাবার কাছে আমি ঋণী, আমি তোমাকে চলে যেতে বলতে পারি না। কিন্তু, আমিই শেষ কথা নয়। তোমার নিজের দাদাই তো তোমাকে রাখতে চায়নি, মাসে মাসে টাকা দিতেও তার কষ্ট হয়। কে ভাববে তোমার কথা!'

'কাউকেই ভাবতে হবে না—', এতোক্ষণ ধরে তৈরি-হওয়া কথাটা বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। চোয়াল শক্ত করে রজত বলল, 'ভাবার দরকার নেই।'

'ভালো কথা। আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো।'

আর কিছু না বলে অত্যন্ত দ্রুত দরজার দিকে হেঁটে গেল রজত। আড়ালে থেকে কাকীমা বোধহয় শুনছিল সব, এখন হতচকিত গলায় বলে উঠল, 'এ কি, খেয়ে যাবি না!'

'না—'

'কী বলো তো তুমি! কী দরকার ছিল এ-সব কথা বলার!'

'যা বলেছি ওর মঙ্গলের জন্যেই বলেছি।' শম্ভুনাথ উঠে দাঁড়ালেন, গলা কাঁপছিল। বললেন, 'শুধু রাগ দিয়ে সবকিছু বোঝা যায় না।'

দরজা খুলে অল্প দাঁড়াল রজত, পিছনে তাকাবে কিনা ভাবল। না। তার-পর বেরিয়ে, সশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দৌড়ে গেল রাস্তায়।

এখন হাঁটছে। এখন তার মাথায় কিছু নেই। না স্মৃতি, না শ্রদ্ধা, না পিছুটান। কিংবা, কিছু নেই বলাও হয়তো ভুল, এখন শারীরিক আবেগ ছাড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত বোধবুদ্ধি। অ্যাট্রোপিন দেবার পর যা হয়, চোখের মণি দুটো বড়ো থেকে আরও বড়ো হয়ে আশপাশের দৃশ্যগুলিকে ঝাপসা করে দিচ্ছে ক্রমশ। তার পরের কয়েকটা মুহূর্ত কিছুই দেখতে পেল না সে। যেতে যেতেই হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে দুটো হাতে গলার কণ্ঠা চেপে ধরে ওপরে তাকাল, আকাশের দিকে অসহায়ের মতো, ঝলমলে রোদ্দুরে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। এই মুহূর্তে এই মুহূর্তটি ছাড়া তার সামনে আর কিছু নেই। মাথা-ভর্তি অন্ধকারের ছুটোছুটি সহ্য করতে করতে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল রজত। একটুক্ষণ, তার পরে আরও একটু সময়। চারিদিকে এতো আলো, এতো শোভা, এমন স্বাভাবিক ব্যস্ততা—এর মধ্যে নিজেকে এতো একা লাগছে কেন! সত্যি সত্যিই কি তার ভবিষ্যৎ নেই কোনো! যার ভবিষ্যৎ

নেই, বর্তমান আঁকড়ে থাকাও কি তার পক্ষে খুব জরুরী! যে-রঙটা সে চেনে না, সত্যি সত্যিই কি তার ছাপ চিরকাল লেগে থাকবে তার গায়ে। যে খুন হয়েছিল, সে-লোকটাকেও যদি সে চিনত!

ঝাপসা হয়ে আসা চোখের ভিতর দিয়ে দেখা তার চারিদিকের প্রকৃতি ও পরিবেশে আস্তে আস্তে প্রশ্ন ও অভিমানগুলো ছড়িয়ে দেয় রজত। এতো ব্যস্ত চারিদিক, এতো শব্দময় ও স্বার্থপর যে সেগুলো পৌঁছয় না কোথাও। এমনকি, একটু পরে, তার নিজেরও মনে হয় গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সবকিছু—জলের অবরোধ এড়ানোর জন্যে পিঁপড়ে যেমন অবরোধের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত শুধুই শুঁকে বেড়ায় বিষাদ, তেমনি, সমস্যা মনে হচ্ছে বলেই শরীরময় প্রখর জ্বালা নিয়ে সে ঘুরছে তার আশেপাশে, পৌঁছুচ্ছে না কোথাও। শম্ভুনাথ বলেছিল, যা বলছে সবই তার ভালোর জন্যে, কিন্তু, সত্যি সত্যিই, এটা কীরকম ভালো ভাবা! ক্যান্সারের রুগীকে ডেকে বলা, মৃত্যু অনিবার্য, তাই তোমাকে বাঁচানোর জন্যে চলেছে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা! এর চেয়ে যদি মৃত্যুটাই পাওয়া যেত আরও তাড়াতাড়ি, বাঁচা যেত আতংক নিয়ে এই রাজসুখে বেঁচে থাকার অপেক্ষা থেকে! কী করবে? আত্মহত্যা?

ধুৎ! নিজের ভিতর থেকেই একটা হঠাৎ-খুশি সুড়সুড়ি দিয়ে যায় সারা শরীরে, এতো সব আকর্ষণের মধ্যে থেকে যদি মরেই যাই হুট্ করে, তাহলে করা হলো কী! একটা মিথ্যে নিয়ে কী হবে কী হবে ভাবতে ভাবতে ফেটে যাবো দুম্ করে! পুলিস কি তার বাপের চাকর যে খুন করা সত্ত্বেও শেষবেশ ছেড়ে দিল তাকে! এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই নিশ্চয়ই কোথাও আছে একটা খুঁত—ছুরি চালিয়ে সেই ফুটোটাকে বড়ো করতে হবে আরও। সেটাই তার বাঁচার পথ।

বাঁ হাতের ঝটকায় চোখ মুছে নিল, তারপর ডান হাতের ঝটকায় আবার। জুত না হওয়ায় সকালে কামানো গাল ও কপালের ওপর ঘষে ঘষে বুলিয়ে নিল রুমাল—এঃ, একেবারে কেঁদেই ফেলেছিলুম! অনুভূতি বলে দিচ্ছে চোখ দুটো লালচে হয়ে আছে এখনো—হঠাৎ দেখে যে-কেউই বলতে পারবে কিছু একটা হয়েছিল। যদি জিজ্ঞেস করে, কী, সে কি বলতে পারবে, এই, মানে, কাকা বলছিল আর একটা টিউসন করো; তো আমি বললাম, একটা তো করছিই, আর একটা করলে পড়াশুনোর ক্ষতি হবে, তো কাকা তখন বলল, পড়াশুনো করে হবে কি—জজ ম্যাজিস্ট্রেট! তাই থেকেই গরম। তখন জেলখানার ছাপের কথা উঠল। মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল। আমি কি সত্যিই খুনী! কাকা বলল, না। বাবার কাছে ঋণী বলে তাড়াতে পারবে না বাড়ি থেকে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী! এই মাগ্‌গি-গণ্ডার দিনে—যেখানে ফার্স্ট অ্যাভেলেবেল অপারচুনিটিতেই পোঁদে লাথি মেরে বিদেয় করে লোকে, সেখানে একটা লোক ধরে আছে আঁকড়ে, এমন লিবারেল কাকা

কোথায় পাবে! বাবা রজতশুভ্র, সত্যি বলো তো, শম্ভুনাথের সঙ্গে যখন ধুমধাড়াক্কা চলছে, তখন কড়াইয়ের ছ্যাঁকছোঁক শব্দ আর ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ পেয়েছিলে কি না! খুব তো মেজাজ দেখিয়ে বেরিয়ে এলে, ফিরে যাবে নাকি?

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রজত ভাবল, নাঃ, এটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। ফিরে গেলে ওই টিউসনের খোঁজে বেরুতেই হবে তোমাকে। এই তো লাইফের হাল, এনজয়মেণ্ট বলতে কিছু নেই—খালি ঘুরে বেড়াও দুটো রোজগারের ধান্ধায়! ডানায় ইঁট বেঁধে ওড়া যায় নাকি! চেনাশোনার মধ্যে কারুরই এমন কপাল নয়, তারই বা এমন হবে কেন! তাছাড়া, ব্যাপারটা ঠিক শম্ভুনাথকে নিয়ে নয়। ওই ছাপটা আছে, থাকবে; ওই ছাপটা শম্ভুনাথের গায়ে নয়, তার গায়ে। সত্যিই তো, একটা সরকারী চাকরি-টাকরির ব্যাপার যদি হয়, তাহলেই পুলিস ভেরিফিকেশনের প্রশ্ন উঠবে—কোনোদিন কোনো কেসে জড়িয়েছিল কিনা' অ্যাঁ, খুন! পনের মাস কাটাতে হয়েছিল জেলে' সরি, নো ভেকান্সি। উই ওয়াণ্ট এ ক্লিন স্লেট!

অপমানটা নেমে গেছে, এখন আসছে রাগ। ভীষণ রাগ। ইচ্ছে করলে ও হাতে ছুরি থাকলে রজত এখন হাতের শিরাগুলো কেটে ফেলতে পারে। কিংবা, সত্যি সত্যিই খুন করতে পারে যে-কোনো একজনকে। সেই একজনটা কে—কে হতে পারে' এতো বছর পরে মুখগুলি মনে নেই আর, স্মৃতি একাগ্র করে ভাবলেও মনে পড়ে না ঠিক ঠিক। এক একদিন রাতে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে যখন ঘুম আসে না অনেক রাত পর্যন্ত, হঠাৎ বৃষ্টিতে নির্জন আর এলোপাথাড়ি শব্দ ওঠে চারিদিকে, খোলা জানলার লম্বা গরাদগুলোর দিকে তাকিয়ে সে শুধু অপেক্ষা করে চুপচাপ। নৈঃশব্দ্যের শব্দটা ঠিকই আছে, মনে হয়, এবার অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসবে একটি চেহারা—তার কাঁধে রাইফেল, অ্যাটেনসনের ভঙ্গিতে হাঁটু দুটো এক সঙ্গে জোড়া, হাত দুটো মুঠো করা, আদলহীন মুখে নিষ্ঠুর অন্ধকার মাখানো। একটা বরফের টুকরো গড়িয়ে যায় মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে, আস্তে আস্তে; বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর জখম হওয়া জায়গাটা ব্যথা করে ওঠে হঠাৎ। এবড়ো-খেবড়ো মাংসে নিরন্ধ যন্ত্রণাটা একাই সহ্য করে সে—যেন ওই অংশটা তার শরীরের নয়, আলাদা। তবু, মা যেমন শিশুর, তেমনি, একা যন্ত্রণাটা নিজের মধ্যে ক্রমশ টেনে নেয় রজত। আস্তে আস্তে হাত বোলায় জায়গাটার ওপর, নিরুপায় দুঃখে কঠিন হয়ে ওঠে চোয়াল দুটো। জেল থেকে বেরুনোর পর শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতটা পরীক্ষা করে ডাক্তার বলেছিল, নার্ভগুলো ইনজিওরড হয়েছে, কিছু তো করার নেই এখন। মাঝে মাঝে পেন হতে পারে। সেটা সহ্য করতে হবে। এই মুহূর্তে আত্মস্থ, ডান হাতে বাঁ হাতের ওই জায়গাটা চেপে ধরে দুঃখটা পেরিয়ে গেল রজত। অভিজ্ঞতা বলে দেয় ব্যথাটা সব সময়

থাকে না—এক একসময় অনেকদিন ধরে থাকে না, কিন্তু উত্তেজিত হলেই চাগিয়ে ওঠে হঠাৎ।

ট্রাম থেকে নামার পর রজতের খেয়াল হলো ট্রামে উঠেছিল। বোধহয় অন্যমনস্ক ছিল খুব; তবু, বুদ্ধি এলোমেলো হয়নি এতোটুকু। এটাই অনীশদাদের স্টপ। তার মানে টানা প্রায় পনের মিনিট অন্যমনস্ক থাকলেও ঠিক জায়গায় ঠিক সময়টিতে সে নেমে পড়তে পারল। এইভাবে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়টিতে সে যদি সত্যিই পৌঁছে যেতে পারে—এই অপমান আর হার্টশিপের মধ্যে দিয়ে, সত্যি, একটা দারুণ ব্যাপার হয় তাহলে! পারবে না! কি রে, পারবি না? এইভাবে, প্রশ্নটাকে ইচ্ছে করে, একরকম দ্বিধার দুলতে দুলতে ফুটপাথ ধরে খুব শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল রজত। যদি অনীশদার সঙ্গে দেখা হয়, আজ সে স্পষ্টই বলবে কথাটা। এভাবে আর টানা যাচ্ছে না নিজেকে। একটু কিছু করা দরকার—যা হোক একটা কিছু, যাতে সে নিজেই হয়ে ওঠে।

অনীশদা দাঁড়িয়ে ছিল ব্যালকনিতে, আগেই দেখতে পেয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল।

'আয়। অনেকদিন পরে—'

'আপনি বাড়িতে?'

'দু' দিন ছুটি নিয়েছি। একটু জ্বর মতন হয়েছিল, ইনফ্লুয়েঞ্জা। একটু পরে অবশ্য বেরুতে হবে একবার।' দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েও আবার পুরোটা খুলে দিল অনীশ, 'পিকিউলিয়ার রোদ্দুর। আসছে, যাচ্ছে। ওয়েদারটা ভালো, কী বল!'

'ওয়েদার?' ডিভানে বসতে বসতে রজত বলল, 'দেখিনি—'

'হ্যাঁ, তোরা তো আবার এ-সব দেখিস না।' ভিতরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে গলার স্বর তুলল অনীশ, 'শুনছ, রজত এসেছে—।' তারপর বেতের সোফা টেনে বসল, 'চান করতে ঢুকেছে। কাল দেখা হয়েছিল শিখার সঙ্গে?'

সকালের কাগজটা টেনে নিয়ে সটান সেই বিজ্ঞাপনটায় চোখ রেখেছিল রজত। পড়তে পড়তে মাথা নাড়ল।

'কী খবর তোর?'

সিগারেট ধরাচ্ছে অনীশ। দেশলাইটা সম্ভবত ড্যাম্প-ধরা। পরপর দুটো কাঠি নষ্ট হয়ে তৃতীয়টা জ্বলল।

রজত বলল, 'এই—, চলে যাচ্ছে।' বলে আবার কাগজটায় চোখ রাখল এবং ভাবল, মাইনে যতোই দিক, উত্তর কলকাতায় টিউসন করতে গেলে, প্রতিদিনই তার বিকেল আর সন্ধ্যেটা নষ্ট হয়ে যাবে। টিউসন করে যখন বাড়ি ফিরবে—ভাবনাটা সম্পূর্ণ হলো না। রাস্তায় কোনো মোটরের হর্ন ফেঁসে গেছে, একটানা বিশ্রী শব্দটা ঢুকে গেল মাথার ভিতর।

'কী ব্যাপার রে! দেখে মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে!'

ঘুরে তাকাল রজত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাঁজে ভাঁজ করতে লাগল কাগজটাকে। অনীশদার সামনে ধোঁয়ার আড়াল। একটা চোখ আধবোঁজা করে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। ভিতরে ভিতরে একটু নড়ে গেল রজত। আজকাল এ-রকম হয়; যখন যা ভাবে সবই মনে হয় ব্যক্তিগত। এখনও টের পেল, জ্বালাটা ফিরে আসছে।

'অনীশদা, টিউসনে হবে না। আমার একটা চাকরি দরকার।'

'চাকরি! চাস?' কেটে কেটে উচ্চারণ করল অনীশ, 'হঠাৎ?'

'হঠাতের কী আছে!' পিঠ সোজা করে বসল রজত, 'এমন মিজারেবল্‌ভাবে লাইফ কাটানো সম্ভব নাকি! একটা ভিখিরির লাইফও এর চেয়ে সুখ! এভাবে বাঁচা যায় না।'

অনীশ তাকিয়েছিল ওর দিকে। বলল, 'বাড়িতে ঝগড়া করেছিস?'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না রজত। গুটিয়ে নিল নিজেকে। তারপর হঠাৎ বলল, 'আমাকে কেন হাজতে নিয়ে গিয়েছিল বলতে পারেন?'

অনীশ হাসল। মাথা নীচু করে। সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল খানিক।

'লোকে বলবে ভাগ্য। আমি বলি সমাজ ব্যবস্থার গলদ। এখানে এটাই স্বাভাবিক- '

'সমাজ ব্যবস্থা! শালা, শুয়োরের বাচ্চা! আমিও দেখে নেব। আমি সত্যি সত্যিই খুন করব।'

অনীশ দেখল, রজত উঠে দাঁড়িয়েছে, কাঁপছে, মুঠো শক্ত আর চোয়ালটা ভাঙা, চোখ থেকে গড়ানো জলের ফোঁটাগুলো দাঁতে কামড়ানো জিবে টেনে নেবার চেষ্টা করছে প্রাণপণ। যেন এখুনি একটা ভয়ানক কিছু করে ফেলবে! তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ওর কাঁধ দুটো চেপে ধরল অনীশ। চেষ্টা করল বসাতে।

'ছি, রজত! দ্যাটস্ ভেরি ব্যাড! তুই তো ভালো ছেলে, তুই এমন উত্তেজিত হলে চলবে কেন! কী হয়েছে বল আমাকে--ব্যাপারটা বুঝতে দে!'

দু' হাতে মুখ ঢেকে হাঁটুর ওপর নুয়ে এলো রজত। নিজেকে প্রশমিত করার চেষ্টায় ফোঁপাতে লাগল।

'আপনি বুঝবেন না—'

'ঠিক আছে।' ওর মাথায়, পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে অনীশ বলল, 'একটা ইয়াং ছেলের এভাবে নিজের ওপর কন্ট্রোল হারানোও ঠিক নয়। রজত, কাম ইওরসেলফ!'

সেই একই ভঙ্গি, ডান হাত ও বাঁ হাতের ঝটকায় নিজেকে সামলে নিল রজত। তাড়াহুড়ো করে রুমালটা বের করল পকেট থেকে। লজ্জিতভাবে হেসে বলল, 'সরি, অনীশদা!'

অনীশ খুব গম্ভীর। পাশ থেকে উঠে হেঁটে গেল উল্টোদিকের খোলা ব্যালকনির দিকে। হাত থেকে ধোঁয়া উড়ছে, রজত দেখল, ঝুঁকে নীচে তাকিয়ে আছে অনীশ। সত্যি, এভাবে কন্ট্রোল হারানো উচিত হয়নি। তার ওপর ওই যে আজেবাজে কথাগুলো বলে ফেলেছিল—হয়তো আবেগের মাথাতেই, তবু অনীশদা নিশ্চয়ই কিছু ভাবতে পারে। হোপ্‌লেস্‌, আমি একটা হোপ্‌লেস্‌!

'কী, কখন এলে?' পর্দা ঠেলে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল শিখা, ভিজে চুলেব জট ছাড়াতে চিরুনিটা মাথায় ধরা। অনীশের দিকে চোখ যেতে বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি ওখানে!'

অনীশ ফিরে এলো তাড়াতাড়ি, গম্ভীব। একবাব শিখাব দিকে তাকিয়ে, সোজাসুজি দেখল রজতকে।

'তোর কলেজ নেই আজ?'

'যাব।'

'এখানেই খেয়ে যা।' অনীশ বলল, 'শিখা, চট করে চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে এসো তো। আমাকে একটু বেরুতে হবে—'

অনীশের বলার ধরনে শিখা কিছু আঁচ করার চেষ্টা করল। তারপব রজতকে বলল 'বোসো, আসছি—'

হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল অনীশ। বসতে বসতে আবার প্যাকেটটা তুলে নিল হাতে।

'সিগারেট খাবি?'

'না।'

'কেন? খাস তো?'

'আপনি খান—'

'শ্রদ্ধা!'

বেঁকিয়ে হাসল অনীশ। এবার এক কাঠিতেই ধরিয়ে নিল আর একটা সিগারেট।

'তোকে একটা কথা বলি। বলতে পারিস জ্ঞানের কথা—', হাসিটা ছড়িয়ে দিয়ে অনীশ বলল, 'লাইফ, মিজারেবল, এ-সব কথা বলছিলি তো! লাইফ আসলে একটা উড়োচিঠির ব্যাপার। একদিন না একদিন সকলেই পায়। কেউ সুখের খবর পায়, কেউ দুঃখের। যে যেমন পায় সেইভাবেই চলে। জিজ্ঞেস করবি কাকে! কে পাঠাচ্ছে তা তো জানতে পারছে না কেউ! তবে সেটাই শেষ নয়। যার মনের জোর আছে, চিঠির বয়ান সে ঠিক পাল্টে নিতে পারে। অসুবিধে হয়, দেরি হয়, তবু পারে—'

কথাগুলো মন্ত্রের মতো মিশে যাচ্ছে কানে। অনীশদা কথা বললে এক-রকম জোর পাওয়া যায় মনে। কেন, সে জানে না। হয়তো এটাই সত্যি, আজও সে এই জোরটা পাবার জন্যেই ছুটে এসেছিল এখানে। মাঝখান থেকে সব

কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল! মাথা নীচু করে আপাতত অনীশের কথায় কান পেতে রাখল রজত।

'নার্ভ টেন্‌স্‌ হয়ে আছে—এই কথাগুলোর মানে ঠিক এখুনি বুঝতে পারবি না হয়তো।' অনীশ বলল, 'কিন্তু এগুলো মনে রাখিস। যেমন করেই হোক মাটি কামড়ে পড়ে থাক। ফ্রাসট্রেশন মানেই তো পিছিয়ে পড়া—'

'কে আবার পিছিয়ে পড়ল! রজত নাকি?' ট্রে-তে চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শিখা বলল, 'সকালেও তোমার দাদার টেম্পারেচর ছিল। গলা শুনে মনে হচ্ছে এখন আর নেই—'

ট্রে থেকে চায়ের কাপ তুলে নিতে নিতে অপ্রতিভ গলায় অনীশ বলল, 'এতো তাড়াতাড়ি হয়ে গেল চা!'

'জল চাপিয়েই এসেছিলাম—'

রজত লক্ষ করেছে, স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক ছাড়াও ওদের দুজনের মধ্যে কেমন একটা স্নিগ্ধ মায়া খেলা করে, প্রায়ই। আপাতত তার ও অনীশদার মধ্যে আলোচনাটা একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছিল বলেই কিনা কে জানে, এই মুহূর্তের স্তব্ধতা থেকে দ্রুত বেরুতে চাইল অনীশ। চা-টা শেষ করল তাড়াতাড়ি।

'আমি বেরুচ্ছি। রজত, তুই খেয়ে যাস—'

শিখা জিজ্ঞেস করল, 'কতোদূর যাবে?'

'দ্বিজেনদা অসুস্থ। দেখে আসি একবার—'

'সে তো অনেকদূর!'

'বাবোটা সাড়ে বারোটার মধ্যেই ফিরে আসব।'

অনীশ ভিতরে গেল। বোধহয় তৈরি হতে। শিখা বলল, 'রোদ লাগিও না। ছাতা নিও –'

সামনে শিখা বসে। রঙ ততো ফরসা নয়, তবু মুখের ডৌল আব স্বাস্থ্যের জন্যে সব সময়েই সুন্দর দেখায়। এখন আরও। তিন হাত দূরত্ব থেকে রজত তার সদ্য-ছাড়ানো একপিঠ চুলের ভিজে গন্ধ পাচ্ছে। সিঁথির দিকে তাকালে মনে হয় সব মেয়েরই সিঁদুর পরা উচিত; না হলে সম্পূর্ণতা আসে না। সম্পূর্ণতা! এই যে সে হুট্‌ করে ভেবে ফেলল, কথাটার মানে কী! ঠিক জানে না। এ-রকম অনেক কথা, অনেক ভাবনা চৈতন্য জুড়ে রিনরিন করে ওঠে মাঝে মাঝে, তাদের অর্থ স্পষ্ট হয় না কখনো। এমনও হতে পারে এই মুহূর্তে শিখার দিকে তাকিয়ে সে সুখের কথা, শান্তির কথা ভেবেছিল। এমন একটা কিছুর কথা, যার পায়ের কাছে সারাক্ষণ লুটিয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

অনীশ বেরিয়ে এলো। ছাতাটা ঠিকই সঙ্গে নিয়েছে। যেতে যেতে বলল, 'রজত, আব একদিন আসিস—'

ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল শিখা। এইভাবে নিশ্চয়ই প্রায়ই সে দাঁড়ায়। একজন চলে যায়, আর একজন দেখে। শুধুই অভ্যাস, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই; তবু ব্যাপারটা গুলিয়ে দেয় রজতকে। মনে হয়, এই জগৎ, এই সম্পর্ক ও স্বাভাবিকতা থেকে সে অনেক দূরে। তার সবই এলোমেলো, অগোছাল— তার কী হবে তার নিশ্চয়তা নেই কোনো। অনীশদা বলল মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে। কোন মাটি!

'চলো, আমরা ভেতরে যাই।' শিখা বলল, 'খাবার তাড়া নেই তো? কলেজ কখন?'

'কোনো তাড়া নেই। ভাবছি আজ যাব না!'

'কেন!'

'মনটা ভালো নেই, বউদি। কেমন বোকা-বোকা লাগছে নিজেকে।'

'ও মা, সে কি!' শিখা হেসে ফেলল, 'নিজেকে নিজেরই বোকা লাগছে! অদ্ভুত তো!'

রজতও হাসল। খানিক আগেকার জমাট বেঁধে-থাকা ভারটা আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে মাথা থেকে। এখন অনেকটা হালকা, অল্প সুড়সুড়ি লাগলেই হেসে উঠতে পারে হো-হো করে।

'আমার হয় এ-রকম। মাঝে মাঝে। বোকা লাগে। তখন রাগও হয়।'

'তোমার দাদাকে বোলো। নিশ্চয়ই এর একটা ব্যাখ্যা বলে দেবে—।' রান্না-ঘরেব দিকে এগিয়ে গেল শিখা। গ্যাস খুলে আগুন জ্বালছে বার্নারে, 'কাণ্ড দেখলে লোকটার! কাল সারাদিন জ্বরে হু-হা করেছে। আজ একটু কমতেই আর তর সইল না!'

রজত চুপ করে থাকল। ভালোবাসায় মান অভিমান থাকে; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও। এটা তার পড়া কথা, কিছু বা দেখা। যদি কোনোদিন সেই জায়গায় পোঁছয়, হয়তো বুঝতেও পারবে। 'বিয়ে যে কী সুখের, বুঝবি না!' বিয়েব পর শর্মিলা বলেছিল টুপুরকে। কথায় কথায় ফাঁস কবে দেয় টুপুর। শুনে রজত বলেছিল, 'এমনভাবে বলছিস যেন সুখটা তোরই! মেয়েগুলো জন্ম-ন্যাকা!' টুপুর বলেছিল, 'মাঝে মাঝে তোকে কথামালার শেয়ালটার মতো লাগে। আঙুরফল টক।'

হঠাৎ-হাসিতে সুড়সুড়ি লাগল গলায়। ইতিমধ্যে রান্না নিয়ে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে শিখা। ভাজা তেল আর পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধে খিদে-খিদে ভাবটা চাগিয়ে উঠল। কথাটা এখনই বলা যাবে না শিখাকে। বরং সে অন্য কথা ভাবল।

'বউদি, একটা ফোন করব?'

'হ্যাঁ, করো না—'

ফোনটা বেডরুমে। ডায়াল করতে এনগেজড্ সাউণ্ড পেল। রিসিভার নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করল একটু। আবার এনগেজড্। কে যে কথা বলে

এতো!

বিরক্ত হয়ে ফিরে এলো রজত।

'হয়ে গেল?'

'না, এনগেজড্।'

'টেলিফোনের এই এক ঝামেলা!' আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো শিখা, 'তোমার সেই বন্ধুর খবর কী? টুপুর?'

'ভালো।'

'একদিন আসবে বলেছিল, এলো না তো!'

রজত চুপ করে থাকল।

'একদিন নিয়ে এসো। বরং তোমরা দু'জনে খেও। আমি তো একাই থাকি, আমার ভালোই লাগবে।'

'খাওয়াবেন, সত্যি!' উচ্ছ্বাসের গলায় বলল রজত, 'বউদি, আপনি গ্রেট! টুপুর দু'দিন ওদের বাড়িতে খাইয়েছে। আমি কি করে ডাকি বলুন! আমার তো বাড়িঘর নেই—প্রেস্টিজ থাকে না!'

'নিজেকে সব সময় অতো ছোট করে দেখ কেন!'

কথাটা পুরোপুরি শেষ করার আগেই শিখা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে।

রজত উঠে এলো। ডায়াল করার আগে আদরে চুমু খেল রিসিভারটাকে। রিং হচ্ছে। ঠোঁট দুটো পয়া বলতে হবে।—'হ্যালো!' পুরুষের গলা। বোধহয় জ্যাঠামশাই।

'টুপুর আছে?'

'কে তুমি—?'

'রজত—'

'ধরো, দেখি—'

ধরে থাকল। এ লোকটা অন্য বুড়োদের মতো নয়। কথা বলে কম। স্বাস্থ্য ভালো করার জন্যে একবার তাকে সাঁতার কাটার পরামর্শ দিয়েছিল।

'হ্যালো—'

'হয়েছে কিছু?'

'কী! ও, হ্যাঁ। ছেলে—। কী লাভলি দেখতে! তোর কি খবর, এখন ফোন করছিস?'

'ছেড়ে দেব?'

'ছাড়ার কথা বলিনি। কী দুর্ভোগ দ্যাখ! কার না কার ছেলে হবে, সারা রাত জাগতে হলো আমাকে! ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—'

'ঠিক আছে, তোর যখন ছেলে হবে আমি রাত জাগব।'

'মারব এক চাঁটা! ফাজিল! মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে শিখিস নি।'

'তুই মেয়ে হলি কবে থেকে!'

'তাই তো!' একটু থেমে গেল টুপুর। তারপর, 'এই, শোন না, শর্মিলা ফোন করেছিল একটু আগে। পিকনিকটা হচ্ছে—। আসছিস তো? ওরা ইউনিভার্সিটিতে আসবে বলল।'

রজত জবাব দিল না।

টুপুর বলল, 'কী ব্যাপার! এই রজত?'

'যাব কিনা বলতে পারছি না। মন ভালো নেই।'

'তোর ওই এক কথা—মন, মন, মন! শোন না! শর্মিলা বলল, ওর বরের একজন কোলিগ এসেছে—সন্দীপ না কি নাম। সেও যাবে—'

চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রজত, 'এঞ্জিনীয়ার?'

'কী করে বুঝলি!'

'তোর জিবে জল পড়া দেখে। এঞ্জিনীয়ার শুনলেই তোদের জিবে জল পড়ে—'

'এটা যে বুঝতে পেরেছিস, রজত, সত্যি, তোকে আমার ইন্টেলিজেন্ট ভাবতে ইচ্ছে করছে।'

'যা খুশি ভাব।' রিসিভারটা কান বদল করে নিল রজত, 'শোন, তোর একটা নেমন্তন্ন আছে—'

'নেমন্তন্ন! কিসের!'

'শিখা বউদি একদিন তোকে খাওয়াবে বলেছে—'

'ও, লাভলি!' টুপুর হাই তুলল, 'উপলক্ষটা কি? ও'দের ম্যারেজ অ্যানি-ভারস্যারি বুঝি?'

'না। তোর বউদির ছেলে হয়েছে বলে।'

'যাঃ!'

'রাখছি। গিয়ে কথা বলব।'

'ঠিক আছে—'

রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো ফাঁকা; মনে হলো আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারত। গলায় স্বাদ আছে টুপুরের, একটু ছোঁয়াতেই উপুড় করে দেয় নিজেকে। কেউ কেউ সত্যিই সুখে আছে, রজত ভাবল, যেমন টুপুর। থাক। ওর পাশে যখন হাঁটে, এক-একদিন নিজেকে চাকর বা দারোয়ানের মতো লাগে। লাগুক। একটু আগে সে ঠাট্টা করেছিল। জানে তো, টুপুর মেয়েই। যেদিন ও চলে যাবে, এগিয়ে গিয়ে বলবে, ধন্যবাদ টুপুর। অনেকদিন তুই আমার অক্সিজেনের কাজ করেছিলি।

স্টিলের গামলায় চাল ধুচ্ছে শিখা। টেলিফোনের কথাবার্তা নিশ্চয়ই ওর কানে যায়নি। রান্নার জায়গা থেকে ভেসে আসছে মাছের ঝোলের গন্ধ। এক একটা রান্নার এক একরকম গন্ধ; এক একটা পরিবেশের এক একরকম

চেহারা। নাক-চোখ খাড়া রাখলে সহজেই চেনা যায়। অনীশদা বাইরে; এখন এ-বাড়িতে যে নৈঃশব্দ্য, শম্ভুনাথের ওখানেও তা অপ্রাপ্য নয়। তবু, দুই নির্জনতায় আপাত মিল থাকলেও, কোথায় আছে একটা পার্থক্য, অনুভূতি দিয়ে যা স্পষ্টই চিনে নেওয়া যায়। রজত ঠিক বুঝতে পারে না। হয়তো সবই নির্ভর করে কে কীভাবে দেখছে তার ওপর।

কাজ করতে করতেই শিখা বলল, 'কথা হলো?'

'হ্যাঁ।'

শিখা ঘরে ঢুকল এবং আবার ফিরে এলো। আগুনের কাছাকাছি ঘোরা-ফেরার তাপেই সম্ভবত ঘাম ফুটেছে কপালে। গলতে শুরু করেছে সিঁদুরের টিপটা। আঁচল তুলে আলতোভাবে বুলিয়ে নিল গলায়।

'অনেকদিন থেকেই একবার বেলুড়ে যাব ভাবছি। রবিবার সময় হবে তোমার?'

'রবিবার!' একটু ভাবল রজত। তারপর বলল, 'রবিবারেই যাবেন?'

'পারবে না? অবশ্য একাও চলে যেতে পারি। অনেকটা দূর তো, সেই-জন্যেই—'

'না, না। আপনি বললে যাব।' অপ্রস্তুত গলায় রজত বলল, 'আসলে রবিবারে একটা পিকনিকে যাবার কথা হচ্ছে—'

'তাহলে বরং আর একদিন যাব। পিকনিক তো আর রোজ হয় না।'

আশ্বস্ত হলো রজত। সেভাবে বললে সে হয়তো শিখার অনুরোধ এড়াতে পারত না। এর আগেও কয়েকবার এখানে ওখানে গেছে শিখা বউদির সঙ্গে। বেলুড়ে, দক্ষিণেশ্বরে, কিংবা অন্য কোথাও। কোনো উপলক্ষ থেকে নয়, প্রায় অকারণে শিখা যেন তাকে এ-সব যাত্রার সাক্ষী রাখতে চায়। যাতায়াতের সময়-টুকু ছাড়া বস্তুত দুজনের মধ্যে সম্পর্ক থাকে না কোনো। জায়গায় পৌঁছে আপনমনে মন্দিরের ভিতরে চলে যায় শিখা। আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক থেকে খুঁজে নেয় তাকে। হাতে পুজোর ফুল ও প্রসাদ। একদিন তার মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিল, 'যখন পুজো দিই, তোমার কথাও বলি -'

রজত জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বলেন?'

'প্রার্থনার কথা আর কাউকে বলতে নেই।' অল্প রহস্যময় গলায় বলেছিল শিখা।

আজও রজতের এই সব মনে পড়ল। শিখা চুপচাপ; এখন কিছু বলতে হলে রজতকেই বলতে হবে—যে-কোনো কথা। খানিক ওকে লক্ষ করে বলল, 'বেলুড়ে যেতে আপনার খুব ভালো লাগে, না?'

'ওই আর কি। মনটা ভালো হয়। তাছাড়া—', শিখা হাসল, 'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো! ছেলেপুলে নেই যে সেই নিয়ে ব্যস্ত থাকব। আর

তোমার দাদাকে তো দেখছ, এই আছে এই নেই--'

শিখা একটা নিঃশ্বাস চাপল। উঠতে উঠতে বলল, 'বোসো, ভাতটা চাপিয়ে দিয়ে আসি—'

কথাটা গেঁথে গেল মনে--এই আছে এই নেই। এমনিতে হাসিখুশি উচ্ছল শিখা বউদি কথাবার্তায় প্রায়ই অস্পষ্ট করে রাখে নিজেকে, ব্যাপারটা নতুন দেখছে না রজত। যতো না বলে তার চেয়ে ভালোবাসে শুনতে। কিন্তু আজ যেন একটু বেশীই ডুবে আছে নিজের মধ্যে। স্পষ্ট করে কিছু বলল না বটে, তবু এ-সব কথার মধ্যে দিয়েই শিখার মনের ফাঁকা জায়গাটুকু ছুঁয়ে এলো রজত। চারিদিক ঘেরা ভেজা লাবণ্যের মধ্যে সেই জায়গাটায় চিকচিক করছে শুকনো বালি। মেঘ করে না, বৃষ্টি পড়ে না--সেখানে সারাদিন জুড়ে দুপুর।

হঠাৎই এক বিষণ্ণতা এসে নিজের থেকে আলাদা করে দিল রজতকে—অস্পষ্টভাবে হলেও, টের পেল, বুকের মধ্যে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে প্রথম শীতের মতো কিছু একটা। আগে থেকে এর কোনো প্রস্তুতি ছিল না মনে। একটু আগে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে—নির্ভরতার জন্যে যাদের কাছে ছুটে এসেছিল, এখন দেখছে তারাও দাঁড়িয়ে আছে নদীর অন্য পারে। পারাপারের সূত্র নেই কোনো। তবে কি এটাই সত্যি, কেউই ভালো নেই—কেউই পৌঁছুতে পারছে না কোথাও! দুঃখময় একই উড়োচিঠি ঠাণ্ডা বুলিয়ে যাচ্ছে সকলের বুকে! পারস্পরিক এতো সুখ, শান্তি ও ভালোবাসার মধ্যে থেকেও অনীশদা শিখা বউদির সংসারে মাঝে মাঝে এমন ছায়া নেমে আসে কেন! কেন মাঝে মাঝে মন্দিরে ছুটে যায় শিখা বউদি, কার জন্যে কোন প্রার্থনা রেখে আসে নিঃশব্দে'

নাঃ, পুরো ব্যাপারটাই যেন কেমন গোলমেলে. যতো ভাবছে ততোই জট পাকিয়ে যাচ্ছে আরও। আবার এরই মধ্যে দ্যাখো কেমন দুম করে একটা বাচ্চা হয়ে গেল টুপুরের বউদির' সাত বছরে বড়ো বউদির হয়েছে তিনটি। এই জন্যেই ভগবান-টগবানে তার বিশ্বাস হয় না কখনো। দেখা হলে বলত, স্যার, জাজমেন্টগুলো বড্ড একপেশে হয়ে যাচ্ছে। মানুষ আপনার কাছে ন্যায় চায়, তার বদলে দিচ্ছেন দুঃখ। এই দুঃখই একদিন ঘৃণায় পরিণত হবে, তারপর রাগে। তারপর কী হবে আমি জানি না। শিখা বউদি হয়তো চাপা দুঃখে মনে মনে কেঁদে যাবে সারাজীবন। কিন্তু, আমি ছাড়ব না। আমি তো জানিই আমার প্রতিপক্ষ ভগবান-টগবান নয়, মানুষই। হাতে ক্ষমতা পেয়ে ভগবান ভাবছে নিজেদের। একদিন না একদিন আমি তাদের চিনে নেব। সেদিন শালাদের গায়ের ছাল চামড়া থাকবে না।

দুঃখময় রাগে কনুইয়ের ওপরে উঁচুনীচু চামড়াটায় হাত বোলাতে লাগল রজত। প্রায় অকারণ জ্বালা করতে লাগল চোখ দুটো।

টুকটাক কাজে এদিক ওদিক করছে শিখা। এখন ঘরে। খাবার ঝামেলা এখানে না রাখলেই ভালো হতো। মনে হচ্ছে শিখা বউদির মন ভালো নেই আজ—হয়তো অভিমান হয়েছে অনীশদার এইভাবে বেরিয়ে যাওয়ায়। এমন একা একা সত্যিই কারও সময় কাটে না।

ভিতর থেকে বসার ঘরে চলে এলো রজত। দেয়ালে তৈরি র‍্যাকে বইয়ের পর বই ঠাসা। অদ্ভুত অদ্ভুত নাম। রজত একটা বই দেখল—টরচার। টেনে বের করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গলা পেল শিখার।

'তুমি এখানে! আমি ভাবছি গেল কোথায়!'

'রান্না হয়ে গেল?'

'প্রায়।' শিখা বলল, 'খিদে পেয়ে গেছে নাকি?'

রজত ভাবল বলে ফেলে। মুখে বলল, 'না—।'

জানলা দিয়ে রাস্তা দেখছে শিখা। রজত শিখাকে। শিখার আড়াল পেরিয়ে রোদ ঢুকছে ঘরে। কার মতো যেন! হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ধরনে ঘুরে তাকাল শিখা।

'এই, লুডো খেলবে?'

'খেলতে পারি—'

'চলো। ভাত হতে তো সময় লাগবে। তোমার দাদা যদি এসে পড়ে একসঙ্গেই না হয় বসে পড়ব।'

ডাইনিং টেবিলের ওপর থেকে গ্লাসট্যাসগুলো সরিয়ে লুডোর ছক পাতল শিখা।

'আমি কিন্তু সবুজ নেব।'

'আমি লাল।' রজত বলল, 'আপনিই চালুন প্রথম।'

উঠল না। শিখার হাত থেকে ঘুঁটিটা নিয়ে নাড়তে নাড়তে রজত বলল, 'মনে হচ্ছে ছয়ই পড়বে—'

শিখা বলল, 'আমার এবারও পড়বে না।'

ঘুঁটিতে পাঁচ। রজত বলল, 'আর এক দান নেবেন নাকি?'

'না বাবা, দরকার নেই। যার যার নিজের লাক। দয়া দেখানোর দরকার নেই—'

রজতের দুই। ঘুঁটি নাড়তে নাড়তে ঠোঁট টিপে হাসছে শিখা। ছয়। নড়ে বসল।

'তুমি টুপুকে ভালোবাসো?'

'না—'

শিখা দান ফেলল। এবার পাঁচ। ঘর থেকে গুটি বের করতে করতে বলল, 'লুকোচ্ছ কেন! আমার কাছে বলতে লজ্জা কি!'

রজত বলল, 'আমার কোনো ফীলিং নেই।'

শিখা এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এখন ওর চারটে গুটিই বাইরে। রজত আটকে আছে একটাতেই।

শিখা জিজ্ঞেস করল, 'কে বড়ো? তুমি, না ও?'

'আমিই। আমার দেড়টা বছর নষ্ট হয়েছিল।'

শিখা মাথা নাড়ল। এলানো চুল শুকিয়ে গেছে এখন, খোঁপা করে তুলে দিল ঘাড়ের ওপর।

'মন দিয়ে খেল। আর গুটি বেরুচ্ছে না কেন?'

'না পড়লে কী করব!'

তখনই ছয় পড়ল। শিখা বলল, 'দেখলে তো! যার কথা ভাবছ সেই বাঁচিয়ে দিল!'

'কী আশ্চর্য!' অপ্রস্তুত গলায় বলল রজত, 'আমি কারুর কথা ভাবছি না—'

'নিশ্চয় ভাবছ।' চাপা ঠোঁটে হাসছে শিখা। আর একটা দান ফেলে বলল, 'কাউকে ভালোবাসাটা দোষের নয়। তবে অমন তুইতুকারি করলে কোনো-দিনই জানতে পারবে না কিছু।'

এর পরের দুটো দানই পর পর ছয় ফেলল রজত।

'এই তো!' যেন হঠাৎ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল শিখা। ছড়া কেটে বলল, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এলো বান! কী, বলেছিলাম না!'

শিখার সুস্মিত মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রজত। সে ভুল বা মিথ্যে বলেনি, ভালোবাসাটাসার ব্যাপারটা সত্যিই সে বোঝে না সে টুপুরই হোক বা আর যে-কেউ, কারুর জন্যে তার মনে আলাদা আবেগ নেই কোনো। আর টুপুরের সঙ্গে যে একটু বেশী ভাব, সেটা ভালোবাসা হতে যাবে কেন! ভালো লাগা আর ভালোবাসা কি এক? তবে, রজত ভাবল, এই মুহূর্তে শিখা বউদির সরল হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে যে-কোনো কথাই সে মেনে নিতে পারে। ঠাট্টা-ইয়ার্কির মধ্যে লুডোর ছকে দান ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শিখা যেন তার চাপা দুঃখটা পেরিয়ে যাচ্ছে। রজত ভাবল, খেলাটা চলুক।

খেলার মায়ায় ইউনিভার্সিটিতে পেঁছুতে দেরি হয়ে গেল অনেক। দুটো ক্লাসেরই সময় পেরিয়ে গেছে তখন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ক্যান্টিনে পল্লবকে পেল রজত। শুনল, শর্মিলারা গাড়ি নিয়ে এসেছিল, সঙ্গে অশোক আর তার বন্ধু সন্দীপও ছিল। ওরা দল বেঁধে কোয়ালিটিতে গেছে। টুপুর, ঈপ্সিতা, পিনাকী, অসিতও। সে রজতের জন্যেই অপেক্ষা করছিল এতোক্ষণ। এখন একসঙ্গে যেতে পারে।

রজত বলল, 'তুই চলে যা, আমি যাচ্ছি না—'

'কেন!' ঘাবড়ানো গলায় বলল পল্লব, 'যাবি না কেন?'

'আমার ইচ্ছে। কোথাকার কে অশোক, সন্দীপ—আমি তাদের পেছনে ফেউ ধরব কেন!'

'তোর মধ্যে একটা কমপ্লেক্স গ্রো করছে, রজত!'

'ঠিক আছে। কমপ্লেক্স আছে বলেই আমি শালা আমি। না হলে ওদের গাড়ির সোফার হতাম—'

একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল রজত।

৩

ভোর না হতেই আজ ঘুম ভেঙে গেল টুপুরের। ঠিক স্বাভাবিক জেগে ওঠা নয়—হঠাৎ, চমকে, এক আঘাতে। টের পেল কীরকম একটা অস্বস্তিতে কাঠ-কাঠ হয়ে এসেছিল গলা, শুকনো জিবটা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে ও চাইছিল যতোটা সম্ভব আর্দ্রতা টেনে আনতে। ঘামে জাবজেবে হয়ে আছে চিবুকের নীচে থেকে সারা গলা ও বুক, ঘাম চোখের কোলে ও ঘাড়ের পিছনে—অনেকক্ষণ ধরে একটানা ঘেমে গেলে যেমন হয়, স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে বালিশটা।

এমন হবার কথা নয়। পাখা চলছে ফুল স্পীডে, কচিৎ কখনো তার ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দে প্রখর হয়ে উঠছে রাতের নৈঃশব্দ্য। আর শব্দ বলতে টাইমপীসের একটানা টিকটিক। ওদিকের খাটে কুঁকড়েমুকড়ে শুয়ে আছে চাঁপা, অন্ধকারে আবছা তার সাদা কাপড়ে জড়ানো শরীর—ঘুমের ঘোরেই একটা বড়ো নিঃশ্বাস চেপে পাশ ফিরল। সাধারণত মা তার আগে ওঠে, চা তৈরি করে ডাক দিলে সে। চাঁপার মাথার দিকের জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায় খানিকটা—সেখানে তারাটারা চোখে পড়ে না কিছু; বরং অন্ধকারটা যেন একটু বেশীই থমথমে। আর কোথাও শব্দ নেই কোনো। কোথাও কিছু নেই, তবু ঘামে ভেজা গলায় হাত বোলাতে বোলাতে টুপুরের মনে হলো, এইরকম সময়ে টেলিগ্রাম আসে। যেমন এসেছিল বাবার বেলায়। টুপুর তখনো ঘুমিয়ে। তাকে ডেকে তুলে বুকে জাপটে ধরেছিল মা-যেন কেউ কেড়ে নিতে এসেছে, ওগরানো গলায় বলেছিল, না তোকে আমি এ-খবর শুনতে দেব না। কতোদিন আগেকার কথা! কেমন হঠাৎ চলে আসে এক-একটা খবর, দিশে পাওয়া যায় না!

আজকাল যখন তখন লোড শেডিং হয় বলে মাথার কাছে টর্চ নিয়ে শোয় টুপুর। এখন, বিছানায় উঠে বসার কিছুক্ষণ পরে, টর্চ জেলে টেবিলের ওপর রাখা টাইমপীসটার ওপর ফেলল। প্রায় সাড়ে চারটে। তার মানে আরও ঘন্টা খানেকের আগে সকাল হবে না। চোখে ঘুমের জড়তা না থাকলেও মুখটা লোনা লাগছে এখনো—আর সেই সঙ্গে মন আর মাথা জুড়ে অস্বস্তির রেশ, যার প্রভাবে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল তার।

বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল টুপুর। আঁচল দিয়ে চেপেচুপে চোখ, কপাল, গলা মুছল। স্বপ্নটা যেন এখনো লেগে আছে চোখে—এখনো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে দরজায় কলিং বেল বেজে ওঠার

তীক্ষ্ম শব্দ। ওই শব্দেই ঘুম ভেঙে যায় তার। সেটা কিছু নয়। কিন্তু, তার আগের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনাগুলো! হাড়ের মতো সাদা জ্যোৎস্নায় থমথম করছে ফাঁকা রাসবিহারী এভিনিউ, ট্রাম লাইনের ওভারহেড তারে জরির ঝিলিক। সে আর রজত দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে। তারপরেই কোত্থেকে কী হয়ে গেল! দেখল ফাঁকা রাস্তা দিয়ে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে রজত আর তার পিছনে তাড়া করে আসছে একটা অ্যামবাসাডর। স্টীয়ারিংয়ে বসে হাসছে সন্দীপ, তার পাশে সে, পিছনে অশোক, শর্মিলা, ঈপ্সিতা আর কে কে যেন—আরও স্পীড বাড়ানোর জন্যে বিশ্রী গলায় চিৎকার করছে তারা। তারপরেই অন্য রকম হয়ে গেল সব - ভীষণ রক্তাক্ত আর ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়ে ভেসে উঠল রজত, তখনো ছুটছে প্রাণপণে, উঠে আসছে তাদের সিঁড়ি দিয়ে, আর তার পিছনে পিছনে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তাড়া করে আসছে পুলিসের ইউনিফরম পরা কয়েকটা লোক। দরজার সামনে এসে মাথা ঠুকে দাঁড়িয়ে পড়ল রজত—একেবারে বিপর্যস্ত যিশুখৃষ্টের ভঙ্গি—বাঁ হাতটা আঁটকে গেছে কলিং বেলের বোতামে।

স্বপ্ন স্বপ্নই। তবু অন্ধকার ঘরে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে হঠাৎ আবেগে গলা বুঁজে এলো টুপুরের, চোখ দুটো ভরে উঠল জলে। স্বপ্ন হলেও, এ-সব ঘটনার কোনো না কোনো সূত্র নিশ্চয়ই আছে—যেমন গাড়িটা, গাড়ির মধ্যে যারা ছিল সবাই, ঝড়ের গতিতে সন্দীপের গাড়ি ড্রাইভ করা, বাসস্টপে তার আর রজতের চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা, সবই সে চিনতে পারে হুবহু। কিন্তু, এ-রকম কেন হলো যে খেয়াল খুশিতে ছোটানো গাড়িটা শেষ পর্যন্ত তাড়া করে গেল রজতকে চাপা দেবার জন্যে আর তারপরেই রক্তে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল সে! কী মানে হয় এ-সব অ্যাসোসিয়েসনের? নাকি ছোটবেলায় স্কুলে দেখা রজতকে টেনে হিঁচড়ে পুলিসের নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটাই এতোদিন পরে তালগোল পাকিয়ে ফিরে এলো স্বপ্নে! রজত, তোদের বাড়িতে তুই এখন দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস' দ্যাখ, তোর কথা ভেবে এই ঘুটঘুটে রাত্তিরে কেমন কষ্ট পাচ্ছি আমি! অথচ, সেদিন, আমি যখন ফিরে এসে দাঁড়ালাম সামনে, তুই কি না সোজা বলে দিলি, যাদের সঙ্গে গিয়েছিলি, তারা তোকে পৌঁছে দিল না কেন! আরও খারাপ কথা বলেছিলি! তোর মুখে ফুটে উঠেছিল গোঁয়ার্তুমির ছাপ, যেন পারলে খুন করে ফেলবি আমায়! এই জন্যেই কেউ পছন্দ করে না তোকে! আমি? আমার কথা ছেড়ে দে। তবে, তোর সঙ্গে এই ভাবের ব্যাপারটা তো চিরকাল থাকবে না। একদিন না একদিন আমি চলে যাবো। তখন টের পাবি কে তোর কথা ভাবে—কে তোর খোঁজ রাখে।

অল্প শব্দ করে হাই তুলল টুপুর! উঠে দাঁড়াল।

শব্দেই সম্ভবত জেগে উঠেছিল চাঁপা। অন্ধকারে বলল, 'এখনই উঠলি,

টুপুর। আমি তো অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছি—'

'এমনি উঠলাম, মা। ঘুম ভেঙে গেল।'

'চা খাবি?' শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞেস করল চাঁপা, 'করে দেব?'

'তুমি ঘুমোও। মোটে সাড়ে চারটে। এখনো অনেক রাত আছে—'

চাঁপা বলল, 'পাখাটা একটু আস্তে করে দে তো। শীত শীত করছে—'

পায়ের কাছে চাদর রাখা থাকে, তবু গায়ে দেবে না চাঁপা। অথচ রোজই বলে শীত করে রাতে। আন্দাজে রেগুলেটারের পয়েন্ট কমিয়ে দিয়ে এসে চাদরটা মায়ের গায়ে বিছিয়ে দিল টুপুর।

'আমি এখন পড়াশুনো করব। তুমি যেন ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ো না।'

দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে দেখল আলো জ্বলছে শেখরের ঘরে। খটকা লাগল। এই অসময়ে তার জেগে থাকার কথা নয়। অল্প দাঁড়িয়ে থেকে ডাকবে কি না ভাবল টুপুর। তারপর বাথরুমে গেল।

স্বপ্নটা হারিয়ে গেছে, তবু তার বিষণ্ণতা মন ছুঁয়ে আছে এখনো। বেসিনের কল খুলে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল টুপুর। অন্ধকার থাকলেও ভোর হয়ে আসার আলাদা স্বাদ আছে একটা, তার স্পর্শ আছে নৈঃশব্দ্যে ও হাওয়ায়, কলের জলে, এমনকি গাঢ় ঘুমে জ্যাঠামশাইয়ের মৃদু নাক ডাকার শব্দে। আর এই যে নীচের রাস্তা দিয়ে হর্ন দিতে দিতে দ্রুত চলে যাচ্ছে ট্যাক্সিটা--দেখতে না পেলেও তার চলে যাওয়ার ধরনে। ঠান্ডা জলে ভেজা চোখ মুখ ঘাড়ে বাথরুমের ভেনটিলেটর বেয়ে আসা হাওয়ার ছোঁয়া লেগে একটা তরতাজা ভাব ছেয়ে এলো শরীরে। ভারি মিষ্টি এই পেস্টের গন্ধটাও, এক নিমেষে তাড়িয়ে দিল মুখের লোনা ভাবটাকে। এখন ভাবতে অবাক লাগছে ওইরকম একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার!

স্বপ্ন সে নতুন দেখছে না, বলতে গেলে ঘুমের মধ্যে কেউ না কেউ বা একসঙ্গে অনেকে প্রায়ই ছুঁয়ে যায় তাকে। বেশীর ভাগই যাদের সঙ্গে সারা-দিন কাটায় তারা, কখনো বা মা, জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাই। কিছুদিন আগে একদিন বাবা এসেছিল স্বপ্নে--অদ্ভুত স্বপ্ন, মনে আছে এখনো—জরির ফিতে বাঁধা একটা রঙচঙে প্যাকেট তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে বাবা, সে কিছুতেই ধরতে পারছে না! সেদিন সারাটা সকাল মন খারাপ হয়েছিল তার, বাবার ছবিটার দিকে তাকাতেই মনে পড়ে যাচ্ছিল দৃশ্যটা, মাকে বলবে ভেবেও বলতে পারেনি। এ-সব ব্যাপারে মা বড়ো টাচি। কলেজে গিয়ে ঈপ্সিতাকে গল্প করেছিল। 'মরা মানুষের স্বপ্ন দেখা ভালো নয়।' একটু গম্ভীর করে বলে-ছিল ঈপ্সিতা, 'অসুখ করে।' টুপুরের অবশ্য তা মনে হয়নি, বরং বাবার জন্যে দুঃখটা কেমন পবিত্র হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মনে-প্রায় সারাটা দিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে। তাছাড়া আর যা দ্যাখে সবই সাধারণ আর মজার স্বপ্ন।

একবার একটা শিংঅলা সাদা গরু ল্যাজ তুলে তাড়া করেছিল তাকে— আতঙ্কে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল বিছানায়। এ সব ভাবলে নিজেকে কেমন ক্যাবলা মনে হয়। অনেকদিন পরে আজ সে একটা ভয়ঙ্কর আর গোলমেলে স্বপ্ন দেখল, কেন কে জানে! কিছুটা হালকা হয়ে টুপুর ভাবল, আজ পিকনিকে যাবার সময় রজতের সঙ্গে দেখা হলে বলবে, 'কিরে ব্যাটা যিশুখৃষ্ট, রাত-বিরেতে কলিং বেল টিপিস কেন!'

না না, এ সব বলা যায় না। কথায় কথায় যদি সন্দীপ বা অশোকের কথা ওঠে সে বড়ো লজ্জার ব্যাপার হবে। অন্যেরা শুনলে ঠাট্টা করতে পারে। যা সব ফাজিল! বিশেষত শর্মিলা—বিয়ের পর থেকে এতো অসভ্য অসভ্য কথা বলে, কোনো কথাই যেন আটকায় না মুখে! এই তো সেদিন—রেস্টুরেন্টে বসে হাত দেখাচ্ছিল সন্দীপদা, তারটা দেখতে দেখতে বলল, 'আপনি খুব সরল।' সেটা বলার জন্যে অতোক্ষণ হাত ধরে রাখার দরকার হয় নাকি!' ফস করে বলে বসল শর্মিলা, 'যেভাবে নাড়াচাড়া করছেন আমি তো ভাবলাম বলবেন, আপনার হাতটা কী নরম!' শুনে কান লাল হয়ে গিয়েছিল টুপুরের তখনই মনে হয়েছিল সন্দীপের হাত থেকে কী একটা ছড়িয়ে গেল তার শরীরে! সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিয়ে সন্দীপ বলল 'এভাবে বলা যায় কিছু!'

ঘটনাটা মনে পড়ায় এখনো অল্প রোমাঞ্চ বোধ করল টুপুর। সেইসঙ্গে কিছুটা লজ্জাও।

কথাগুলো মিনাক্ষী বা অসিত কেউ তুলেছিল রজতের কানে। ওরা চলে যেতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রজত বলল, 'ভাগ্য জানবার জন্যে হাত দেখানোর দরকার নেই! সবই তো জানা। সন্দীপদা না হোক, ওই রকমই একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে তোর। তারপর চলে যাবি দুর্গাপুর, ভিলাই বা আসানসোলে। তারপরে ভাদভেদে মোটা হয়ে কলকাতায় ফিরে ইভনীং শোয়ে সিনেমা দেখতে যাবি বরের সঙ্গে। দেখা হলে বলবি, কীরে, ভালো আছিস? আয়, আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—এই যে!'

[illegible] নয়, তবে সেদিন একটু রাগই হয়েছিল টুপুরের। ভুরু তুলে বলল, 'তোর হিংসে হচ্ছে?'

'হিংসে! কোন দুঃখে! আমার ভাল লাগে- বোরিং লাগে। মনে হয় মিথ্যে এদের সঙ্গে চেনাশোনা হয়েছিল!'

'তবে কি তোর ইচ্ছে মতো চলতে হবে! এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন আমি তোর কেনা!'

[illegible] রজত বলল, 'রাস্তা পড়ে আছে তবু আমার সঙ্গে হাঁটছিস কেন? যা চলে যা—'

বিকেলের ওই সময়টা রাস্তায় লোকজন ছিল না বেশী, তাই বাঁচোয়া। তবু এতোটা ভাবেনি টুপুর। আর না দাঁড়িয়ে একা একা তাড়াতাড়ি হেঁটে

গিয়েছিল বাসস্টপের দিকে। দাঁড়িয়েই ছিল। একটার পর একটা বাস এলো এবং চলে গেল, তবু ওঠে নি। কেন তা বুঝতে পারেনি। রাগে, দুঃখে ভোঁ ভোঁ করছিল কানদুটো। তবে এটা বুঝেছিল ঝাঁঝ দেখিয়ে ওর সঙ্গে পারা যাবে না আজ ওর জন্যে অপেক্ষা করা হয়নি- আজ আরও পারা যাবে না।

মিনিট দশেক পরে কোথা থেকে ফিরে এসে পাশে দাড়াল রজত। আরও একটা বাস চলে যাবার পর বলল বাসস্টপটা প্যাঁচার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা নয়। চল হাঁটি । আমার খিদে পেয়ে গেছে '

সঙ্গ ধরে টুপুর বলল গেলেই পারতিস। সকলেই খেলো

তোর পয়সায় খাই ব'লে সকলের পয়সায় খাব এটা ভাবিস কেন। রজত বলল, ওই লোকগুলোকে তো আমি চিনিই না ভালো করে।

তাহলে খিদেয় মর।—

রজত হাসল। গলার স্বর পাল্টে বলল আর ঘ্যান ঘ্যান ভালো লাগছে না মাইরি। আইটেমগুলো বল তো তুই কি খাওয়াতে পারিস দেখি

এই রজতকে কিনা দেখল ক্ষতবিক্ষত। ভাগ্যিস স্বপ্ন আজেবাজেই হয়।

ট্রেন চলার শব্দ। বাইরে বোধ হয় ভোর হয়ে আসছে যদিও ভেন্টিলেটর দিয়ে যতটা দেখা যায় বাইরেটা এখনো পুরোপুরি অন্ধকার। একটু আগে ঘর থেকে বেরুবার সময় মা চা করে দেবার কথা বলেছিল সত্যি, এই সময় একটু গরম চা পেলে কী ভালো যে লাগত। কিন্তু সে জন্যে মাকে আর ডাকাডাকি করতে ভালো লাগছে না এখন। এমনিতেই শুতে শুতে বেশ রাত হয়ে যায় মার শুলেও যে ঘুম হয় না ভালো অনেকদিন মাঝরাতে জেগে উঠে মা এপাশ ওপাশ করা দেখে বুঝতে পারে টুপুর। সংসারের মধ্যে থেকেও তখন ভীষণ একা লাগে মাকে। জ্যাঠাইমা বকেন মাঝে মাঝে, 'নিজেকে তুমি বড্ড বেশি কষ্ট দাও চাপা।' আমাকেও কিছু করতে দাও। একটু বিশ্রাম নিলেও তো পার।' মা হেসে বলে, কাজ ছাড়া এ পোড়া কপালে আর কী নিয়ে থাকব দিদি। শুনে এমনকি জ্যাঠাইমাও চুপ করে যান। টুপুর বোঝে বাবা যাবার পর থেকেই একটা সব হারানো ভার পাথরের মতো চেপে বসেছে মাকে। ভারী সেই পাথরটা নড়ানোর সাধ্য নেই কারও। ঝোড়ো হাওয়ার মতো এক-একটা দিন সেই পাথরটার ওপর দিয়ে বয়ে যায় শুধু, দাগ পড়ে না কোথাও।

না মাকে জাগিয়ে লাভ নেই। বরং নিঃশব্দে কিচেনে ঢুকে সে নিজেই চা টা করে নিতে পারে।

আজ বর্ষার পিকনিক। কাল আবার টিউটোরিয়াল আছে। বেরুবার আগে এখনো অনেকটা সময়-এই ফাঁকে নিজের কাজটা এগিয়ে নিতে পারে। না হলে ফিরে এসে আবার সেই পড়া নিয়ে বসা।

শেখরের ঘরে আলো জ্বলছে এখনো। বাথরুমে যাবার সময়ও একই

ব্যাপার দেখেছিল। দরজাটা খোলা, পাখার হাওয়ায় পর্দাটা দুলছে অল্প অল্প। এমন কি হতে পারে, আলো জেবলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল শেখর, তারপর ভুলে গেছে নেবাতে। নাকি জেগেই আছে?

ওর দরজার সামনে গিয়ে ভিতরটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল টুপুর।

'ছোড়দা, জেগে আছ নাকি?'

'কে টুপুর?' পরিষ্কার গলায় জবাব দিল শেখর, 'কী ব্যাপার রে! আয়—'

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে টুপুর দেখল পিঠে বালিশ দিয়ে বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে বই পড়ছে শেখর। ঝোলানো হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। সিগারেটের টুকরো আর দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিতে ভর্তি অ্যাসট্রেটা দেখলেই বোঝা যায় এইভাবে অনেকক্ষণ জেগে আছে। টুপুর অবাক না হয়ে পারল না।

'ঘুমোওনি!'

'না। ঘুম আসছিল না।' হাঁটুমুড়ে সোজা হয়ে বসল শেখর, 'মনটা ভালো লাগছিল না—'

টুপুর অনুমান করল, কেন। কাল রাতে খেতে বসেই জ্যাঠাইমার কথা শুনে বুঝেছিল ছোড়দাকে নিয়ে আবার একটা টানাপোড়েন চলছে বাড়িতে। নীলা আর বাচ্চাকে আজ ছেড়ে দেবে নার্সিং হোম থেকে। জ্যাঠাইমা বলেছিল এখানে এনে তুলতে। ছোট বউদির ইচ্ছে অন্য রকম—সে বাপের বাড়িতে থাকবে মার কাছে, বাচ্চার যত্নআত্তি ওখানেই ভালো হবে। কথার ঝোঁকে একটু বেফাঁস বলে ফেলেছিল ছোড়দা, তাতেই অভিমান বেড়ে গেল জ্যাঠাইমার।

'বউমার মা-ই মা, আর তোর মা, কাকীমা এরা কেউই নয়! নাকি এখানে এলে তোর ছেলের যত্ন কিছু কম হতো!'

অপ্রতিভভাবে শেখর বলল, 'আমি তা বলিনি, মা। নীলার ইচ্ছে—'

'তুই কী বলবি!' ধরা গলায় জ্যাঠাইমা বলল, 'বিয়ে যখন আমরা দিয়েছি, দোষ আমাদেরই। কোলে কাঁখে করে মানুষ করলাম, বিয়ে দিতে না দিতেই পর হয়ে গেল ছেলে! এখন শ্বশুরবাড়ি যা বলবে তাই হবে। আমরা মরে যাই, তখন টের পাবি কে আপন কে পর!'

জ্যাঠামশাই সাধারণত এ সব কথায় থাকেন না। তবু জ্যাঠাইমার গলা চড়তে বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর থেকে। এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বউমার যেখানে ভালো লাগে সেখানে যাবে। এ নিয়ে এতো কথার কী আছে!'

'তুমি থামো!' শাড়ির খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে জ্যাঠামশাইয়ের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন জ্যাঠাইমা।

টুপুর বুঝেছিল আজকের ঘটনাটা কিছু নয়, আসলে পুরনো অভিমানের

জের টানছেন জ্যাঠাইমা। অনেকদিন চুপ করে থাকার পর যে-কথা বলার নয় অভিমান আজ তাই বলিয়ে নিল।

ভাতের থালা সামনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল শেখর। বেশ কিছুক্ষণ। দেখাদেখি, অস্বস্তিতে, টুপুরও। মনে হচ্ছিল যে-কোনো মুহূর্তে খাওয়া ছেড়ে উঠে যাবে ছোড়দা। শেখরের পিঠে হাত বুলিয়ে চাঁপা বলল, 'দিদির কথায় মন খারাপ করিস না, শেখর। এখন বউমাকে ওখানেই নিয়ে যা। বাচ্চাটা একটু বড়ো হোক, তারপর নিয়ে আসিস এখানে—'

শেখর বলল, 'আমি কি ঝামেলায় পড়লুম বলো তো!'

'সংসার মানেই তো ঝামেলা বাবা!' প্রশ্রয়ের গলায় বলল চাঁপা, 'ওরই মধ্যে মানিয়ে চলতে হবে। নে, খেয়ে নে এখন। এঁটো থালা মুখে বসে থাকতে নেই—'

শেখর খেয়েছিল ঠিকই, সে প্রায় না-খাওয়ারই মতো। তারপর চুপচাপ গিয়ে ঢুকেছিল নিজের ঘরে।

আপাতত শেখরের রাত-জাগা, ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কী বলবে ভেবে পেল না টুপুর। আস্তে আস্তে বলল, 'এমন ঘটনা সব বাড়িতেই হয়। শুধু শুধু মন খারাপ করে কী করবে!'

'ভাবছি বিয়েটা না করলেই ভালো করতাম। বিয়ে করেই যতো অশান্তি!'

'তোমার আবার বেশী বেশী!' সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল টুপুর, 'মুখ-টুখ ধোবে তো ধুয়ে নাও। আমি চা করে আনছি—'

সুখ কাকে বলে? দুঃখ? এর কোনটার শুরু কোথায়? কোনটার শেষ কোথায়? নাকি যে যেমনভাবে দেখে নেয়—যে যেমনভাবে বুঝে নেয়, একের ভিতরেই জড়িয়ে আছে অন্যটা! বার্নারে দেশলাই কাঠির ছোঁয়া লাগতেই দপ করে জ্বলে উঠল আগুন, টুপুর দেখল, লালচে হলুদের ভিতরে গোপনে মুখ ঘষছে নীলের আভা। এক ঠমকে জ্বলে উঠেছিল বলেই একসঙ্গে এতোগুলো রঙ দেখতে পেল সে, না হলে আগুন আর কবে আগুন ছাড়া অন্য কিছু! দেখতে দেখতে একটা অন্যরকম ভাবনা অন্যমনস্ক করে দিল তাকে।

দ্যাখো, কেমন বিশ্রীভাবে শুরু হলো আজকের দিনটা! প্রথমে ওরকম আজেবাজে একটা স্বপ্ন! তার রেশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই দেখতে হলো ছোড়দার বিষণ্ণ মুখ! অথচ, সত্যি বলতে, শেখরের জীবনে আজকের দিনটাও হতে পারত একটা সুন্দর দিন। নার্সিং হোম বলতেই তো ক্লোরোফর্ম, অসুখ-অসুখ, ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। পেটের খোল থেকে বেরিয়ে এসে বাচ্চাটার জন্যে সেটা আর একটা বড়ো খোল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আজই প্রথম সে পৃথিবী বলতে যা বোঝায় তার সংস্পর্শে আসবে। চোখে দৃষ্টি এলে, অনুভূতি প্রাণ পেলে ক্রমশ টের পাবে পৃথিবী জায়গাটা, পৃথিবীর আলো হাওয়াটা কেমন! তারপর বড়ো হবে আস্তে আস্তে। মানুষের আবির্ভাব

যে কতো সুন্দর আর রোমাঞ্চকর, জন্ম-মুহূর্তে তা বুঝতে পারে না মানুষ। তবে, সেদিন, নীলার বুকে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে থাকতে দেখে টুপুর অনুমান করে নিয়েছিল, ঠিক একইভাবে সেও এসেছিল একদিন, ঠিক একইভাবে সেও একজনকে নিয়ে আসবে একদিন! এইভাবে, যারা নিয়ে আসে, তারাও তো চলে যায়—তবু তাদের স্মৃতি থেকে যায় যারা থেকে গেল তাদের বুকে আর মুখের আদলে। এই যে সুখের যাত্রা, ছোড়দার বেলায় তার শুরুতেই এমন বেসুর বাজছে কেন! কেমন বলল, বিয়ে না করলেই ভালো করতাম! তার মানে তো এই যে, তাহলে বাচ্চাটাও আসত না! ইস্, ওই নরম তুলতুলে একরত্তিটাকে জড়িয়ে এখনই এ-সব না ভাবলেই কি নয়! ছোট বউদিই বা কী রকম! নার্সিং হোম থেকে সোজা বাপের বাড়ি না গিয়ে দু' একদিন এখানে থেকে গেলেই পারত! তাতেই মন ভরে যেত জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশাইয়ের। একেই তো এমন পেল্লায় বাড়ি থাকতেও বিয়ের প্রায় পরপরই আলাদা হয়ে গেল ছোড়দা—তা নিয়ে এখনো হা-হুতাশ যায়নি!

এ-সব যখনই ভাবে তখনই নীলা সম্পর্কে একটা আলাদা প্রশ্ন দেখা দেয় মনে। সেই বিয়ের সময় থেকেই নীলার সঙ্গে তার ভাব-ভালোবাসা কম নয়, বলতে কি, নীলাকে তার ভালোই লাগে। কিন্তু যখনই শোনে শেখরের এই অন্ধবন্ধ দশার সবটাই নীলার জন্যে, তখনই কেমন খিঁচড়ে যায় মনটা। তাহলে এটাই বোধহয় সত্যি, যে-কোনো মানুষকেই ওপর-ওপর দেখে যা মনে হয়, আসলে সে তা নয়। চামড়ার পর চামড়ার স্তর খুলতে খুলতে বেরিয়ে পড়ে এক একরকম চেহারা। তার কোনোটা কালো, কোনোটা ভালো। কিন্তু এতো দেখে শুনে বুঝে যদি এক-একটা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, তাহলে তো ডিটেকটর বসাতে হবে মনে—যন্ত্র যেমন যেমন বোঝাবে সেই বুঝে এগোতে হবে তোমাকে। এতো পারা যায়!

না, যায় না, মনে মনে বলল টুপুর, কিছুতেই যায় না। সুখ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে, কোথায় তা ভাগাভাগি করে নেবে, খুশি হবে, না সবাই যেন মেতে উঠেছে কতো তাড়াতাড়ি দুঃখের পোশাকটা ফিট করে নেওয়া যায় গায়ে!

চা হাতে শেখরের ঘরে ঢুকে দেখল তখনো একইভাবে শোয়া। টুপুরকে দেখে গড়িমসি ভাঙতে ভাঙতে উঠে দাঁড়াল, হাই তুলল। চয়ের কাপটা হাতে নিয়ে বলল 'আজকাল তুই বেশ কাজের মেয়ে হয়ে উঠেছিস!'

'অকাজের লোক বেড়ে গেলে কাউকে কাউকে কাজের লোক হতেই হয়।' টুপুর বলল, 'আমি বাপু তোমাদের মতো অমন মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে পারি না।'

'বটে!' শেখর বলল, 'তোর চা কোথায়?'

'আছে—'

'এখানে নিয়ে আয়। একটু গল্প করি। তোর পিকনিকে বেরুনো কখন?'

'সাতটায় বেরুলেই হবে—'

রিস্টওয়াচে চোখ রাখল শেখর।

'এখনো অনেক দেরি।'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল টুপুর। ভোর হচ্ছে। কালচে লালের ভিতর থেকে ক্রমশ ফরসা হয়ে উঠছে আকাশ। কাক ডাকছে থেকে থেকে। একটা অন্যরকম হাওয়া এসে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে ঘরের মধ্যে। অল্প ঠাণ্ডা মেশানো। এমন হাওয়ায় মন ভালো হয়, মা বলে, ঠাণ্ডা লাগে। আঁচলটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে হাল্কা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টুপুর।

দেখে মনে হচ্ছে এরই মধ্যে কিছু একটা ভেবে নিয়েছে ছোড়দা, মন্দের ভালো কিছু একটা। না হলে গুমোট ভাব কাটিয়ে অতোটা খোলামেলা হতে পারত না। আহা, বেচারা! দোটানায় পড়ে ওরই অসুবিধে হচ্ছে বেশী। এমন কেন হবে! বলতে গেলে বাচ্চাটার ওপর জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশাইয়েরই তো অধিকার বেশী, ওদেরই তো বংশধর। মনে মনে অভিমানটাও সেইজন্যেই। আসলে ছোড়দারা যদি এ-বাড়িতে থাকত তাহলে আজ এতো সব প্রশ্নই উঠত না। ব্যাপারটা ছোট বউদিকে একটু বুঝিয়ে বললেই তো পারে! টুপুর কি বলবে? না, টুপুর ভাবল, ছোড়দা অন্য কিছু ভাবতে পারে। তাছাড়া, ওটা ওদের নিজেদের ব্যাপার, ওরাই বুঝে নিক।

ফিরে এসে খাটের ওপর বসল টুপুর। অন্ধকার থাকলে থাকে, একবার যেতে শুরু করলে তর সয় না আলোর। দেখতে দেখতে কেমন পরিষ্কার হয়ে উঠল চারিদিক! সেদিন প্রায় এই সময়েই সে নার্সিং হোমের সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছিল। তখনো আকাশে জ্বলজ্বল করছিল একটা তারা।

'ছোড়দা, তোমার ছেলের কী নাম রাখলে?'

'নাম!' চোখ তুলে তাকাল শেখর, 'ভাইটাল প্রশ্ন। নামের ব্যাপারটাই তো ভাবা হয়নি এখনো! তুই কিছু ভেবেছিস নাকি?'

'আমি বলি, ওর নাম দাও সিদ্ধার্থ।'

'সিদ্ধার্থ! হঠাৎ!'

'গৌতম বুদ্ধের নামে নাম। শুনলেই মনে হয় ভালো হবে, সুন্দর হবে—'

শেখর হাসল। বলল, 'ওই নামের প্রচুর বাজে লোকও তো আছে!'

'তা থাকতে পারে।' টুপুর বলল, 'তুমি তো নাম দেবে নামের অ্যাসোসিয়েসন থেকে। যেমন ধরো গান্ধী বা লেনিন। যদি অন্য কারও ওই নাম শোনো, নামের ইমেজটাই মনে আসবে প্রথমে—'

'ঠিক।' চা-টা দ্রুত শেষ করল শেখর। হাসি-হাসি মুখে তাকাল বোনের দিকে, 'তোর ছেলের নাম আমি লেনিন রাখব।'

'বাজে কথা রাখো!' অল্প আড়ষ্ট বোধ করল টুপুর, 'কোথায় বিয়ে তার নেই ঠিক!'

'বলিস কি রে! তোর কুষ্ঠিতে আছে আগামী এক বছরের মধ্যে বিয়ে। তার তোড়জোড়ও তো শুরু হয়ে গেছে মনে হচ্ছে—'

'যাঃ! যতো ফালতু কথা!' টুপুর উঠে দাঁড়াল, 'আমার বয়ে গেছে এখন বিয়ে করতে—'

'তা আমি জানি না।'

শেখর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। ধোঁয়া টানল জোরে। তারপর চোখ বন্ধ করে হাসতে লাগল মিটিমিটি।

'তোর বন্ধু শর্মিলা তো ফোন করেছিল কাকীমাকে। তার বরের কোলিগ, সন্দীপ না কি নাম—খুব ভালো ছেলে। কাকীমা তো আমাকে খোঁজখবর করতে বলল!'

টুং-টাং করে কী একটা বেজে গেল টুপুরের বুকের ঠিক মধ্যিখানে। হঠাৎই মনে হলো নিঃশ্বাসটা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে নেই। টিপ টিপ করে উঠল কপাল আর রগের দু'পাশে।

নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিল টুপুর। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমার বিয়ের জন্যে শর্মিলার এতো মাথা ব্যথা কেন! বিয়ে আমি করব না এখন!'

'এই দ্যাখো, রেগে যাচ্ছে! তোকে বলাই আমার উচিত হয়নি!'

'হয়ই নি তো!' টুপুর বলল, 'তোমাকেও কোনো খোঁজখবর করতে হবে না।'

'বেশ। করব না। আমিও মনে করি বিয়ে করা না করাটা যার যার নিজের ইচ্ছে।' সময় নিয়ে বলল শেখর, 'কাকীমাকে আবার কিছু বলিস না যেন। তোকে বলতে মানা করেছিল।'

খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে থাকল টুপুর। বসে থাকার ইচ্ছে থেকে নয়; সত্যি বলতে, এমনই হঠাৎ এইসব কথাবার্তা হয়ে গেল যে বুঝতে পারছিল না ঠিক কোন সময়টিতে উঠে চলে যাওয়া যায়। লজ্জা, রাগ, অবাক-ভাব–সব মিলিয়ে কিম্ভুত হয়ে আছে মনটা, চক্রাকারে বেড়ি দিয়ে রেখেছে কোমরে, যেন উঠলেই চেপে বসিয়ে দেবে আবার। একবার মনে হলো শেখর নয়, যেন সন্দীপই দাঁড়িয়ে আছে সামনে—বিয়ের প্রস্তাব করে অপেক্ষা করছে সে কী বলে শোনার জন্যে। ছোড়দা যা বলল তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ধরেই নিতে হবে ঘটকালি করার জন্যে পাকাপোক্ত হয়ে নেমেছে শর্মিলা, গোপনে গোপনে এরই মধ্যে কথা বলেছে মার সঙ্গে। আর মা-ই বা কেমন। ছোড়দার সঙ্গে কথা বলবার আগে একবার তাকেও তো বলতে পারত!

ভাবতে ভাবতে মাথার মধ্যে কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল টুপুরের। নিজেকে বুঝতে না পারার জ্বালায় প্রায় জল এসে গেল চোখে।

শেখর বোধহয় ওর মনোভাব আন্দাজ করতে পারছিল। কাছে এসে বলল, 'তুই কি ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছিস? আচ্ছা মেয়ে তো—! আমি একটা

কথার কথা বলছিলাম—'

'থাক।' ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল টুপুর, সোজা তাকাল শেখরের দিকে, 'সবাইকেই জানা আছে।'

'আ-রে!' মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে শেখর ঘাবড়ে গেছে বেশ। অপ্রতিভ হেসে বলল, 'এমন করার কী আছে! আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেব।'

'কোনো দরকার নেই। তুমি নিজেরটা ম্যানেজ করো আগে, তারপর আমার ব্যাপারে এসো।'

গরম লাগছিল। আঁচলটা গলা থেকে খুলে নিল টুপুর। কী বলতে কী বলে এলো শেখরকে, বিশেষত ওই শেষের কথাগুলো—ছোড়দা নিশ্চয়ই ভাববে। সত্যি সত্যিই এ-ব্যাপারে শেখরেরই বা করার ছিল কী! শর্মিলা হয়তো সত্যিই ফোন করেছিল মাকে; মাও যেমন—ঝটপট খোঁজ করতে বলে দিল ছোড়দাকে! সাদাসিধে মনে কথাগুলো তাকে বলে ফেলে হয়তো নিজেকেই একটু হাল্কা করে নিতে চেয়েছিল শেখর। ঝোঁকের মাথায় আজেবাজে কয়েকটা কথা বলে সেই ভাবটাকেই কি আর একটু বাড়িয়ে দিল না টুপুর!

ফাঁকা ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে ক্রমশ নিজেকে সইয়ে নিল টুপুর। এখন অনেকটা স্বাভাবিক—এখন মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক কিছুই বলেনি শেখর। শর্মিলা যে এমন একটা কিছু ভাবছে বা করতে চাইছে এটা তার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

সেদিন, ফেরবার পথে, মনে পড়ল, পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অশোক আর সন্দীপ যখন সিগারেট কিনছে—ঈপ্সিতা গাড়ির সামনে, আর পিনাকী, অসিত, পল্লবরা গুজগুজ করছে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ তাকে আলাদা করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল শর্মিলা, 'সন্দীপদাকে কেমন লাগল তোর?'

'ভালো—'

'ভালো মানে কী?' শর্মিলা বলল, 'পছন্দ হয়?'

তখনই কথাটার মানে ধরতে পারেনি টুপুর। ওরা ফিরে আসছে দেখে বলল, 'পছন্দ অপছন্দের কী আছে!'

আসলে সন্দীপের ওই হাত দেখা আর শর্মিলার টিপ্পনী—দুটোই আবার করে ফিরে এসেছিল তার কাছে। কথা এগোয়নি।

এখন সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে গিয়ে সারা শরীরে স্পষ্ট সির-সিরানি টের পেল টুপুর। এইরকমই একটা অনুভূতি সেদিন সন্দীপের হাত থেকে টেনে নিয়েছিল সে।

আপাতত পর্দা সরিয়ে আবার শেখরের ঘরে ঢুকল টুপুর। শূন্য কাপ দুটো তুলে নিল দু' হাতে। সোজাসুজি না তাকিয়েও বুঝতে পারল পাতলা একটি হাসি লেগে আছে শেখরের মুখে। বইটা আবার টেনে নিয়েছে হাতে। মনে হচ্ছে তার কথাগুলোকে আদৌ আমল দেয়নি। না দিলেই ভালো।

টুপুর বেরিয়ে যাচ্ছিল। কী ভেবে থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছোড়দা, আমিও কিন্তু সিরিয়াসলি কিছু বলিনি তোমায়—'

নিজের কানেই অন্যরকম শোনাল কথাগুলো। শেখর বলল, 'গলা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে—'

৪

গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের উল্টোদিকে বাস থেকে নেমে পল্লব দেখল কেউ কোথাও নেই। তখন সাতটা বাজতে পাঁচ। সাতটা থেকে সোয়া সাতটার মধ্যে সকলেরই এসে পৌঁছুনোর কথা। এখান থেকেই দুটো গাড়িতে যাওয়া হবে বারুইপুরে পিকনিক স্পটে। অশোকের কোনো আত্মীয়ের একটা বাগানবাড়ি আছে ওখানে। আইডিয়াটা শর্মিলার।

এখন নিজেকে একা দেখে অল্প একটু ফাঁকা বোধ করল সে।

একটা সময় শর্মিলার প্রতি একটু-আধটু আকর্ষণ বোধ করত পল্লব। যতোই বন্ধু হোক, মেয়েদের গায়ে আছে একটা অন্যরকম গন্ধ, এটা-ওটা দিয়ে শরীর ঢাকাঢাকির মধ্যে আছে এক ধরনের রহস্য -ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ বা সায়ার লেস এক চিলতে চোখে পড়লেই বন্ধুত্বের সম্পর্কটা কেমন যেন বদলে যেতে চায়। এই বদলটা শর্মিলার ব্যাপারেই যে কেন বোধ করত সে ঠিক-ঠিক বুঝতে পারেনি কোনোদিন। তবে, ব্যাপারটা নিয়ে যখনই সে একটু ভাবাভাবি শুরু করেছে, ঠিক তখনই ধৃতিকান্ত নামে এঞ্জিনীয়ারিংয়ের একটা ছেলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিল শর্মিলা। একদিন দু'জনকে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মাঠে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখে চাপা দুঃখ নিয়ে দৃশ্যটা এড়িয়ে যায় পল্লব। আর একদিন আর্টস্ বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল সে আর পিনাকী—দেখল অল্প এলোমেলো ভঙ্গিতে ট্যাক্সি থেকে নামছে শর্মিলা, ধৃতিকান্ত বসে আছে ভিতরে। তার আগের দুটো ক্লাসে অ্যাবসেন্ট ছিল শর্মিলা—তাদের দেখে এড়িয়েই যাচ্ছিল প্রায়, পিনাকী ডাকল। শর্মিলা বলল সকাল থেকেই তার ভীষণ মাথাধরা আর জ্বর-জ্বর লাগছিল, তাই আসতে পারেনি। পল্লব জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ধৃতিকান্ত কি ডাক্তার? কিন্তু শর্মিলাকে ঠোঁটে জিব বুলোতে দেখে চুপ করে গেল। শর্মিলার নীচের ঠোঁটটা কমলালেবুর কোয়ার মতো ফোলা আর লালচে, অল্প রক্তও যেন লেগে আছে সেখানে। শর্মিলা এড়াতে চাইল তাদের। 'কিছু বুঝলি?' ও চলে যাবার পর পিনাকী বলল, 'ধৃতিবাবু আজ ফাটিয়ে দিয়েছে।' পল্লব জবাব দেয়নি, ঘটনাটা কল্পনা করে কেমন ঘেন্না লাগছিল তার। কিন্তু আকর্ষণের ব্যাপারটা যেমন কোনোদিন বলেনি কাউকে, তেমনি ঘৃণাটাও চেপে রেখেছিল নিজের মধ্যে।

এর তিন চারমাস পরেই বিয়ে হয়ে গেল শর্মিলার। আর সেই ছেলেটা—

ধৃতিকান্ত—হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল কোথায়! এরও কিছুদিন পরে একদিন গড়িয়াহাটের মোড়ে একটি ন্যাড়ামাথা যুবককে দেখে চেঁচিয়ে উঠল অসিত, 'ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ!' ওরা দেখল, ধৃতিকান্ত—চাঁচাপোছা মাথার জন্যে মুখের আদল বদলে গেছে খানিকটা, তবু চেনা যায়। ধৃতিকান্ত রাস্তা পেরিয়ে অনেকটা চলে যাবার পর পিনাকী বলল, 'দিনকাল কেমন পাল্টে গেছে দেখেছিস! আগে বাবা মা মারা গেলে লোকে মাথা ন্যাড়া করত। এখন প্রেমিকার বিয়ে হয়ে গেলেও মাথা কামিয়ে ফেলে!' কথাটায় মজা পেয়েছিল সকলে, এমনকি সেও। হাসতে হাসতে রজত বলেছিল, 'পিনাকী, তুই বেশী তড়পাস না। ঈপ্সিতার বিয়ে হয়ে গেলে তোকেও ভুরু কামাতে হবে—'

যাই হোক, এখনো মাঝে মাঝে শর্মিলার কথা ভাবলে একটু উদাসীন হয়ে পড়ে পল্লব। কেন যেন মনে হয়, পৃথিবীতে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে তার, আর শর্মিলাও এসেছে সময়ের আগে। যদি তারা দুজনেই আসত ঠিক সময়মতো, তাহলে অন্যরকমও হতে পারত ব্যাপারটা। তার বদলে কী হলো? রাত বারোটায় সে যখন পড়ার বইয়ের পাতায় ঝুঁকে থাকে, মনঃশ্চক্ষে দেখতে পায় দুর্গাপুরের কোনো এক বাড়ির কোনো এক ঘরের বিছানায় মুখে ব্রণের দাগঅলা একটা দামড়া লোক ছিনিমিনি খেলছে শর্মিলাকে নিয়ে। দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে অবুঝ জ্বালায় একদিন পল্লব নিজের পুরুষাঙ্গ চেপে ধরেছিল। অথচ, নিজেই বুঝতে পারে, তার ভাবনায় কিংবা ব্যবহারে যুক্তি নেই কোনো। শর্মিলার সঙ্গে কোনোদিনই তেমন একটা মেলামেশা করেনি সে, বরং টুপুর বা ঈপ্সিতা বা চন্দনা তার অনেক কাছের। রূপ বা চেহারা-টেহারার কথা বললে টুপুর বা ঈপ্সিতার ধারে কাছে লাগে না শর্মিলা। তবে! শুধুই মন? নাকি ভাগ্য? সেদিন রেস্টুরেন্টে বসে ওরা যখন সন্দীপকে দিয়ে হাত দেখাচ্ছিল— এক মনে এই কথাগুলো ভেবে যাচ্ছিল পল্লব। সেদিন আর একটা কথাও মনে হয়েছিল তার, বন্ধুত্ব-টন্ধুত্ব একেবারে বাজে কথা, চিন্তার দিক থেকে এই মেয়েগুলোর সঙ্গে তাদের কোথায় একটা তফাত আছে। শাড়িতে যেমন পাড় আর আঁচল থাকতেই হয়, তেমনি ওদের মনের মধ্যেও আছে একটা প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্নটা ভেঙে বেরুতে পারবে না কিছুতেই। তাছাড়া, অশোক আর সন্দীপকে নিয়ে যে রকম মাতামাতি করছিল ওরা, তাতে মনেই হয়নি তার ব পিনাকী বা অসিত সম্পর্কে ওদের মনে কোনো ফীলিং আছে! চিংড়ি কাটলেটে ছুরি বসাতে বসাতে একবার মনে হয়েছিল পল্লবের, প্লেটে খানিকটা থুথু ছড়িয়ে ওটা অশোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এই যে স্যার, আজকালকার ছেলেদের টেস্ট-ফেস্ট নিয়ে অনেক কথাই তো বলছেন, একবার এটা চেখে দেখুন তো! রজত সেদিন ঠিকই করেছিল না গিয়ে—রজতটা তাদের চেয়ে অনেক ব্যাপারেই অনেক বেশি ম্যাচিওর; অনেক কিছুই বুঝে নিতে পারে আগেভাগে। বেচারার লাইফে ওই পুলিসের ঝামেলাটা না থাকলে ভালো

হতো। মাঝে মাঝে কথাবার্তায় এমন ভায়োলেন্ট হয়ে যায়!

টিনের ছাউনির নীচে চা সিগারেটের দোকান। তার সামনে টানা বেঞ্চিতে বসে গল্প গুজব করছে বাসের ড্রাইভার কন্ডাক্টররা। কেউ আসছে না দেখে এক ভাঁড় চা কিনে নিল পল্লব। তিতকুটে স্বাদ। দু' চুমুক দিয়েই বল গড়ানোর মতো কায়দা করে ভাঁড়টা গড়িয়ে দিল রাস্তায়, তক্ষুনি একটা প্রাইভেট গাড়ি চাকার তলায় গুঁড়িয়ে গেল সেটা। হায় ভাঁড়, তোমার কোনো প্রাণ নেই! দৃশ্যটায় চোখ রেখে একটা সিগারেট ধরাল পল্লব এবং ভাবল, রজত কি আসবে? সেদিন তো বলেছিল, 'ওসব অশোক সন্দীপের ব্যাপারে আমি নেই। এই ধরনের পিকনিককে লিবার্টি থাকে না।' ওটা অবশ্য একটু বাড়িয়ে ভাবছে—পিকনিকটা একটা আউটিং মাত্র, লিবার্টি থাববে না কেন! তবে, যা গোঁয়ার, নাও যেতে পারে। টুপুর অবশ্য বলেছিল, ঠিক যাবে। আমি যাচ্ছি তো!' রজত বলেছিল, 'তোর যাওয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক!' টুপুর বলল, 'কেন মিছিমিছি র‍্যালা নিচ্ছিস, রজত! যদি না যাস, তাহলে বুঝব তোর সঙ্গে আমার কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই।' ব্যাপারটা ওই পর্যন্তই হয়ে আছে। এক টুপুরই শেষ পর্যন্ত ম্যানেজ করতে পারে ওকে। পল্লব ঠিক বুঝতে পারে না ওদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা কী রকম। রজত যা ছেলে তাতে প্রেম-ট্রেম ন্যাকামির মধ্যে যেতে চায় না কখনো। টুপুরটাও সরল আর খোলামেলা, ঈপ্সিতার মতো কেঠো নয়। বোধহয় এই ব্যাপারটাই ঠিক, আন্ডার-স্ট্যান্ডিং—একটা বোঝাবুঝির ব্যাপার আছে ওদের মধ্যে, তাতেই টেনে নিয়ে যায়। রজতটা লাকি। মনে হচ্ছে টুপুরই শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসবে ওকে। যদি না আসে, পল্লব ভাবল, তাহলেও কি সে যাবে?

ওই যে, পিনাকী আসছে। হাতে এয়ারলাইন্‌সের ব্যাগ। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে রাস্তা পার হলো পল্লব।

'কতোক্ষণ এসেছিস?'

'এই তো মিনিট পাঁচ সাত।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে পিনাকী জিজ্ঞেস করল, 'আর কেউ আসেনি?'

'আর কেউ মানে তো ঈপ্সিতা?'

'দূর মাইরি, ঈপ্সিতা ঈপ্সিতা করে তোরাই কেসটা কেঁচিয়ে দিবি দেখছি!' পকেট থেকে চিউইংগামের প্যাকেট বের করল পিনাকী, 'খাবি?'

'পরে খাবো। এই একটা সিগারেট খেলাম; মেজাজটা আছে।'

একটা দোতলা বাসের ওপর থেকে মুখ বের করে হাত নাড়ছে অসিত। পল্লবও হাত নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কেঁচিয়ে দিলাম মানে?'

'দাঁড়া, বলছি।' মুখে চিউইংগাম পুরে দিল পিনাকী। ব্যাগের জিপ খুলে একটা ক্যামেরা বের করে উল্টেপাল্টে দেখে আবার ভরে রাখল ব্যাগে। মুখটা এঁটে দিল।

অসিত এসে পড়েছিল। বলল, 'ভালো করে লোড করে এনেছিস তো?'

পিনাকী ঘাড় নাড়ল। তারপর পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে শুরু করে দিল।

'শালা রাজেশ খান্না!' পিনাকীর থুতনী নেড়ে দিয়ে অসিত বলল, 'আর কিছু তো লোড করতে পারবে না। তুমি শুধু ক্যামেরাই লোড করে যাও—'

ঠাট্টাটা গায়ে মাখল না পিনাকী। হাসতে হাসতে বলল, 'কাল একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়েছে—'

'বল, শীগগির বলে ফ্যাল!' বুক পকেট থেকে গোটা তিনেক সিগারেট বের করে একটা পল্লবের দিকে বাড়িয়ে দিল অসিত, একটা নিজের ঠোঁটে চেপে, বাকিটা রেখে দিল পকেটে, 'ইন্ডিয়া কিংস্। বড়দার প্যাকেট থেকে ঝেড়ে দিয়েছি।'

'শোন-', ব্যস্তভাবে বলল পিনাকী, 'কাল সন্ধ্যেবেলায় বালীগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে ঈপ্সিতার সঙ্গে দেখা। সঙ্গে ওর মা ছিল। ঈপ্সিতা তো মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, আমি শালা কোনো পাত্তা না দিয়ে ঢিপ করে ওর মায়ের পায়ে একটা পেন্নাম ঠুকে দিয়ে বললাম, মাসীমা, ভালো আছেন? ওর মা তো ড্যাম গ্ল্যাড। কী বলব মাইরি, রেগুলার আমার পিঠ থাবড়াতে লাগল। বলল, তোমাকে অনেকদিন দেখিনি! বাড়িতে আসো না কেন? মাঝে মাঝে কলেজ-ফেরতা খুকুর সঙ্গেও তো চলে আসতে পারো—'

'ব্যাস, এই!' সিগারেটে টান দিয়ে অসিত বলল, 'মাকে তো পটালি, অ্যালসেসিয়ানটাকে ম্যানেজ করবি কী করে?'

'দ্যাখ, কুকুর-ফুকুর কোনো ব্যাপার নয়। ওর মা যদি ফেভারে থাকে—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে পিনাকীর পিঠে একটা থাপ্পড় কষাল পল্লব।

'তোর শাশুড়ীর মেয়ে আসছে—'

দূর থেকে কাছে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসছিল ঈপ্সিতা আর চন্দনা। কালো পেড়ে হালকা সবুজ সিলকের শাড়ি ঈপ্সিতার গায়ে, আঁচল উড়ে যাচ্ছে উল্টোদিকের জোর হাওয়ায়। চন্দনাবটা পুরো কালো, পড়ে থাকলেও থাকতে পারে। কালো রঙের জন্যে ঈপ্সিতার সঙ্গে কনট্রাস্টটা ভালোই ফুটেছে। ঈষৎ নার্ভাসভাবে চুলে হাত বুলিয়ে শার্টের কলার ঠিকঠাক করে নিল পিনাকী।

'ঈপ্সিতটা বিয়েল মাল!' অসিত বলল, 'বুক দেখেছিস-!'

পিনাকী গম্ভীর হয়ে বলল, 'এ-সব ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না—'

'আগে কুকুরটাকে ম্যানেজ কর, তারপর কথা বলিস।'

পল্লব বলল, 'কী হচ্ছে কি নিজেদের মধ্যে!'

'অসিত প্রায়ই এ-রকম কথা বলে। বন্ধু বলে আমি কিছু বলি না।' রাগ ও অভিমান মেশানো গলায় পিনাকী বলল, 'টুম্পুর কি কম মাল! তাকে নিয়ে তো কিছু বলো না কখনো!'

তে তোর কী। টুপুর কি তোর ইয়ে—'

পিনাকী কিছু বলতে যাচ্ছিল, পল্লব ভুরু কুঁচকে তাকাতে চুপ করে গেল। ওরা অনেকটা কাছে এসে পড়েছে।

তিন থেকে পাঁচ হয়ে ওরা ছড়িয়ে দাঁড়াল। ঈপ্সিতা যেন ইচ্ছে করেই একটু তফাত রেখে দাঁড়িয়েছে। ছায়ার জন্যেও হতে পারে। কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল।

চন্দনা বলল, আর একটু হলেই তোদের পিকনিকের দফারফা হত। একটা গাড়ি প্রায় চাপা দিয়ে যাচ্ছিল আমায়।

কি ভাগ্যিস দেয়নি!' বুক পকেট থেকে সিগারেট বের করে হাতে ঠুকতে ঠুকতে উসিত বলল, আমি বিধবা হয়ে যেতাম।

আঃ! এতো আনসিমপ্যাথেটিক তো বা! চন্দনা বলল, কালো শার্ট পরে এসেছিস কেন? তোকে তো এখনই বিধবা বিধবা লাগছে।'

মেড ইন জারমানি। শার্টটা খারাপ?'

না রে বেশ আনইউজুয়াল। একটু খালাসি খালাসি লাগে এই যা। চন্দনা হাসল। কে দিল?

খালাসির বড়দা প্রেজেন্ট করেছে–'

আমাদের জন্যেও কিছু আনতে বললে পারিস।' এই পল্লব তুই এতো চুপচাপ কেন?'

'কিছু না। এমনিই–

দূরে থেকে তাকিয়ে ঈপ্সিতা বলল দু তিন দিন থেকেই তোকে গম্ভীর দেখছি। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে—

পল্লব হাসল। জবাব দিল না। রজত না এসে পৌঁছুনো পর্যন্ত স্বস্তি নেই। সে যে সাতটায় পৌঁছুতে পারবে দেরি নেই বেশী। অনেক দূর পর্যন্ত চতুর দিকে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল পল্লব।

পিনাকী এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। ঈপ্সিতাকে কথা বলতে দেখে এগিয়ে এসে বলল ঈপ্সিতা, চিউইংগাম খাবে?'

কী?'

চিউইংগাম—

ভুরু কুঁচকে তাকাল ঈপ্সিতা।

সকালবেলায় কেউ চিউইংগাম খায় না'

চিউইংগামের আবার সকাল বিকেল কি!' পিনাকী মরিয়া হয়ে বলল মুখটা ফ্রেশ থাকে।

ঈপ্সিতা মুখ ঘুরিয়ে নিল। হাসি লুকোতে চন্দনাও। উসিত বলল, বোল্ড হলে উইকেট আঁকড়ে থাকার মানে হয় না পিনাকী। তুই প্রোগ্রামটাই চালিয়ে যা—'

পিনাকীর চোখমুখ কাদা। ফুটপাথ থেকে ব্যস্তভাবে ব্যাগটা তুলে নিয়ে

ও দৌড়ে গেল রেলিংয়ের দিকে। ওখান থেকেই ডাকল, 'পল্লব, শোন—'

ঠিক তক্ষুণি জোরালো বাঁক নিয়ে পর পর একটা অ্যামবাসাডর আর একটা ফীয়াট ব্রেক কষতে কষতে থেমে দাঁড়াল ওদের সামনে।

প্রথম গাড়িটার দরজা খুলে চটপট নেমে এলো শর্মিলা।

'তোরা এসে গেছিস?' চোখ খুলে একবার সকলের মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে শর্মিলা জিজ্ঞেস করল, 'টুপুর আসেনি?'

চন্দনা এগিয়ে এসে বলল, 'রজতকেও তো দেখছি না—'

'রজত এলো না এলো তাতে কিছু যায় আসে না। অতো সাধাসাধি কে করবে!'

ততোক্ষণে অশোক, সন্দীপও নেমে এসেছিল গাড়ি থেকে। শর্মিলাকে চিন্তিত দেখে সন্দীপ বলল, 'রজত কোন জন?'

'আপনি দেখেননি। সেই যে, যাকে পুলিসে নিয়ে গিয়েছিল—'

'আই সী।'

সন্দীপ একটা কাঁধ ঝাঁকানোর ভঙ্গি করল। পাশে অশোক, আঙুলের ফাঁকে সিগার জ্বালিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। চোখমুখ ফোলা দেখে মনে হয় এইমাত্র উঠে এলো ঘুম থেকে।

অল্প দূরে পল্লবকে সঙ্গে নিয়ে পিকনিকের প্রথম শটটা নেবার তোড়জোড় করছিল পিনাকী। ওরা এসে পড়ায় নিরস্ত হলো। পল্লব দেখল এগিয়ে গিয়ে ঈপ্সিতার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছে শর্মিলা—ভীষণ ব্যস্ত আর চিন্তিত যেন, এসেই ছটফট করতে শুরু করেছে। ওর আগের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল পল্লব। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'ওই মেয়েটাকে আমি একদিন ঝাড়ব।'

'কেন!'

'রজত সম্পর্কে কীভাবে বলল শুনলি! বন্ধুকে বন্ধু বলে পরিচয় দিতে পারে না -যেন পুলিসে ধরেছিল এটাই রজতের একমাত্র পরিচয়!'

'ঝাড়াঝাড়িব মামলায় যাস না। ওর হাসব্যান্ডের চেহারাটা দেখেছিস, তোর মতো দুটোকে একসঙ্গে '

'রাখ।' অল্প হাঁ ক'রে দু' আঙুলে ঠোঁটের কোণ ঘষতে লাগল পল্লব; তারপর বলল 'মেজাজের বারোটা বাজিয়ে দিল। রজত না এলে আমি আজ যাচ্ছি না। অসিতকে বলছি। তুইও যাবি না—'

'বাড়িতে নো মীল করে এসেছি।'

'তোর সেন্স্ অফ ডিগনিটি কম। এই জন্যেই ঈপ্সিতা তোকে পাত্তা দেয় না--।' সামনের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল পল্লব, বলতে না বলতেই চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হঠাৎ। প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'আ গিয়া গুরু—'

এইমাত্র একটা ট্যাক্সি এসে থামল ওদিকের রাস্তায়। রজত নামল, সঙ্গে সঙ্গে টুপুর। মুহূর্তের জন্যে দ্রুত ধাববান একটা ফাঁকা বাসের আড়াল হয়ে

গেল ওরা।

বাসটা পেরিয়ে যাবার পর রজত তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এ'লও যেখানে নেমেছিল ট্যাক্সি থেকে সেখানেই খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে যে যেখানে ছিল তাকিয়ে দেখে নিল টুপুর। সবুজ পাড় হলদে জমির শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ। বাহুল্যবর্জিত, একটু বা গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হাঁটায় তাড়া নেই কোনো। ফ্ল্যাটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশোক আর সন্দীপ, তাদের দিকে সোজাসুজি না এসে অন্য গাড়িটা ঘুরে চন্দনা ঈপ্সিতাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে কিছু বলবার আগেই শর্মিলা ছুটে এসে বলল, 'এতো দেরি করলি!'

'দেরি! মোটে তো সাড়ে সাতটা—'

'তাড়াহুড়োর জন্যে সন্দীপদা বেচারার ভালো করে চা খাওয়া হলো না! দেরি হবে জানলে তাড়া করতাম না।'

'আমরা দাঁড়াচ্ছি, তুই চা খাইয়ে নিয়ে আয়।' রহস্য করে হাসল টুপুর, 'নাকি তোর সন্দীপদার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে?'

'কী ব্যাপার বল তো! এতো কাটা কাটা কথা বলছিস!' শর্মিলা বলল, 'ঝগড়া করলি নাকি রজতের সঙ্গে!'

'রজত থাকলেই কি ঝগড়া হয়! দেখলি তো ট্যাক্সিতে এলাম।'

'সেটা না করলেই ভালো করতিস!'

অনেকক্ষণ ধরেই একটা কথা না ভাববার চেষ্টা করছে টুপুর, ঠিক সেই কথাটাই তাকে ভাবিয়ে দিল শর্মিলা। কানের পিছনে তাপের সঞ্চার হতেই ও বুঝতে পারল লাল হয়ে উঠছে মুখ, দূরে তাকিয়ে দেখল সন্দীপ, অশোক, পল্লব, অসিত, রজত, সবাই মিলে কখন জটলা তৈরি করে ফেলেছে একটা, আর একটু দূরে চুল আঁচড়াচ্ছে পিনাকী। সন্দীপের মুখ এদিকে—চোখাচোখি হবার ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিল টুপুর। শর্মিলা এখনো জানে না সে জানে। এমন কি হতে পারে সন্দীপকেও ও কিছু বলেছে ইতিমধ্যে! তাহলে সত্যিই লজ্জা হবে। মনের ভিতর চকিত ডুব দিয়ে টুপুর ভাবল যদি সব ঠিকঠাক চলে তাহলে ওই লোকটা, সন্দীপ, হঠাৎ একদিন তার স্বামী হয়ে যেতে পারে। তখন এই বাধো বাধো ভাবটা থাকবে না—তার সবকিছুর ওপর একমাত্র হয়ে দখল বসাবে ও। এই যে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে ফুট্ করে ট্যাক্সিতে উঠে বসল রজতের সঙ্গে, তখন আর তা চলবে না। তার শোয়া বসা ওঠা সবই তখন ওর অধিকারে। সবকিছু! সবই? সে কেমন ব্যাপার! অনেক দূর অব্দি ভাবতে গিয়ে অজানা অনুভূতিতে গা সিরসির করে উঠল টুপুরের। শর্মিলার কথার জের তখনো তিরতির করছে মাথায়। চুপ করে থাকা মানেই তো ধরা দেওয়া! সে বড়ো বাজে হবে।

তেমন কিছু না ভেবেই টুপুর বলল, 'হুকুম মেনে চলতে হবে নাকি!'

'তোদের এই খুনসুটির ব্যাপারটা বুঝছি না!' ঈপ্সিতা কথা বলল এবার, 'একটা ঘোঁট আছে মনে হচ্ছে!'

'ঘোঁট আবার কী! কথাটার জবাব দিলাম।'

এতো নীচু গলায় কখনো কথা বলে না টুপুর। আজই বলছে। চেরা চোখে খুঁটিয়ে টুপুরকে দেখতে লাগল ঈপ্সিতা। তার আড়ালে কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে মনে হলেই রোখ চেপে যায় কেমন। যেমন এখন। শর্মিলা-টুপুরের মধ্যে এমন কথা বিনিময় আগে কখনো শুনেছে বলে মনে পড়ল না। শর্মিলার বিয়ের পর টুপুরের সঙ্গে বেশী করে মিশছিল সে; এখন মনে হচ্ছে আজও দান ছাড়েনি শর্মিলা।

অল্প জ্বালা বোধ করল ঈপ্সিতা। গাড়ি দুটো ওদের, তেমন জানলে সেও গাড়ি দেখাতে পারত শর্মিলাকে। এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন পিকনিকে নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করে দিচ্ছে সবাইকে!

ছেলেদের পুরো দলটা এখন মিলেমিশে একাকার; এগিয়ে আসছে এদিকেই। অশোক হাতছানি দিতেই শর্মিলা ছুটে গেল।

'টুপুর, আজ তোকে প্রেগন্যান্ট উয়োম্যানের মতো লাগছে—যাকে বলে টেম্পটিং।' চন্দনা বলল হঠাৎ, 'সত্যি বলছি, ছেলে হলে প্রেমে পড়ে যেতাম।'

'মেয়েতেই দোষ কী! লেসবিয়ান হয়ে যা—'

'সেটা তোর সঙ্গে।' ঈপ্সিতার দিকে চোখ ঠারল চন্দনা।

টুপুর বলল, 'যতো অসভ্যতা! ওরা শুনবে—'

তিনজনেই তাকিয়ে দূরত্বটা আঁচ করার চেষ্টা করল। মাথা গুনছে সন্দীপ। বোধহয় দুটো গাড়িতে জায়গা হবে কি হবে না তাই নিয়ে। আজকের দিনটা সুন্দর। ঝকঝকে আকাশ, রোদের তাপ কম, হাওয়াও দিচ্ছে থেকে থেকে। এই রোদ ছিল, আবার এক্ষুনি ঘন হয়ে ছায়া ছড়াল চতুর্দিকে। অনেক উঁচুতে তাকিয়ে টুপুর দেখল ছোট্ট হয়ে ডানা ভাসিয়ে রেখেছে কয়েকটা চিল। হাতখানেক লম্বা একটা অ্যারোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। ওর ভিতরে নিশ্চয়ই মানুষ আছে হয়তো অনেকগুলি মানুষ। তারা কারা? দূর থেকে কি চেনা যায় কে কেমন! অতোদূরে আকাশে এখন রোদ না ছায়া কী করে বোঝা যাবে!

ঈপ্সিতা ও চন্দনার দিকে তাকিয়ে অল্প ঠোঁট ফাঁক করে হাসল টুপুর। 'বিয়ে করে শর্মিলাটা বেশ সুখী হয়েছে—'

'অমন সবাই হয়।' ঈপ্সিতা বলল, 'বিয়ের জল গায়ে পড়লে প্রথম প্রথম সবাইকেই সুখী লাগে—'

'সে-কথা নয়—', টুপুর বলল, 'ধর যদি অশোকের সঙ্গে না হয়ে সন্দীপের সঙ্গে বিয়ে হতো শর্মিলার?'

'সন্দীপ কোন দুঃখে বিয়ে করত শর্মিলাকে!'

'কেন!'

'কেন আবার!' মোটা করে বলল ঈপ্সিতা, 'শর্মিলার যা হয়েছে যথেষ্ট!'

চন্দনা বলল, 'যাই বল, আমার কিন্তু সন্দীপকেই বেটার লাগে। বেশ হ্যান্ডসাম আর সোবার—'

একবার পিছনে তাকিয়ে নিয়ে হাসিটা আড়াল করে নিল টুপুর।

'তাহলে তুই লেগে যা—'

'মহাদেবীরা, আপনারা কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন? না যাত্রা শুরু ঘোষণা করা যাবে?'

কথার ফাঁকে অসিত কখন এলো খেয়াল করেনি কেউই। আর, সত্যিসত্যিই, সকলেই যখন এসে গেছে তখন আর দেরি করা কেন! ওরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

'চারজন মেয়ে, ছ'জন ছেলে। টোটাল দশজন।' শর্মিলা বলল, 'যে কোন গাড়িতে উঠবে উঠে পড়ো।'

'দ্যাট্‌স্‌ এ গুড সাজেসান।' অশোক বোধহয় এই প্রথম মুখ খুলল, 'টু অ্যান্ড থ্রি–এই অ্যারেঞ্জমেন্‌টটা যেন ঠিক থাকে। আমি অবশ্য অ্যামবাসাডরের ড্রাইভার!'

'আমি ফীয়াটের। পছন্দ তো?'

কথাটা সন্দীপের। টুপুর লক্ষ করেনি ছুটোছুটির মধ্যে কখন ও সন্দীপেরই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ তুলে দেখল, হাসি-হাসি মুখ করে তারই দিকে তাকিয়ে আছে সন্দীপ। যেন প্রশ্নটা তাকেই। আকস্মিক শীতে কেঁপে উঠল টুপুর।

জবাব না দিলে খারাপ দেখায়। কিন্তু, দেখল ইতিমধ্যেই এক একজন করে উঠতে শুরু করেছে গাড়িতে। টুপুর হাসল এবং এলানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ভালো?'

'ভালো আর কোথায়! এসেই তো দেখছি বন্ধুদের সঙ্গে কনফারেন্সে!'

'যাঃ!'

আর দেরি করা ঠিক নয়। টুপুর নিশ্চিত জানে, ফীয়াটটা সন্দীপই ড্রাইভ করবে এবং সেইজন্যেই সে ফীয়াটে উঠবে না। ওই যে, পল্লব অসিতরা উঠে গেল অ্যামবাসাডরে, রজতও উঠবে। ব্যাগ তুলে আনছে পিনাকী। পিনাকী পৌঁছুনোর আগেই প্রায় পড়ি কি মরি করে ছুটে গিয়ে পিছন থেকে রজতের সার্টের কলারটা চেপে ধরল টুপুর।

'পাজি! শিভলরি জানিস না! আমি পড়ে রইলাম!'

'তুই উঠিস নি! আমি ভাবলাম আজ তোরা লেডিজ সীট দাবি করবি-'

'পাজি!'

শর্মিলা আগেই জায়গা করে নিয়েছে অশোকের পাশে। পিছনের সীটে

অসিত আর পল্লব, রজত ওইখানেই বসবে। ভেবে, দরজা খুলে, শর্মিলার পাশে বসে পড়ল টুপুর।

শর্মিলা কথা বলছিল অশোকের সঙ্গে। হঠাৎ টুপুরকে দেখে বলল, 'তুই এখানে এলি! ওখানে কে থাকল?'

পিছনে তাকিয়ে দেখল সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে তখনো। ফীয়াটের পিছনের সীটে একা ঈপ্সিতা, সামনে চন্দনা। পিনাকী তার এয়ারব্যাগ নিয়ে ও গাড়িতে উঠতে গিয়েও ফিরে আসছে আবার।

'তোরা সব এখানে উঠলি? আমি একা ও গাড়িতে যাব?'

'একা কেন বাবা!' অসিত বলল 'তোমার তো ভালোই হলো। ক্যামেরা লোড করে এনেছ, এখন দু' হাতে ফটো খিঁচে যাও। এখানে আর জায়গা কোথায়?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে', কিছু না বুঝেই আবার ফীয়াটটার দিকে দৌড়ে গেল পিনাকী। সন্দীপও উঠল হাত রাখল গীয়ারে। অশোক ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সন্দীপ, ক্যান উই স্টার্ট?'

'হ্যাঁ, চল।' বলেই বলল সন্দীপ, 'ওয়েট, ওয়েট—'

পিনাকী জায়গা করে নিলেও ঈপ্সিতা নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। এ-গাড়িতে এসে অনুনয় করে বলল, 'এই, লক্ষ্মীটি, তোরা কেউ একজন ও গাড়িতে যা না!'

'কী হলো?' বলেই বুঝতে পারল শর্মিলা, 'উফ, প্রব্লেম!'

'ঠিক আছে, তুই এখানে বোস। আমি যাচ্ছি ও-গাড়িতে—'

গম্ভীর মুখে নেমে যাচ্ছিল রজত, অসিত ওর হাত চেপে ধরল।

'যাবি না। অশোকদার ফরমুলায় এ-গাড়িটা একেবারে ব্যালান্‌স্‌ড্‌ হয়ে আছে। তুই নামলেই চাকা পাংচার হয়ে যাবে।'

চোখেমুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে ঈপ্সিতা বলল, 'প্লীজ—'

শর্মিলা বলল, 'টুপুর, তুই যা না—'

'না—না—'

'ঠিক আছে। চন্দনাকেও এখানে আসতে বলছি। আমরা দু'জনেই ও-গাড়িতে যাই।'

নামবার জন্যে ব্যস্ত হলো শর্মিলা। অসহায় চোখে একবার রজতের দিকে তাকাল টুপুর। ঈপ্সিতার কথায় যায় নি, এখন ওকে যেতে বলা ভালো দেখায় না। তখন ভাবল, আজকে দিনটা শুরু হয়েছে অন্যরকমভাবে, আজ যেন সবই অন্যরকম হবে। এবং নেমে এলো।

চন্দনাকে এ-গাড়িতে পাঠিয়ে শর্মিলা উঠে গেল পিছনের সীটে, পিনাকীর পাশে। টুপুর পৌঁছুবার আগেই বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'তুই সামনে বোস—'

মাথা ঝুঁকিয়ে সন্দীপ ডাকল, 'আসুন—'

একটু আগেই টুপুর জেনেছে, আজ সবই অন্যরকম হবে। না হলে, এই সবাসরি সন্দীপের পাশে বসাটা কিছু নয়, ওই গাড়িতে গিয়ে এঁটে বসবার পরও আবার এখানে ফিরে আসা—এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা আছে। একা শর্মিলাকে দোষ দিয়ে লাভ কী? পিনাকীর দেরি করা, ঈপ্সিতার নেমে যাওয়া, আসতে গিয়েও রজতের থেমে পড়া—তাহলে তো এদের সবাইকেই জড়াতে হয়। এমন তো নয় যে এরা সবাই একসঙ্গে তার মনের ভিতর ঢুকে পড়ে একই সময়ে ছুঁয়ে দেখেছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছড়ানো তার লজ্জাটাকে সুযোগ বুঝে তাকে নিয়ে খেলা করল একটু। তা কী করে হবে! এর মধ্যে রজত ছিল, আর যে যাই করুক—রজত অন্তত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তার সঙ্গে। ও-গাড়ি থেকে নেমে আসবার সময় যখন তাকিয়েছিল রজতের দিকে, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, একবার ডাকলেই রজতও নেমে আসত ঠিক। এতোই যখন অদলবদল হলো তখন পিনাকীটাকেও পাঠিয়ে দেওয়া যেত ও-গাড়িতে। ঈপ্সিতা কি আর একবার করতে পারত ওরকম! ঈপ্সিতা নির্লজ্জ আর অভদ্র হতে পারলে সে কেন একটু নির্লজ্জ হয়ে ডেকে নিতে পারল না রজতকে? এ-রকম তো কতোবারই ডেকে নেয়! আজ কি সত্যি সত্যিই দিনটা অন্যরকম হবে ঠিক ছিল! নাকি লজ্জাই তার দ্বিধাটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আরও তখন, সেই মুহূর্তে, না জেনে না-বুঝেও সে চাইছিল, ওই গাড়িতে সন্দীপ আছে, ওখানে যেতে হলে রজতকেও টেনে আনার মানে হয় না কোনো! হয়তো এটাই সত্যি, সে চায়নি। মাঝে মাঝে নিজেকে বুঝতে এতো অসুবিধে হয়!

ভাবনার মধ্যে গাড়িটা কখন স্টার্ট করে ছুটির রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে সাঁ-সাঁ করে—খেয়াল হতে প্রায় অন্যমনস্কভাবে একবার পাশে তাকিয়ে দেখল টুপুর। সন্দীপের চোখ সামনে, স্টীয়ারিংয়ে হাত রেখে খুব মন দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িটাকে। আজ রবিবার, তার ওপর এখনো সকাল বলেই বোধহয় রাস্তা ফাঁকা। এইভাবে চললে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যাবে। চন্দনা বলেছিল, হ্যাণ্ডসাম আর সোবার; চন্দনা যেখানে বসেছিল, এখন সে-ই বসে আছে সেখানে। বুকের মধ্যে একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ভেঙে ছড়িয়ে দিতে দিতে টুপুর ভাবল, হয়তো এইরকমই হয়। যদি তা না হতো, তাহলে এখন ঠিক এই সময়ে, সে আর রজত ব্যাণ্ডেল কিংবা ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেনে উঠে বসতে পারত!

প্ল্যানটা রজতেরই ছিল। সকালে কথামতো লাল ডাকবাক্সটার সামনে এসে পৌঁছেছিল ঠিক সময়ে। বলতে কি, ভোররাতে শেখরের সঙ্গে ওইসব কথাবার্তার পর মনের বিশৃঙ্খলা নিয়ে এতোই ছড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে যে গুছিয়ে বেরুতে বেরুতে দেরি হয়ে যায়।

'তুই বলেছিস বলেই এলাম।' রজত বলল, 'আমার একেবারেই যেতে ইচ্ছে করছে না। অস্বস্তি লাগছে।'

'চল না, বাবা! সবাই-ই তো যাচ্ছে—'

'তোর খুব ইচ্ছে?'

'খুব বলে কিছু নয়। বেরিয়েই যখন পড়েছি—'

খানিকটা হেঁটে এসে রজত বলল, 'টুপুর, শোন, বেরিয়েই যখন পড়েছিস বলছিস, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই আজ?'

'ও মা! কোথায়?'

'ব্যাণ্ডেল কিংবা ডায়মণ্ডহারবার। ট্রেনে। দাদার টাকাটা কাল পেয়েছি, আমার সঙ্গে আছে। কোনো অসুবিধে হবে না। কাল ওদের বানিয়ে বলে দিস একটা কিছু।'

'শর্মিলাকে তো চিনিস না!' অল্প ভেবে বলল টুপুর, 'দেরি দেখলে বাড়িতেই চলে আসবে খোঁজ করতে। তখন? বাড়িতে তো বলে এলাম পিকনিকে যাচ্ছি।'

'ও।' যেতে যেতেই রাস্তার মাঝখানে থেমে দাঁড়াল রজত, 'তাহলে তুই বাড়ি চলে যা- একটা কিছু বলে কাটিয়ে দিস ওদের। আমি ঘন্টাখানেক ঘন্টা দেড়েক বাদে ঘুরে আসছি।'

'না, রজত। থাক।' টুপুর বলল, 'বলেইছি যখন যাই। একবেলার তো ব্যাপার! তোর সঙ্গে আর একদিন যাব।'

তাড়াতাড়ি পৌঁছুবার জন্যে রজত নিজেই তারপর ট্যাক্সি ডেকেছিল। ওই গাড়িতে বসে বসে তো অস্বস্তিটা এখন নিশ্চয়ই বেড়ে যাচ্ছে আরও। হয়তো এরই জন্যে আজ আবার চেঁচামেচি করবে।

টুপুর দেখল অ্যামবাসাডরটা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। অশোকের পাশে ঈপ্সিতা। পাশে চন্দনা। ওরা পিছনে। এখান থেকে চিৎকার করলেও শুনতে পাবে না।

'এই পিনাক, তুই এত চুপচাপ কেন?' গাড়ি ছাড়ার [illegible] এইমাত্র কথা বলল শর্মিলা, 'একেবারে গোঁজ হয়ে বসে আছিস'

'একটা হারমোনিয়াম এনে দিলি না কেন, চেঁচিয়ে গান গাইতাম।'

[illegible] গলা পিনাকীর, রাগটা আড়াল করতে পারে না। 'বেচারা!' শর্মিলা ওর জানুর ওপর হাত রাখল, তারপর আদর করার মতো বুলিয়ে গেল আস্তে।

'তোকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব। ব্যাপারটা কারুরই ভালো লাগেনি।'

'এটা ইনসাল্ট! আমি কি সেধে—'

'জানি।' সন্দীপ আছে দেখে তাড়াতাড়ি ওকে থামিয়ে দিল শর্মিলা, 'আমরা তো সবই দেখলাম। এতো ডাঁট ভালো নয়।'

'ডাঁট কি করে ভাঙতে হয় আমি জানি—'

পিনাকী থামছে না দেখে শর্মিলা ওর উরু খামচে ধরল, তাকাল ভুরু পাকিয়ে। বোধহয় বুঝেছে। তখন হাসল সহজ করে।

'তুই ক্যামেরাটা এনে ভালোই করেছিস, পিনাকী। যা তো তাড়াহুড়োর মধ্যে করতে হলো সব—আমাদের কারুরই মনে পড়েনি।'

'যা বলেছ—', সন্দীপ বলল, 'পিকনিকে গেলে, কিন্তু তার কোনো স্মৃতি ধরে রাখা গেল না, সে বড়ো বাজে ব্যাপার।'

'স্মৃতি তো মনে।' শর্মিলা বলল, 'তার জন্যে ছবি তুলে রাখার দরকার কী!'

'মনেরটা মনেই থাকে, সে তো সকলকে দেখানো যায় না।' মিররে ভাসছে পিনাকীর আধখানা মুখ, সেদিকে তাকিয়ে চুপচাপ হাসল সন্দীপ, 'এক্সট্রা রোল এনেছ তো?'

পিনাকী ঘাড় নাড়ল। কোনরকমে বলল, 'হ্যাঁ—।' ক্যামেরার ব্যাপারটা এতোক্ষণে সম্পূর্ণ গুলিয়ে গেছে তার মাথায়, রাগে আর অপমানে এখনো রি-রি করছে শরীর, আশেপাশে কেউ না থাকলে এতোক্ষণে হয়তো সজোরে ক্যামেরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিত রাস্তায়—যাতে চৌচির হয়ে টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। কাজে তা করতে না পারলেও টুকরোগুলো ছড়িয়ে গেছে বুকে। অথচ, কাল থেকেই কতো আগ্রহ নিয়ে ছবি তোলার ইচ্ছেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো করেছিল সে! সন্ধ্যেবেলায় ঈপ্সিতা আর ওর মার সঙ্গে দেখা হবার পরই ছবি তোলার আইডিয়াটা মাথায় এসেছিল তার—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিল্‌ম্ কিনতে ছুটে গিয়েছিল দোকানে। সবই শালা ফালতু, বেলুনের মতো ফাঁপা—এক ছুঁচেই চুপসে গেল! মনে মনে রোজই সে অনেকবার চুমু খেত ঈপ্সিতাকে, হাত বোলাত ওর মসৃণ কপালে, টানা ভুরুতে আর নরম গালে। এখন ইচ্ছে করছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে ওই জায়গাগুলো অন্যরকম করে দিতে। এতোদিন বন্ধুদের সব ঠাট্টা-ইয়ার্কি হজম করে গেছে একদিন হুট্ করে কিছু একটা হয়ে যাবে ভেবে; ভেবেছিল, এই করতে করতেই একদিন ঈপ্সিতা ডেকে নেবে তাকে। কিন্তু, আজ সে গাড়িতে উঠতেই যেভাবে নেমে গেল ঈপ্সিতা, কোনো বন্ধু কেন, একটা কুকুরও তাতে অপমান বোধ করত। এই মেয়ের পিছনে এতোকাল ঘুরঘুর করে কাটিয়েছে সে- টানা দু'তিন বছর!

পিনাকীর ইচ্ছে করছে সুইসাইড্ করতে। ঘটনাটা সকলের সামনে ঘটল বলেই আরও ছোট লাগছে নিজেকে। এখনো দেখা হয়নি কারও সঙ্গে, কিন্তু, দেখা হলে ওরা গায়ে থুতুটুতু দেবে না তো! ইস্! কী দরকার আর পিকনিকে গিয়ে! নেমে যাবে?

দুঃখে অস্থির, দিশেহারার মতো ঠোঁট কামড়ে ধরল পিনাকী। উরুর ওপর

থেকে হাতটা এখনো তুলে নেয়নি শর্মিলা—বোধহয় ভুলেই গেছে। লম্ব আঙুলে জ্বলজ্বল করছে আংটির লাল পাথর, বোধহয় ওয়েডিং রিং। হাতটা শর্মিলার কেন! সান্ত্বনা দিচ্ছে? সত্যি, মেয়েগুলোকে কিছুতেই বুঝবার উপায় নেই! এই ধৃতিকান্তর সঙ্গে রগড়ারগড়ি করল কিছুদিন, তারপরেই অশোককে বিয়ে, আবার এখন হাত বোলাচ্ছে আমার উরুতে! যেভাবে চলে এলো এ-গাড়িতে, সন্দীপের সঙ্গেও কিছু আছে কি না কে জানে! বরং টুপুর পাশে এসে বসলে একটু গল্পটল্প করা যেত। সন্দীপের পাশে অমন কাঠ হয়ে বসে থাকার কোনো মানে হয় না টুপুরের। শর্মিলাকে কি বলবে, তুই উঠে যা—টুপুরকে বসতে দে এখানে?

পিনাকী হঠাৎ কোণের দিকে সরে যেতেই চমকে হাতটা সরিয়ে নিল শর্মিলা। মনে হচ্ছে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে এখন। বেচারা! বোকা বলেই আজ অমন ঘা খেলো।

'সন্দীপদা, আমরা কতোটা এলাম?'

'অনেকটাই।' ঘড়ি দেখে বলল সন্দীপ, 'প্রায় আধঘন্টা। কিন্তু, তোমরা আমাকে শুধু ড্রাইভার করে রাখবে জানলে আমি আজ আসতাম না।'

'ও মা, তা কেন!' শর্মিলা বলল, 'আপনিই আজকের চীফ গেস্ট। আপনি এলেন বলেই যাওয়াটা হলো।'

'তাই কি?' সন্দীপ হাসল। থেমে বলল, 'একজনকে তো ম্যানেজ করলে। কিন্তু আর একজনের ব্যাপার কি? উনি কি রবিবার কথা বলেন না?'

'কে! টুপুর?' শর্মিলা সময় নিল একটু, 'আমি কেন! যে যার পাশের জনকে ম্যানেজ করবে। ওর দায় আপনার।'

'আ-হা!' টুপুর জানত, এইসব কথাবার্তায় ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়বে সে, তখন আর উপায় থাকবে না। এই সন্দীপের সঙ্গে খুব খোলামেলাভাবে কথা বলেছিল ক'দিন আগে; অথচ, লজ্জা আজ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলছে তাকে। ঠিক এই মুহূর্তটিতেও সন্দীপের হাত থেকে ছিটকে আসা পুরনো বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গেল ওর সর্বাঙ্গে। আড়ষ্ট গলায় বলল, 'আমি কি বলেছি কথা বলব না!'

'বলেননি। কিন্তু বলছেনও তো না!'

সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে সন্দীপ, আড়চোখে তাকিয়ে দেখল টুপুর, কথা বন্ধ করলেও হাসিটা লেগেই থাকে ওর ঠোঁটের কোণে! পাশের রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে একটা বেয়াড়া ট্রাক সামনে এসে পড়ল, হর্ন দিতে দিতে সাবধানে সেটাকে পাশ কাটিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল সন্দীপ। গীয়ার বদলে স্পীড তুলল। অ্যামবাসাডরটা হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল কোথায়, আবার দেখা যাচ্ছে দূরে। যেভাবে পিঠ সোজা করে বসেছে সন্দীপ, মনে হয় আগের গাড়িটার পুরো নাগাল না-পাওয়া পর্যন্ত কথা বলবে না

নার। ওর লম্বা, রোমশ হাতটায় চোখ রাখল টুপুর। আলাদা করে দেখলে পুরুষ সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। রিস্টওয়াচটা আকারে বড়ো, কিন্তু এমন-ভাবে কব্জি আঁকড়ে আছে যেন ঠিক ওই হাতটার জন্যেই তৈরি হয়েছিল। দেখতে দেখতে লজ্জাটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল টুপুর। হাওয়ায় এলো-মেলো আঁচলটা গুছিয়ে নিল কাঁধের ওপর।

'আপনার বোধহয় ওই গাড়িতে যাবার ইচ্ছে ছিল—,' সন্দীপ বলল, 'আমি কিন্তু জোর করে আনিনি—'

'জোর করবেন কেন' আমি নিজেই এসেছি—'

'নিজেই!' একবার টুপুরের দিকে তাকিয়ে নিল সন্দীপ, 'অ,চ্ছা!'

শর্মিলা বলল, 'এরপর আবার জিজ্ঞেস করবেন না যেন আপনার টানে কিনা!'

সন্দীপ হেসে উঠল উঁচু গলায়। নিঃশব্দে হলেও, দেখাদেখি টুপুরও। এখন অনেকটা সহজ লাগছে।

'না, তা করব না। তবে—', সন্দীপ বলল, 'লেট মী টেল ইউ দ্য ট্রুথ। আমি কিন্তু মনে মনে চাইছিলুম উনি এ-গাড়িতে আসুন—'

'সে কি, কেন!' পিছন থেকে ঝুঁকে এসে টুপুরের পিঠে খোঁচা দিল শর্মিলা, 'এই পক্ষপাতের মানে কী?'

'তা তো জানি না' যা সত্যি তাই বললাম। বলতে পারো ইচ্ছা—ইচ্ছাশক্তি—'

পিনাকী হঠাৎ বলল, হাত দেখতে জানেন। মন্ত্রটন্ত্রও জানেন না কি?'

'না, ভাই। তাহলে তো অনেক ব্যাপারই ম্যানেজ করতে পারতাম। তোমার ব্যাপারটাও।' এতোক্ষণে যেন পিনাকীর প্রসঙ্গে ফিরে আসবার চেষ্টা করল সন্দীপ, 'অনেস্টলি! বলতে পারো হাফ-মন্তব। ওই টুপুর নামটার মতো—

টুপুর বলল, 'তার মানে!'

'আপনার ভালো নামও কি টুপুর?'

'তাই-ই তো!'

'হলো না। ওর আগে একটা টাপুর আছে। সেদিন আলাপ হবার পর থেকেই ভাবছি- বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে। ঠিক কি না, বলুন?'

'জানি না।'

কানের লতি ছুঁয়ে নিজেকে আবার গুটিয়ে নিল টুপুর। ঢেউতোলা নদীর মতো কী একটা বয়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে, কখনো বা অল্প ধাক্কায় মাটি খসিয়ে যাচ্ছে পাড়ের। ঠিক বুঝতে পারছে না এ-সব কথা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে। ঠিক-ঠিক মানে না বুঝেও ঝিনুক কুড়নোর মতো কেন সে প্রত্যেকটা কথাই তুলে রাখছে কানে। এই কি ভালো লাগা?'

এই মুহূর্তে মনের সমস্ত দ্বিধা নিয়ে পৃথিবীর আলো হাওয়ায় ছড়িয়ে

পড়ছে একরকম ঐশ্বর্য; বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতার মধ্যে টুপুর দেখতে পায় তার বিভিন্ন রঙ খামখেয়ালি অনুভূত হয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার লুকানো শরীর ও শরীরের ভিতর তালাবন্ধ ছোট ছোট ঘরগুলোকে। দূর থেকে চোখ তুলে নিয়ে পাতা বুঁজে রাখে সে; যাওয়ার এই দুরন্ত গতি থেকে উঠে আসা হাওয়ার সামনে সম্পূর্ণ অবারিত করে দেয় নিজেকে—যা ইচ্ছে করুক তারা; যেমনভাবে ইচ্ছে খেলা করুক তাকে নিয়ে। বড়ো পল্কা তার অবরোধ কখনো নড়ছে আর অসম্মতি জানিয়ে ছটফট করছে কখনো; কিন্তু, হাওয়া অল্প ঝোড়ো হলেই নির্দ্বিধায় খুলে দেবে নিজেদের। গাছের গা বেয়ে গড়ানো আঠার মতো তাদের ভিতর থেকে ঝরে পড়বে একরকম সুখ! কেমন ধরন তার সে বুঝতে পারে না একটুও, বুঝতে পারে না তার আবির্ভাবের রহস্য। প্রায় সুখকর একরকম অনুভূতির মধ্যে সে শুধু চিনে নেয় নিজের অন্ধকার প্রস্তুতি-গুলোকে। মনে হয় এরই জন্যে তৈরি হয়েছিল সে; এই যে বাস্তব-অবাস্তব কল্পনার রঙে এতোকাল ধরে চকচকে করেছে তার সমগ্র অস্তিত্বকে, তা শুধুই এই অনুভূতির সামনে নিজেকে চিহ্নিত করার জন্যে। ইচ্ছে করছে এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে রাখতে নিজেকে, আরও অনেকক্ষণ। এইভাবে একটার পর একটা দিন চলে গেলেও এতোটুকু কষ্ট হবে না তার। এখন সে কথা বলবে না বা অন্য কিছুও করবে না—টানটান করে বাঁধা তারে বেজে উঠছে যে-ধ্বনি সে একাই কান পেতে রাখবে তাতে। এ-সব বলা যায় নাকি কাউকে? সে বড়ো লজ্জার! না, টুপুর পারবে না।

সত্যি সত্যিই তারপর কী হলো, কে কী বলল, ঠিক ঠিক শুনতে পেল না টুপুর। গাড়িটা একজন চালাচ্ছে বলেই অনুভব করছে তার উপস্থিতি, না হলে সে একা।

সাড় পেল শর্মিলার ডাকে।

'কী রে, যাবি তো বল?'

'কোথায়!'

'তুই কি ভাবছিস বল তো! এতো কথা—আমি দুর্গাপুর যাবার কথা বলছিলাম আমার সংগে। যাবি?'

'তের ওখানে? সে তো আগেই বলেছিস।' থেমে থেমে বলল টুপুর, 'দেখি। গেলেই হয়। মাকে বলতে হবে—'

'সে আমি বলব।'

'সন্দীপদার অফারটা দারুণ—', পিনাকী বলল, 'তিন ঘরের একটা পুরো কোয়ার্টার্স, বুঝলি টুপুর, রজত-টজতকে বলি। আমরা দল বেঁধে যেতে পারি।'

ভুরু তুলে রজতের দিকে তাকাল শর্মিলা। কিছুটা অস্বস্তি মেশানো। 'ঈপ্সিতাকেও নিবি তো?'

পিনাকী মুখ ঘুরিয়ে নিল। খানিক চুপচাপ। প্রশ্নটা নিজেই হারিয়ে গেল।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, 'তুই কবে যাচ্ছিস দুর্গাপুরে?'

'সন্দীপদা আর ও কাল ফিরবে। আমি হয়তো আরও তিন চারদিন থাকব।' শর্মিলা বলল, 'কলকাতা ছাড়তে একদম ভালো লাগে না।'

'আপনি কালই যাচ্ছেন?'

অসাবধানেই সম্ভবত, কথাটায় একটু জোর দিয়ে ফেলেছিল টুপুর। সন্দীপ ফিরে তাকাল। হাসল।

'সে-রকমই তো ঠিক আছে। আমি এসেছিলাম পাশপোর্ট ঠিক করাতে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কেও কাজ ছিল কিছু। হয়ে গেছে—। ওখানেও অনেক কাজ।'

'সন্দীপদা আবার জার্মানী যাচ্ছে, জানিস তো!'

আগের প্রশ্নটার জেরেই তখনো ঘামছিল টুপুর। শর্মিলার কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে গেল আবার। বেলা বাড়ছে, কিছুক্ষণ থেকেই রোদ্দুরের তাপ টের পাচ্ছিল। শহর ছাড়িয়ে এসেছে অনেকক্ষণ. এদিকে দু' ধারে মাঠ, পুকুর, গাছগাছালি থাকলেও হাওয়া কম। কাচের ভিতর দিয়ে মুখোমুখি রোদের ঝাঁঝ এড়ানোর জন্যে ঈষৎ বেঁকে বসল টুপুর, হাত বাড়িয়ে কভারটা নামিয়ে নিল একটু। সোজা যেতে যেতে রাস্তাটা হঠাৎই ঘুরে গেছে ডানদিকে। ওদের গাড়িটা খানিক আগে পর্যন্তও চোখে চোখে ছিল এখন আবার দেখা যাচ্ছে না। টুপুরের মনে হলো, এবার থামা দরকার।

সন্দীপদা, জোরে চালান।' শর্মিলা বলল, 'ওদের তো দেখাই যাচ্ছে না আর '

'ফলো করার কথা ছিল—। অশোকই স্পীড্ মেনটেন করছে না।' সন্দীপ খাড়া হয়ে বসল। হাত তুলে চিবুক মুছে নিল, 'বোরিং লাগছে, তাই না? উই নীড সাম থ্রিল। চলো ওদের ওভারটেক করি।'

হঠাৎই ঝাঁকুনি দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে শুরু করল গাড়িটা। একটা বাজার মতন জায়গা, কিছু ভিড়—এঁকে-বেঁকে কিছুটা বেপরোয়াভাবে ভিড় কাটিয়ে গাড়িটা বের করে আনল সন্দীপ; তারপর স্পীড্ বাড়িয়ে দিল আরও। সামনে একটা গরুর গাড়ি. হর্ন শুনেও যেন ঠিক করতে পারছে না কোনদিকে যাবে। সন্দীপ তবু স্পীড্ কমাচ্ছে না। কিছুটা ভয় পেয়েই টুপুর বলে উঠল, 'এ কি! অ্যাক্সিডেন্ট হবে যে!' এবং প্রকৃত আশঙ্কায় সরে এলো জায়গা থেকে।

গাড়িটার প্রায় গায়ের ওপর দিয়ে ভ্রূক্ষেপহীন বেরিয়ে এসে হাসল সন্দীপ; স্টীয়ারিং থেকে হাত তুলে আলতোভাবে রাখল টুপুরের কাঁধে।

'ভয় পাচ্ছ!'

সন্দীপের হাত এবং সম্বোধন দুই-ই ছুঁয়ে গেল টুপুরকে। একবার ঘাড়

ফিরিয়ে শর্মিলা আর পিনাকীকে দেখবার চেষ্টা করল ও। শর্মিলা রাস্তা দেখছে—এক্ষুনি যা ঘটে গেল তা লক্ষ করেছে কিনা বোঝা যায় না পিনাকীও চুপচাপ; খানিক আগে দু' একটা কথা বললেও আবার ডুবে গেছে নিজের মধ্যে। দূরে অ্যামবাসাডরটা আবার ভেসে উঠল চোখে। একই হাসি এখনো লেগে আছে সন্দীপের ঠোঁটের কোণে। একই স্পীড্ গাড়িতে। রাস্তা খুব চওড়া নয়, ও-গাড়িটাও জায়গা ছাড়ছে না। স্পীডোমিটারের কাঁটা আশি ছাড়িয়ে গেল। তবু, যেভাবে হর্ন দিতে দিতে এগোচ্ছে সন্দীপ, মনে হয় যে-কোনোভাবেই হোক, ওভারটেক করবেই।

উত্তেজনায় সামনের সীটের ওপর ঝুঁকে এলো শর্মিলা।

'সন্দীপদা, বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু—'

'আমাকে ডিপেন্ডেব্‌ল্ মনে হয় না!'

'পিকনিক করতে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করলে কি ভালো হবে!'

'তোমার অবশ্য দুটো ভয়—নিজেকে নিয়ে আর অশোককে নিয়ে। আমারও কি প্রাণের ভয় নেই!'

আর দু' এক মুহূর্তের মধ্যে দুটো গাড়িই একই পয়েন্টে পৌঁছে যাবে। রাস্তার ঢাল দেখে গাড়িটা কাৎ করে নিল সন্দীপ। টুপুর প্রায় ওর হাত ধরে ফেলেছিল, কোনোরকমে সংযত করল নিজেকে। অশোক ছাড়া ও-গাড়ির সবাই তাকিয়ে আছে পিছনে। মুহূর্তের জন্যে রজতের চোখে চোখ রাখল টুপুর। একেবারে গায়ে গায়ে। মনে হচ্ছে হাল ছেড়ে দিয়েছে অশোক। শেষ পর্যন্ত অ্যামবাসাডরটাকে পেরিয়ে গিয়ে চোয়াল ছড়িয়ে দিয়ে হাসল সন্দীপ।

'সো! উই ক্যুড্ মেক ইট! আশা করি অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি।'

'ও আপনাকে ছেড়ে দিল।'

'ছেড়ে দেবে কেন?' টুপুর বলল, 'পারল না বল!'

'বাঃ! এরই মধ্যে!' শর্মিলা বলল, 'তুইও ছেড়ে দিলি নাকি নিজেকে!'

কথাটায় মানে আছে। শর্মিলাকে ভ্রূকুটি করবার জন্যে পিছনে তাকিয়ে থেমে গেল টুপুর। পিছনের গাড়িটা খুব দূরে নেই। দেখল, কাছাকাছি বসে হাসহাসি করছে অশোক আর ঈপ্সিতা, অনেকটা তফাতে চন্দনা—একটু বা থমথমে মুখ। আভাসে অসিতকে দেখা গেলেও রজত বা পল্লব কেউই স্পষ্ট হলো না।

ঈপ্সিতা বলল, 'লজ্জা করল না, বউ ছাড়িয়ে গেল আপনাকে!'

'বউ বলেই যেতে দিলাম। তাছাড়া—', অশোক বলল, 'হঠাৎ মনে হলো দেরি করে পৌঁছুলে আমারই লাভ।'

'কেন!'

'এই যে তুমি বসে আছ আমার পাশে—আমি একটি সুন্দরী মেয়ের

শরীরের গন্ধ পাচ্ছি, থামলেই তো সব হারিয়ে যাবে! সন্দীপ এটা বুঝবে না। ওর কাছে স্পীডই সব।'

'এতো বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলেন কেন!'

চন্দনা দেখল, অশোকের হাঁটুতে চিমটি কাটল ঈপ্সিতা, যেন অশোকের সঙ্গে ওর অনেক দিনের আলাপ! গাড়িতে ওঠার পর থেকে ও একাই কথা বলে যাচ্ছে প্রায়। গোড়ার দিকে অসিত কয়েকটা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছিল, তারপর থেকে সবাই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। পল্লব আর রজত আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। এ কীরকম আনন্দ করতে যাওয়া! যেন একসঙ্গে মোটরে নয়, দুটো স্টেশনের মাঝামাঝি ট্রেনের কামরায় বসে আছে ক'জন যাত্রী। এক ঈপ্সিতা আর অশোক ছাড়া কেউ কাউকে চেনে বলে মনে হয় না। মাঝখানে ভেবেছিল রজতদের কাউকে বলে, তোরা একজন সামনে এসে বোস, আমাকে ধরে রাখ তোদের মাঝখানে। মেয়ে হলে বুঝতে পারতিস কেন এমন ভাবছি—কেন ঈপ্সিতার পাশে বসে থাকাটা এমন অসহ্য লাগছে আমার!

গরম বাড়ছে ক্রমশ। মুঠো থেকে রুমাল বের করে গলার ওপর থুপ থুপ করে ঠুকতে লাগল চন্দনা। দেখাদেখি পুরো আঁচলটাই মুঠোয় ধরে কপালের ওপর নিয়ে এলো ঈপ্সিতা।

'সত্যি রে! কী গরম আজ!'

পিছন থেকে অসিত বলল, 'ঈপ্সিতা, চিউইংগাম খাবে?'

'ইয়ার্কি মারিস না—।'

'আছে নাকি চিউইংগাম?' অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আমি খেতে পারি—'

অসিত বলল, 'ঈপ্সিতা জানে কোথায় আছে—'

'যতো বাজে কথা!' গলায় ঝাঁঝ স্পষ্ট। অনেকক্ষণ পরে নড়েচড়ে গুছিয়ে বসল ঈপ্সিতা জায়গা ছেড়ে। যেন এতোক্ষণে বুঝতে পারল অশোকের সঙ্গে তার একটা দূরত্ব আছে এবং থাকা উচিত। অপ্রস্তুতভাবে হাসল চন্দনার দিকে তাকিয়ে।

'কী চীজ মাইরি!' চাপা গলায় রজতকে বলল অসিত, 'পিনাকটাকে ল্যাং দিয়ে এখানে এসে রগড়াচ্ছে। অশোক আজ ওকে বোতল না চুষিয়ে ছাড়বে না।'

বিরক্তি মেশানো চোখে অসিতের দিকে তাকাল রজত, কথা বলল না। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পিছনে কাচের গায়ে গায়ে রাখা পুরনো খবরের কাগজ জড়ানো বোতল দুটো গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঠোকাঠুকি করছে। আলগা হয়ে এসেছে মোড়ক দুটো; কালো ছিপির ওপর সোনালি হরফ—রোদ লেগে ঝাপসা। 'স্কচ্!' গাড়িতে উঠেই বোতল দুটো আবিষ্কার করেছিল অসিত, 'বড়দা তালাচাবি দিয়ে রাখে। ঝাড়া যায় না। আজ দিল খুলে হুইস্কি খাবো। মাতাল হবো। তারপর নিজের পাছায় নিজেই লাথি ঝাড়ব।' রজত অতশত ভাবতে পারেনি। শুধু ভেবেছিল, নিশ্চয়ই অনেক দাম। দাদার

দেওয়া টাকা আর তার টিউসনের টাকা জুড়লে যা হয়, এক একটারই দাম নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক বেশী। পিকনিক থেকে ফেরবার সময় বোতল দুটোর ঠোকাঠুকির ঢলঢলে শব্দটা পাল্টে যাবে। পিকনিক কথাটা তখনই সে বদলে নেয় ফুর্তির সঙ্গে। ভাবে, জীবন কী অদ্ভুত! কতো স্মুথভাবে এরা মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলেছে জীবনকে—যা ইচ্ছে করতে পারে, যেমন খুশি চলতে পারে! সে কোনোদিন এদের নাগাল পাবে না। যদি চেষ্টাও করে, গায়ের ডোরাকাটা গারদের দাগটা সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে দগদগে হয়ে। এদের সঙ্গে তার কিছুই মেলে না—মিলবে না। তাহলে সে এদের সঙ্গে যাচ্ছে কেন? টুপুরের জন্যে? টান? এই টানটাকে তো কোনোদিনই ঠিক ঠিক বুঝতে পারেনি সে। তাহলে আজ, যখন বুঝতেই পেরেছিল আসার মানে হয় না কোনো—খামোখা টানটাকে আঁকড়ে থাকল কেন! বুকে হাওয়া টানবার জন্যে? তাও তো হলো না—ওই ঈপ্সিতাটার জন্যে। পিনাকটা স্পাইনলেস, জোড়া পায়ের লাথি না খেলে কোনোদিন বুঝবে না কিছু। ঠিকই, কোনো জোর নেই এই একসঙ্গে কাছাকাছি থাকার, একসঙ্গে ঘোরাফেরা করার। যার যার নিজের নিজের; হয়তো এটাই সত্যি, এই লোকগুলো ইচ্ছে করলেই এক লাথিতে ভেঙে দিতে পারে বন্ধু-বান্ধব, টান-ভালোবাসা, সবকিছু। সিকিউরিটির লাথি, সুখের লাথি! ঈপ্সিতা ঠিক জানে কার সঙ্গে কীভাবে মিশতে হয়।

রাগটা প্রশমিত করার জন্যে দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেটটা ট্রাউজার্সের পকেট থেকে বের করল রজত। ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে তাকে বেগার বলে ডাকে টুপুর—আজও সকালে কিনে দিয়েছে দু' প্যাকেট, বোধহয় ঠিকই বলে। রাগের মধ্যেই কেমন যেন হাসি পেয়ে গেল রজতের।

'পল্লব, সিগারেট খাবি?'

অসিত নিজেই একটা তুলে নিল প্যাকেট থেকে। পল্লব চুপচাপ। মাথা নেড়ে না বলল। অশোককে বলে লাভ নেই কিছু। এর আগে একবার বলেছিল, ব্র্যান্ড চেঞ্জ করে না।

সিগারেট ধরিয়ে বুকভর্তি ধোঁয়া টানল রজত। তখনই মনে পড়ে গেল!

'চন্দনা, তোর মা কেমন আছে?'

অনেকক্ষণ পরে এই প্রথম তাকেই কেউ জিজ্ঞেস করল কিছু। রজত। পর পর দুটো ঢোঁক গিলে চন্দনা বলল, 'একটু ভালো—'

'তোমার মা অসুস্থ নাকি?' অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'গল ব্লাডারে স্টোন না কি!' ঈপ্সিতা বলল, 'তাই না?'

তখনই একটা সিদ্ধান্ত নিল চন্দনা। জবাব দেবে না। তাই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'সেইজন্যেই কি তুমি এতো চুপচাপ?'

না। সে-জন্যে নয়। তবু কোনো জবাব দিতে ইচ্ছে করল না চন্দনার। এ বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার, এই দলটায় সে আছে, থেকেও তবু নেই। থাকলে কে আর যেচে চুপচাপ হয়ে যায়!

পর পর ঢেউগুলো উঠে আসছে বুক থেকে, গলা পর্যন্ত পৌঁছেই নেমে যাচ্ছে আবার। তাহলে তুই লেগে যা—সকালে বলেছিল টুপুর। তারপর টুপুর নিজেই চলে গেল ওখানে। ওই গাড়িতে থাকলে পিনাকীকে বলতে পারত, ছায়ার পিছনে ঘুরে কী হবে! আয়, আমার একাকিত্বে তুই একটু জড়িয়ে থাক। কিন্তু, সবই গোলমাল হয়ে গেল কেমন, ঠিক যেমনটি হয়ে এসেছে এতোকাল। শর্মিলা গেছে; ঈপ্সিতা যাবে, টুপুরও যাবে। পাঁচ বোনের ছোট হয়ে শুধু অপেক্ষা করে যেতে হবে তাকে। অন্যদের কিছু না হলে তারও হবে না। তখন নিজেকে চালানোর জন্যে একটা চাকরির খোঁজ করতে হবে। উপায় একটাই, যদি ইতিমধ্যে কেউ তুলে নেয় তাকে। তেমন কি আছে কেউ?

ভাবনাগুলো টেনে নিয়ে যায় অনেক দূর। গাড়ির এঞ্জিনের তাপ আর বাইরের তেতে-ওঠা রোদ্দুরের জন্যে নয়, চন্দনা জানে মাথার ভিতর হঠাৎ দাঁড়ির খেলা শুরু হবার অনেক কারণ থাকে। সবগুলোর নাম জানা নেই তার। তবে ভারসাম্যের এদিক ওদিক হলেই আগেভাগে একটা ব্যাপার বুঝতে পারে—এক মুহূর্তের জন্যে দপ করে লোড শেডিং শুরু হয়ে যায় গোটা পৃথিবীতে, তারপর সেই অন্ধকারটাই আবার একে একে ফিরিয়ে দিতে থাকে সব—দৃশ্য, ঘ্রাণ, স্পর্শ, উপস্থিত, সব। মাথা ঘোরে; শরীরে অন্ধকারের এই চমকটা ঠিক সহ্য করতে পারে না সে। দ্রুত ঘেমে ওঠে হাতের চেটো। অনেক সময় সামলে নেয়, যখন পারে না তখন তারপর কী হয় বুঝতে পারার আগেই আবার ফিরে যায় অন্ধকারে। ডাক্তার বলে হিস্টিরিয়া। এই বয়সে নাকি অনেক মেয়েরই হয়, বিয়ে হলে ঠিক হয়ে যায়। এখন হাতের চেটোয় ঘাম এবং মাথার মধ্যে তাপ অনুভব করে নিজেকে নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেল চন্দনা। এখনই যদি সে-রকম কিছু একটা ঘটে যায় বিশ্রী ব্যাপার হবে। ওরা কেউ কোনোদিন দেখেনি আগে। তাছাড়া, এটাই কি এ-সব হবার সময়!

উদ্বেগটা বেশী হতে নড়ে উঠে প্রায় সকলের দিকেই দিশেহারার মতো তাকাল চন্দনা।

'কি রে, অমন ছটফট করছিস কেন!' অবাক হয়ে অসিত বলল, 'খিদে পেয়ে গেল নাকি?'

'মাথা ঘুরছে।' গা গুলিয়ে চন্দনা বলল, 'জল ছিল না?'

ওয়াটার বটলটা পল্লবের পায়ের কাছে। তাড়াতাড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল চন্দনার হাতে। ওর পিঠ ধরে চেপে বসিয়ে দিল রজত। হাতে জল নিয়ে জোরে জোরে কপালে মাথায় ছিটোতে লাগল চন্দনা। খানিকটা ঢেলে নিল

গলায়। ভিজে হাতটা মাথায় চুলে বোলাতে বোলাতে বলল, 'ঠিক আছে। আর কিছু হবে না—'

ওয়াটার বটলটা ফেরত দিয়ে সীটের কাঁধে হাতের ওপর কপাল পেতে দিল চন্দনা। ঢেউগুলো নেমে যাচ্ছে তলার দিকে। আঃ! দুঃখ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে দুঃখিত হয় না কেউ। হাসে। ভগবান, আজ যেন কিছু না হয়!

ইতিমধ্যে গাড়ির স্পীড যতোটা সম্ভব মন্থর করে এনেছিল অশোক। সেকেন্ড গীয়ারে প্রায় সেইভাবেই এগোতে এগোতে বলল, 'গরমে। রোদটা হঠাৎ কেমন চড়চড়ে হয়ে উঠল দেখেছ! আর ড্রাইভ করতেও ভালো লাগছে না।'

চন্দনা যেদিকে, রোদটা সেদিকেই বেশী। তাদের দিকটায় ছায়া। পল্লব ভাবল, চন্দনাকে ওখান থেকে সরিয়ে আনা যায়। তার আগে জিজ্ঞেস করল, 'আর কতোদূর?'

'বেশী নয়। মিনিট পাঁচেক। সন্দীপরা বোধহয় পেঁৗছেই গেছে—'

পল্লব আর কিছু বলল না। মনে হচ্ছে সামলে নিয়েছে চন্দনা। আপাতত থাক, যা করার ওখানে গিয়েই হবে।

এই রাস্তাটা কাঁচা এবং সরু। দু'দিকে চাষের জমি কলা আর আম কাঁঠাল দিয়ে ঘেরা। মাটির রাস্তা গরুর গাড়ির চাকায় দেবে গেছে এখানে-ওখানে—তার ওপরেই সদ্য-পড়া মোটরের চাকার দাগগুলো চেনা যায় স্পষ্ট। বেশ কিছুটা রাস্তা সামনে তাকিয়ে দাগগুলো অনুসরণ করল ঈপ্সিতা, ফীয়াটটার দেখা পেল না। দূরে গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে পাকা ইঁটের দেওয়াল, মাঠের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিকের লাইন চলে গেছে ওইদিকে। সম্ভবত ওইটাই। দেখতে দেখতে ঈপ্সিতা বলল, 'আমার কিন্তু খিদে পাচ্ছে খুব।'

অশোক হাসল।

'আগেই খবর দেওয়া আছে। ব্রেকফাস্ট রেডি থাকবে—'

'সারা রাস্তা যে-রকম বকরবকর করলি, খিদে পাবারই কথা। তার ওপর যা মুটিয়েছিস! মোটাদের আবার বেশী খিদে পায়!'

খানিক আগেকার অস্বস্তি কাটিয়ে আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছিল ঈপ্সিতা, অসিত উসকে দিল। এখন বলে নয়, গোটা রাস্তাটাই পিছনে লেগে আছে ও। খোঁচা দেবার সামান্য সুযোগও হাতছাড়া করেনি। ঈপ্সিতা বুঝতে পারে কেন ও এ-রকম করছে। পিনাকীর সঙ্গে তার ব্যবহারটা পছন্দ করেনি, হয়তো রেগেও আছে খুব। রজত আর পল্লব যে-রকম চুপচাপ, হয়তো ওরাও ক্ষুব্ধ। ছেলেগুলো চট করে জোট বেঁধে নেয়। এখন যে-কোনোভাবে তাকে যতোটা ছোটো করা যায় তাতেই খুশি হবে। এ-রকম হবে জানলে সে কিছুতেই ও-গাড়ি থেকে চলে আসত না—বড়ো জোর চন্দনার সঙ্গে জায়গা

বদল করে নেওয়ার কথা ভাবত। তাতেও অখুশি হতো পিনাকী; তবে ব্যাপারটা এমন জানাজানি হতো না। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত কেন যে সে এইরকম একটা ব্যাপার করল, নিজেই বুঝতে পারছে না এখনো! টুপুরকে নিয়ে শর্মিলার বাড়াবাড়ি দেখে! হতেও পারে। সত্যি, এমন ছটফট করছিল শর্মিলা, যেন টুপুরের জন্যেই এই পিকনিকটা! তাহলে আমাদের গলা বাড়িয়ে ডাকা কেন! তার ওপর হ্যাংলার মতো পিনাকী গায়ে এসে পড়ছে দেখেই কেমন গোলমাল হয়ে গেল সব। পরে অবশ্য ভেবেছিল আড়ালে ক্ষমা চেয়ে নেবে পিনাকীর কাছে—ক্ষমা চাওয়াই তো আর ভালোবাসা দেখানো নয়! এতোক্ষণ ধরে তাই কথা বলে বলে ব্যাপারটা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল; না হলে এতো কথা কবে আর সে বলে! কিন্তু, অসিত যা করছে সেটাও কি বাড়াবাড়ি নয়! অমন সুন্দর ফিগার তার—যে দেখে সেই চেয়ে থাকে, তাকে কি না বলল মোটা! এটা ডেলিবারেট, অশোকের সামনে তাকে ছোট করার চেষ্টা। কাছে থাকলে ঠাস করে চড় বসাতো গালে। ছি, ছি; অশোক একটা বাইরের লোক—আজ আছে কাল থাকবে না। সে কী ভাবল!

প্রচণ্ড রাগে মাথার মাঝখান অব্দি শিস উঠে গেল ঈপ্সিতার। গরম হয়ে উঠল কানদুটো। কী করবে না করবে ভেবে ছটফট করতে করতে অশোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখেছেন. কী অসম্ভব বখা!'

অল্প গম্ভীর হয়ে গেল অশোক। যেন শুনতে পায়নি এইভাবে গীয়ার চেঞ্জ করায় ব্যস্ত হলো।

'কথাটা অশোকবাবুকে না বলে আমার বাবাকে বললে বাবা তোকে পেট ভরে খাইয়ে দিত।'

'তার মানে!' বিব্রত গলায় অশোক বলল, 'বেশ তো হচ্ছিল নিজেদের মধ্যে। তোমার বাবা আবার এর মধ্যে এলেন কোত্থেকে!'

'আমার চার দাদার সবাই এতো ব্রিলিয়ান্ট যে বাবা তার ছোট ছেলেটিকে বখা দেখতে চায়—'

'তুই থামবি. না এক্ষুনি নামিয়ে দেব গাড়ি থেকে!' অসিতের জামার পিঠ চেপে ধরেছে রজত, রীতিমতো অসহিষ্ণু চোখমুখ, 'তোর বাপের খবর কেউ জানতে চায়নি!'

ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়ে অসিত বলল, 'রেগে যাচ্ছিস কেন! আমি ঠাট্টা করছিলাম!'

হাতটা সরিয়ে নিল রজত।

'সারাক্ষণ ব্যাজার. ব্যাজার, ব্যাজার! তোরা যা তাহলে! আমি নেমে যাচ্ছি—আমার মেজাজ ভালো নেই।'

চেঁচামেচিতে সোজা হয়ে বসেছিল চন্দনা। বলল, 'সত্যি অসিত, কী বল তো তুই!'

'ঠিক আছে, এগ্রিড। আমি ভালো ছেলে হয়ে যাচ্ছি। ঈপ্সিতা, তুই আমার মাথায় চারটে চাঁটি মার—'

বলতে বলতে ঈপ্সিতার কাঁধের কাছে মাথাটা বাড়িয়ে দিল অসিত।

'বালাই ষাট! একেই অমন নিরেট মাথা। চাঁটি মারলে আরও নিরেট হয়ে যাবে।'

ঈপ্সিতা হেসে ফেলেছিল। গাল ফুলিয়ে অসিতের মাথায় জোরে জোরে তিনবার ফুঁ দিয়ে বলল, 'যা। ক্ষমা করলাম। বোকাটাকে বলিস যেন স্যুইসাইড-টাইড না করে।'

কিছুটা অবাক কিছুটা মজার চোখে যতোটা পারে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল অশোক। চকিতে ঘড়ির দিকে চোখ পড়ায় স্পীড বাড়িয়ে দিল।

'ইউ আর এ স্ট্রেঞ্জ লট! আমরা এ-রকম ছিলাম না।'

'স্ট্রেঞ্জ লট!' পল্লব মুখ খুলল হঠাৎ, 'মানে!'

'আমরা অন্যরকম ছিলাম—'

'জেনারেশন গ্যাপট্যাপ বলছেন নাকি?' আবার শর্মিলা ঢুকে পড়েছে মাথায়। ঈষৎ তিক্ত গলায় পল্লব বলল, 'ওগুলো ফালতু। বুড়োরা বলে—'

'আমি নিজেদের কথা বলছি—'

এগোল না। কথার মাঝখানেই থেমে গিয়ে বাঁ-দিকের গেটের মধ্যে সাবধানে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল অশোক।

সামনে আঙুল তুলে চন্দনা বলল, 'ঐ দ্যাখ—দ্যাখ—'

বাংলো প্যাটার্নের একতলা। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফীয়াটটা। আরও কাছে বাগানের ধারে একটা করবী গাছে মুখোমুখি তাকিয়ে দুটো কাঠবিড়ালী—সেদিকে ক্যামেরা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে পিনাকী। চন্দনা ওকেই দেখাল। শর্মিলা, সন্দীপ, টুপুর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। ফীয়াটের বুটি থেকে স্যুটকেস বের করছে একটা বুড়ো মতন লোক। ঝটপট করতে করতে উড়ে গেল ছ'সাতটা ঘুঘু।

গাড়িটা ওইখানেই পার্ক করল অশোক। চাবি বন্ধ করে হাসতে হাসতে সটান হাত তুলে দিল ঈপ্সিতার কাঁধে।

'শেষ। আর তো সুন্দরী মহিলার সঙ্গ পাওয়া যাবে না—'

'পুষিয়ে দেবে। সারাদিন তো পড়ে আছে।'

ভুরু নাচিয়ে সলজ্জভাবে অসিতের দিকে তাকাল ঈপ্সিতা।

'আবার!'

রজত নেমে পড়েছিল ততোক্ষণে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দৌড়ে গেল পিনাকীর কাছে।

'ওরা কোথায় রে?'

ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ রেখে বাঁদিকে হাত তুলে পিনাকী বলল, 'ওই তো, পুকুরটার দিকে—'

সেইভাবে তাকাল রজত। ওদিকে অনেকগুলো ঝাঁকড়া মাথা গাছ ডাল-পালা বাড়িয়ে আড়াল করছে আকাশ। রোদ নেই। দেখল, ছায়ার মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে টুপুর আর সন্দীপ। ছায়াটা মিশে গেছে ওদের হাঁটার ধরনেও।

রজত এগোতে যাচ্ছিল। কী ভেবে থেমে দাঁড়াল, দৃশ্যটায় চোখ রাখল আবার। ঠিক এমনভাবে এর আগে কোনোদিন টুপুরকে লক্ষ করেনি ও, টুপুরের শরীর আর ওই হাঁটার ধরনটাও। দেখেনি বলেই এখন কেমন আলাদা লাগছে' একটু বা অচেনা।

একটুক্ষণ দেখে চোখ দুটো নামিয়ে নিল রজত। আবার তুলল। দু' বগলে কাগজে মোড়া বোতল দুটো নিয়ে অশোকের পিছনে পিছনে এগিয়ে যাচ্ছে অসিত। ওদের পিছনে ঈপ্সিতা আর চন্দনা। পল্লব আসছে এদিকেই। সম্ভবত সিগারেট চাইবে।

বুকের মধ্যে অল্প চিনচিন করে উঠল রজতের। কিছু না ভেবেই সিগারেটের প্যাকেটটার জন্যে হাত ঢোকাল পকেটে।

৫

ক'দিন পরে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে অসম্ভব ফাঁকা আর শূন্য লাগতে লাগল রজতের। মাথাটা ভোঁ-ভোঁ, হাত-পাগুলো আলগা আলগা, কিছু করার নেই—এমনকি গুছিয়ে ভাববার মতো ইচ্ছেটাও হারিয়ে গেছে কোথায়! এ-রকম বড়ো একটা হয় না কখনো। সাধারণত একটা না একটা কিছু ভাবতে ভাবতে প্রতি রাতে ঘুমোতে যায় সে; ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে ওঠার পরও সারাদিনের মতো করে গুছিয়ে নেয় নিজেকে। কখনো ছটফট করে জ্বালায়, কখনো শিস দেয় খুশিতে—বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে আপন মনে, কিংবা পড়াশুনার কথা ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেয় বইয়ের মধ্যে। এ-সবের কোনোটাই আজ স্পর্শ করল না তাকে। ঢিলেঢালা, অন্যমনস্ক, কিন্তু সত্যিকারের কোনো বিষয় নেই মাথার মধ্যে। যেন ঘুমের মধ্যে শরীরে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে কেউ তার বোধ, স্মৃতি, সক্রিয়তার সবটুকু শুষে নিয়েছে গোপনে।

একটু আগেই চা দিয়ে ঠেলা দিয়ে গেছে কাকীমা। ঘুম ভেঙে বিছানায় কোমর ভেঙে বসে বার কয়েক হাই তুলল রজত। তারপর আবার কিছুক্ষণ জেগে জেগেই গড়িয়ে নিল বিছানায়। ভালো লাগল না। তখন উঠে চটপট মুখ ধুয়ে প্লেট ঢাকা চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে খবরের কাগজটা তুলে নিল মেঝে থেকে। বিছানায় বসে প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সব পাতাগুলোয় চোখ বুলিয়ে গেল দ্রুত। কোনো খবরটাই আকর্ষণ করল না। আবার প্রথম পাতায় ফিরে আসতে আসতে রজত ভাবল, জীবন এমন একঘেয়ে, কোথাও কিছু ঘটছে না তেমন—তবু খবরের নাম করে বড়ো টাইপে ছোটো টাইপে রোজই এমন রাশি রাশি অক্ষর তৈরি হয় কী করে! কেনই বা হয়! কী যায় আসে তার পেরুর ভূমিকম্পে বা রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা সফরে, মোহনবাগানের জেতা হারায় বা চীফ সেক্রেটারির অদল বদল বা গঙ্গায় একটা নতুন জাহাজ ভাসলে! 'সমাজকে ঢেলে সাজাতে হবে—', কে বাবা! ও, মন্ত্রীর লেকচার! কারবার দ্যাখো—একটা পুলিস কর্তব্যপরায়ণতার মেডেল পেয়েছে তাও ছেপে দিয়েছে বড়ো বড়ো করে। কিন্তু, বিনা কারণে যখন তাকে টানতে টানতে হাজতে নিয়ে গিয়ে অমানুষের মতো পিটিয়ে পিটিয়ে রক্ত বের করত পুলিসগুলো, সেটা কই ছেপে বেরোয়নি তো! যতো সব বুজরুকি! এই যে হুট করে শর্মিলার

সঙ্গে দুর্গাপুরে চলে গেল টুপুর, কিংবা তার মন খারাপ—শূন্য হয়ে আছে মাথাটা, ভালো লাগছে না কিছুই, খবরের কাগজ তার খবর রাখে না। রাবিশ! যেখান থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল ঠিক সেইদিকে তাক করে কাগজটা ছুঁড়ে দিল রজত। পাতাগুলো উড়তে লাগল হাওয়ায়। একটা লুজ পাতা উড়তে উড়তে চলে গেল চৌকাঠ পেরিয়ে।

কাল রাতে ফিরতে দেরি হয়েছে অনেক। বিকেলে কলেজ-ফেরতা সে আর পল্লব গিয়েছিল টুপুরদের বাড়ি। টুপুরের মা বলল, 'ফেরেনি এখনো। ফিরলে তো কলেজেই যেত, তোমরাও দেখতে পেতে।' তারপর যত্ন করে চা আর সিঙ্গাড়া খাওয়ালো তাদের। টুপুরদের বাড়িতে কেউ জোরে কথা বলে না। রজত দেখেছে, কেমন একটা মোলায়েম মুখ করে থাকে সবাই, রাগ করে না কখনো। কিন্তু, খুব সুন্দর করে বলা সত্ত্বেও মাসীমার কথাগুলো কেমন গোলমেলে লেগেছিল কাল—'কলেজে যেত' আর 'দেখতে পেতে'র পর নিঃশব্দে তাদের দিকে তাকিয়েছিল আর একটি কথাও, 'তাহলে এতো খোঁজ করা কেন!' রজত জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, দু'দিনের জায়গায় পাঁচদিন হয়ে গেল, কী এতো বেড়ানো তার দুর্গাপুরে! পারেনি। টুপুর আর তার মা এক নয়। টুপুর হলে রাগে একটা চড় বসিয়ে দিতে পারত গালে। কিন্তু, এখানে অন্যরকম, চা সিঙ্গাড়া খেয়েই ফুরিয়ে যাবে সব কথা—যেমন এসেছিল তেমনিই চুপচাপ নেমে যেতে হবে সিঁড়ি দিয়ে। তারপর রাস্তা। রাস্তা। ওই একটা জায়গাই স্বেচ্ছভাবে সমস্ত আবদার মেনে নেয় তার। কি রে ব্যাটা, রাস্তার ছেলে, চাপা ক্ষোভটা চায়ের সঙ্গে গলা দিয়ে নামাতে নামাতে নিজের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল রজত, খোঁজ পেলি? এবার ওঠ। দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিতে এসে টুপুরের মা বলল, 'দ্যাখো, আজ সন্ধ্যের ট্রেনে হয়তো ফিরে আসবে।' ইচ্ছার মধ্যে সমস্ত রক্ত জড়ো করে রজত ভেবেছিল, হ্যাঁ, তাই। ফিরতেই হবে।

রাস্তায় নেমে পল্লব বলল, 'রজত, একটা কথা বলব তোকে?'

পল্লব আজকাল খুব সিরিয়াস হয়ে গেছে। যতো দিন যাচ্ছে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে আরও। সেদিন পিকনিক থেকে হঠাৎই বাসে চড়ে ফিরে এসেছিল কলকাতায়। সঙ্গে রজতও ছিল; কিন্তু সে চলে এসেছিল অন্য কারণে—পুরো ব্যাপারটাই বিচ্ছিরি লাগছিল বলে, এমনকি টুপুরকেও; তাছাড়া, গোড়া থেকেই তো তার যাবার ইচ্ছে ছিল না কোনো' চলে যাবে চলে যাবে ভাবছিল, পল্লবই লাটাই ধরিয়ে দিল হাতে। কেন? ও তো নিজেই গিয়েছিল!

এখনো প্রশ্নটা করল খুব সিরিয়াস গলায়। রজত বলল, 'বল না?'

'তুই টুপুরের পেছনে ঘোরা ছেড়ে দে—'

কথাটা এমনই হঠাৎ বলল যে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর জোগাল না মুখে। একটু

অপ্রস্তুতভাবে রজত বলল, 'আমি কারুর পেছনে ঘুরি না।'

'জানি, তুই কারুর পেছনে ঘুরিস না। তুই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সোজ, সবচেয়ে সেনসিবল। তুই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো। তাই সবাই তোকে পছন্দ করে। তোর একটাই ট্রাবল—তুই নিজেকে বুঝতে পারিস না!'

'সবাই সবকিছু বুঝতে পারে না।'

'হ্যাঁ। কিন্তু টুপুর তোকে টানছে, এটা ভালো নয়। যদিও তুই বুঝতে পারিস না—'

'টুপুর কি খারাপ?'

'না। তাতে কিছু যায় আসে না।'

পল্লব চুপ করে গেল দেখে রজত বলল, 'বন্ধুত্ব খারাপ কেন!'

'বন্ধুত্ব! একটা মেয়ের সঙ্গে!' পল্লব হাসল, 'আমি সাতদিন কলকাতায় না থাকলে তুই আমার খোঁজ করতিস না!'

'করতাম।'

'না হয় করতিস। ছেলেয় ছেলেয় ব্যাপারটা অন্য।' অল্প থেমে কিছু ভাবল পল্লব। তারপর বলল, 'তুই, টুপুর দুজনেই এডাল্ট। ওকে বিয়ে করতে পারবি?'

'ছাড়। তুই আজকাল খুব বেশী নাটক নভেল পড়ছিস—'

'কথাটা এড়িয়ে যাস না!'

'চাল নেই চুলো নেই, শালা বিয়ের কথা! ওভাবে মিশি না। ওসব ভাবিও না।'

'তুই ভাবিস না। কিন্তু টুপুর ভাবে, ওর মা ভাবে। এই নিয়ে একটা প্ল্যানট্যান চলছে—। আমি বুঝতে পারি।'

'তুই শালা সবজান্তা!'

পল্লবের পিঠে একটা থাপ্পড় বসাল রজত। একটু সরে গিয়ে আবার পাশে ফিরে এলো পল্লব। সিগারেট নিয়ে রজতকে দিল, নিজে ধরিয়ে নিল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'দুদিনের জায়গায় তিনদিন হলে তুই ছটফট করিস, কিন্তু একটা মেয়ের কোনো চিন্তা নেই! এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবি?'

'চিন্তা নেই এটা ভাবছিস কেন! আমাদের বলবে? হয়তো চিঠিফিঠি দিয়েছে—'

রজত থমকে গেল। পল্লব যেভাবে ভাবছে সে সেভাবে ভাবে না। এতো ভাববারই বা আছে কী! একটা মেয়ে বিয়ে করলে করতেই পারে। টুপুরও পারে। কিন্তু, টুপুরকে সে চেনে—সে-রকম কোনো ব্যাপার থাকলে নিশ্চয়ই জানাত তাকে। সে কি ঝামেলা করত, না বলত! একটু কষ্ট হতো হয়তো—যেমন হচ্ছে এখনো, টুপুর যে তার অনেকটা! কিন্তু, সেটা তো শেষের ব্যাপার। তেমন তেমন হলে মন খারাপ করবে কিছুদিন, তারপর সহ্য হয়ে

যাবে আস্তে আস্তে। তার চেয়েও আরও বড়ো কষ্ট নিয়ে এখনো কি প্রতিদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে না সে!

রজত বলল, 'তুই বলছিস বল, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটার কোনো গুরুত্ব নেই।'

'তাহলে ভালোই—'

পল্লব চুপ করে গেল। সিগারেটটা মুঠো করে ধরে টানছে ঘন ঘন—থামছে, যেন জুত হচ্ছে না তেমন, একটা পুরো আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া এখন টেনে নিতে চায় বুকে। ওর অস্থির ভাবটা লক্ষ করতে করতে হাঁটতে লাগল রজত। মনে হচ্ছে পল্লব একটা ধান্ধার মধ্যে পড়েছে—এতোক্ষণ টুপুরকে নিয়ে যা বলল সে-সবও উঠে এলো সেইখান থেকে। ও দ্বিধায় থাকল।

সিগারেটটা টোকা মেরে রাস্তার মাঝখানে ছুঁড়ে দিয়ে রজতের দিকে তাকাল পল্লব।

'তোকে একটা কথা বলিনি। কাউকেই বলিনি অবশ্য—'

'কী?'

'আমি সেদিন শর্মিলাকে চুমু খেয়েছি—'

রজত একটা ধাক্কা খেল। বন্ধুদের মধ্যে এই প্রথম সে এ-রকম একটা অভিজ্ঞতার কথা শুনছে। চেটোর তলায় দেশলাইয়ের আগুন জেলে ধরলে যেমন তাপ ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতিতে, তেমনি একটা উত্তাপ ছুঁয়ে গেল তাকে। আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কবে?'

'পিকনিকের দিন।'

'গুল।'

'আপন গড বলছি।' পল্লব ওর কাঁধ ছুঁলো। মুখে হাসি নেই একটুও, বরং কঠিন হয়ে উঠেছে চোয়াল দুটো। তারপর বলল, 'কিছু ভেবে করিনি। তোরা সবাই মাঠের দিকে ছিলি, অশোকও। আমি বাথরুমে যাচ্ছিলাম। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে একটা ঘরের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ছে শর্মিলা। আমার কী হয়ে গেল হঠাৎ, ঘরের মধ্যে ঢুকে জাপটে ধরলাম ওকে। আমার মাথার মধ্যে আগুন ছুটছে তখন। শর্মিলা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কী করছিস! আমি বললাম, ধৃতিকান্ত যা করেছিল, অশোক যা করে। তারপরেই ওর মুখের ওপর মুখ নিয়ে গিয়ে চেপে ধরলাম ঠোঁট দুটো। শর্মিলা বাধা দিল না, জিব ঢুকিয়ে দিল আমার মুখে। ওর বুক দুটো ঘষে যাচ্ছিল আমার বুকে। আমার ভীষণ ভয় লাগছিল। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে আসছি, শর্মিলা ডাকল। শাড়ির আঁচল ঘষে ঘষে ও তখন ঠোঁটের কষ তুলছে; এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, লক্ষ্মী সোনা, কাউকে বলিস না প্লীজ, তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি তখন হাঁ, শরীরের ভেতর রক্তটা ফুটছে টগবগ করে, আরও কিছু করতে ইচ্ছে করছিল।

শর্মিলা এগিয়ে এসে বলল, কথা দে, বলবি না কাউকে! আমি বললাম, ঠিক আছে। শর্মিলা বলল, চলে যা, এক্ষুনি চলে যা। কেউ এসে পড়বে—'

পল্লব এমনভাবে থামল, যেন এইমাত্র হাঁফাতে হাঁফাতে বেরিয়ে আসছে শর্মিলার ঘর থেকে। জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'একটা সিগারেট দে তো?'

'কারবার!' রজত বলল, 'সেইজন্যেই পালিয়ে এসেছিলি? ভয়ে?'

'ভয়ে নয়, ঘেন্নায়। আমি দেখলাম তার পরেও খুব স্বাভাবিকভাবে ঘুরছে শর্মিলা, হাসছে, কথা বলছে। দূর থেকে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকালেও অ্যাভয়েড করছিল আমাকে। তখন থেকেই আমার মনে হতে লাগল জানাজানি হবার ভয়টাই ওর সব। না হলে ও যা-তা করতে পারে। নিজের ওপর বা ওর স্বামীটার ওপর কোনো শ্রদ্ধা নেই। মেয়ে জাতটাকে চেনা যায় না মাইরি!'

'যায়। সবাই তোর শর্মিলা নয়, সবাই একরকম নয়। তাছাড়া—', দৃঢ় গলায় বলল রজত, 'দোষটা তোর। তুই ওর ঘরে ঢুকেছিলি, ওকে জাপ'টে ধরেছিলি। ও তোকে ডাকেনি। আমি ওর দোষ দেখি না—'

'ও বাধা দিতে পারত, চ্যাঁচাতে পারত—'

'তাহলে তুই এখন গপ্পো মারতে পারতিস না--চোয়াল ভেঙে পড়ে থাকতিস হাসপাতালে। ও ঠিকই করেছে। কোনো ঝামেলায় যেতে চায়নি। তুই শালা ন্যাকামি করিস না!'

'তুই সবাইকেই টুপুর ভাবিস! কিন্তু তুই নিজে কতোটা চিনিস টুপুরকে?'

'যা চিনি তাতেই হবে—', হঠাৎ কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রজত, চোখ পাকিয়ে তাকাল পল্লবের দিকে, 'তুই কী বলতে চাস বল তো?'

পল্লব একভাবে উঠছিল, রজতকে বেঁকে দাঁড়াতে দেখে চুপসে গেল। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধরে ফেলল রজতের।

'তুই রাগ করছিস! টুপুর খারাপ হবে কেন! আমি বলছি টুপুর যদি হঠাৎ বিয়েটিয়ে হয়ে চলে যায়—'

'যায় যাবে।' ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল রজত। বলল, 'কবে পান্তা ভাত খাবো তার নেই ঠিক, এখন থেকে নুন জোগাড় করে রাখো!'

পল্লব চুপ করে গিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ হাসি ফুটে উঠল মুখে। তারপরেই মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে লাগল হো-হো করে।

'হাসছিস কেন! আ-রে!'

'ওই কথাটা--নুন জোগাড় করো। হাঃ--হাঃ—হাঃ—'

আশেপাশের কিছু লোক যেতে যেতে তাকাচ্ছে তাদের দিকে; অমন পাগলের মতো পল্লবকে হাসতে দেখে হেসেও ফেলছে কেউ কেউ। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। অপ্রতিভভাবে ওর হাত ধরে টানল রজত।

'চল, চল! হাসবি পরে—'

'ওফ্, পেট ফেটে যাবে! ছাড়লি একখানা বম্‌শেল!' ঝুঁকে, হাঁটু চেপে ধরে নতুন করে আসা হাসির বেগটা চাপা দিল পল্লব, 'কার কথা রে? গান্ধীর নাকি? লবণ আন্দোলনের সময় বলেছিল?'

'না। আমার বাবার। মাকে বলত।' রজত বলল, 'দিদির যখন দশ বছর বয়েস, তখন থেকেই মা বিয়ের জোগাড় করতে বলত, বাবাও রেগে যেত—'

'তোর বাবা একটা জিনিয়াস।' পল্লব বলল, 'ঠিকই বলেছিস তুই। আমাদের অবস্থাটাও তাই, বুঝলি, শুধু নুন জোগাড় করে যাচ্ছি—। কী লাভ! যে যেখানে যায় যাক। দেখিস, সময় এলে আমরাও লাট্টু ঘোরাব। ভাবলেই তো মন খারাপ!'

চা-টা ঠান্ডা। এক চুমুকেই শেষ করে রজত ভাবল আর এক কাপের জন্যে কাকীমাকে বলবে কি না। মাথাটা ধরে আছে: কাল বিকেল আর সন্ধ্যের কথাগুলো মনে পড়ছে ঠিকই—কিন্তু আর কোনো জুত নেই কোথাও! মনে পড়ছে, পল্লবের খেয়ালে তারপর ওরা একটা এয়ার-কান্ডিশান করা সেলুনে ঢুকেছিল—চুল কেটে, দাড়ি কামিয়ে, কফি খেয়ে, সিনেমা দেখেছিল নাইট শোয়ে। বাড়ি ফিরে ঘুম। এখন, এই সকালে, আর ভালো লাগছে না কিছু। গা জুড়ে আলস্য, নিজেকে নিয়ে এগনো যাচ্ছে না কোথাও; যেন এখনো দাঁড়িয়ে আছে সিনেমায় দেখা দ্য এন্ড-এ—এরপর যেতে হলে পিছোতে হবে শুধু।

পুরো বিরক্তিতে একটা সিগারেটের প্রয়োজনে আঁকুপাঁকু করে উঠল শরীর। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ার টেবিলের দিকে ছুটে গেল রজত, চার-মিনারের প্যাকেটটা তুলে নিল হাতে। খালি। খালি কেন! কখন খেয়ে ফেলল শেষ সিগারেটটা! রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় অবস্থা বুঝে দু'চারটে কিনে রাখে, কাল কি তার কিছুই মনে পড়েনি! ধ্যুৎ শালা! শূন্য প্যাকেটটা দুমড়ে মুচড়ে গোলা পাকিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলল রজত, তার ওপরেই লাথি কষাল একটা—গোটা দুনিয়াটাই বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে রাগের সঙ্গে, এক্ষুনি একবার বেরিয়ে গিয়ে সিগারেট না কিনলে মরে যাবে।

দেয়ালে টাঙানো ব্রাকেট থেকে গত রাতে পরা সার্টটা তুলে নিয়ে গায়ে গলিয়ে নিল রজত, বোতাম লাগাতে গিয়ে দেখল দুটো ছাড়া সব বোতাম-গুলোই ছেঁড়া। রাগটা বেড়ে গেল। বোতামের ঘরে আটকে থাকা বাসী সুতোয় টান দিয়ে রজত ভাবল, পল্লব ঠিকই বলেছিল। একটা চিঠিফিঠি লিখলে কি হাতে ফোঁড়া গজাতো! সেদিন তো খুব ন্যাকামি করে বলে গেলি মোটে দু' দিন! ঠিক আছে, ফিরে আয়, কীভাবে রগড়ানি দিতে হয় আমি জানি। এইভাবে তার ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল অল্প। মানিব্যাগটা পকেটে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

শম্ভুনাথের ঘরের জানলা বন্ধ। বারান্দায় রোদ আছে, কিন্তু সমস্ত বাড়ি জুড়ে নিশুতি রাতের স্তব্ধতা। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে রজত ডাকল, 'কাকীমা?' সাড়া পেল না। তখন আবার ডাকল, 'ও কাকীমা—?'

শোবার ঘর থেকে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলো সুধা।

'তুই উঠেছিস?'

'আমি একটু বেরুচ্ছি—'

'কোথায়?'

কাকীমার মুখে একটা ছায়া, কিসের বোঝা যায় না। একটু তাকিয়ে থেকে রজত বলল, 'কাছেই। এখুনি ফিরে আসব। দরজাটা লাগিয়ে দাও—'

'একটা ওষুধ এনে দিবি?'

'কার?'

'তোর কাকার—'

আবার সুধার মুখের দিকে তাকাল রজত। এ-সব মুহূর্তে কী করতে হয়, কী বলতে হয়, সে ঠিক জানে না। কেমন খাপছাড়া লাগে নিজেকে। ঠাণ্ডা গলায় সে বলল, 'দাও—'

'একটু দাঁড়া, বাবা। আমি প্রেসক্রিপসনটা এনে দিচ্ছি—'

রজত ফিরে এলো। পা ঝুলিয়ে বসল বিছানায়। মন ছেয়ে যাচ্ছে গ্লানিতে। কেমন মানুষ এরা, ভাবল, বাড়িতে থেকেও সে নেই—সে-জন্যে শাসন নেই কোনো, একটা ওষুধ আনতে হলেও এমনভাবে বলে যেন দয়া চাইছে! অথচ সে এদেরই আশ্রিত! আমি কি স্বার্থপর, না অমানুষ হয়ে যাচ্ছি দিন দিন, রজত ভাবল। হঠাৎ মনে পড়ল, সেদিন টিউসন নিয়ে কথা কাটাকাটির পর শম্ভুনাথের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি সে, কথাও বলেনি। এটা কি ঠিক হয়েছে!

অল্প অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রজত। চৌকাঠের ওপর কাকীমার পা পড়তে খেয়াল হলো।

প্রেসক্রিপসন আর কুড়িটা টাকা বাড়িয়ে দিয়ে সুধা বলল, 'এক দোকানে না পেলে একটু ঘুরে দেখিস—

'এ তো সেই হার্টের ট্যাবলেটটা দেখছি!' কাগজটায় চোখ বুলিয়ে রজত বলল, 'কী হয়েছে?'

'সেই বুকে ব্যথা। কাল সারা রাত ঘুমোতে পারেনি।'

'তোমরা কীরকম বুঝি না! আমাকে ডাকলে পারতে—'

রজতের গলায় অভিমানের সুর। সুধা এগিয়ে এলো কাছে। অল্প হেসে বলল, 'আচ্ছা, এবার ডাকব—। তুই তো ফিরলিই অতো রাত্রে, খেলিও না ভালো করে!'

'যতো বাজে ব্যাপার তোমাদের!' আক্ষেপে মাথা নাড়ল রজত, 'এখন কি

?'

'না। শেষ রাতে ঘুমিয়েছিল। এখন আবার উঠেছে—। বোতামগুলো
ঃড়লি করবে ?'

'ও কিছু নয়—'

সার্টের খোলা জায়গাটা হাত দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল রজত।

সুধা বলল, 'কাল তোর বাবা এসেছিল।'

'কখন ?'

'বিকেলে। এই নিয়ে দু'দিন তোর সঙ্গে দেখা হলো না।'

'চিঠি দিয়ে এলেই পারে। আমি কি হাত গুনব !'

'ছেলের কথা শোনো ! এভাবে বলে ?'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল সুধা। মায়া-মাখানো হাসি—
কে ছুঁয়ে যায়, অর্থ বোঝা যায় না তবু। রজত চোখ নামিয়ে নিল।

'তোর বাবা যে এতো চিঠি লেখেন, একটারও জবাব দিস ? কেমন ছেলে
!'

'ওসব বোলো না আমাকে। কী লিখব ! শ্রীচরণেষু লেখার পর আর কিছু
ন আসে না—'

'ছি, রজত ! বুড়ো মানুষ, তোর জন্যে ছুটে আসেন বার বার, কষ্ট হয়
' মাকেও তো লিখতে পারিস ! দু'একদিনের জন্যে ঘুরে আসিস না
ন !'

'যাবো। কলেজ বন্ধ হলে যাবো।' ছটফট করে উঠে দাঁড়াল রজত;
পরাধীর গলায় বলল, 'চলো, কাকাকে দেখে আসি একবার--'

'জামটা খুলে দে। আমি বরং বোতামগুলো বসিয়ে দিই চটপট।'

জামাটা খুলে দিয়ে শম্ভুনাথের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে এতোক্ষণের
বনাগুলো সব কেমন গুলিয়ে গেল রজতের। এইমাত্র অনেকগুলো কথা
লেছে সুধাকে, একটু বা অনুযোগের সুরে—অভিমানও করেনি কম। হাসি-
খে সব মেনে নিল সুধা, হাসিমুখে জবাব দিল, যেন শম্ভুনাথের অসুস্থতার
বরটা তাকে না জানিয়ে ভুল করে ফেলেছে। যদি এমন হতো, কিছু বলত
সুধা, সেও জানতে পারত না কিছু, রোজই যেমন চান-টান করে বেরিয়ে
র তেমনি বেরিয়ে পড়ত আজও— আর ইতিমধ্যে ঘটে যেত যে-কোনো অঘটন,
হলে শম্ভুনাথের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে কী জবাবদিহি করত সে !
মাকে জানানো হয়নি ? মৃত্যুর আগে শম্ভুনাথ কি ভেবে যেতেন, চারিদিকে
বাঞ্ছিত যে-ছেলেটিকে আশ্রয়ের আড়াল দিয়ে এতোদিন বাঁচিয়ে রাখলেন
নি, তাঁর জন্যে সে কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি ! এইভাবে, যার উদ্দেশে
চরণেষু পর্যন্ত লিখে বার বার থেমে যায় সে, এগিয়ে যাবার ভাষা পায় না
মনো—প্রত্যক্ষভাবে না হলেও একটা তাচ্ছিল্যে ভরে ওঠে মন, কোন প্রত্যাশায়

বন্ধ সেই মানুষটি প্রায় একই ভাষায় সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে সপ্তাহে দু'টি করে চিঠি পাঠায় তাকে? কী বোঝাতে চায় ওই সাদামাঠা অর্থহীন সুখ-দুঃখের কথা সাজিয়ে? তার কি ক্লান্তি নেই কোনো, কিংবা জব পৌঁছয় না বলে কোনো অভিমান বা অপমানবোধ? অনেকদিন হলো চিঠি গুলো উল্টেপাল্টে দেখে অবহেলায় সরিয়ে রাখে রজত। দ্বিতীয়বার মনে পড়ে না সেগুলোর কথা। তারপর নিঃশব্দে হারিয়ে যায় কোথায়! এইভাবে যদি হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে যায় চিঠি আসা, একবারের জন্যেও কি তার মনে হবে কিছু একটা থেমে গেল, বন্ধ হয়ে গেল চিরকালের মতো! এই শ্রীচরণেষু কথাটা ভেবে যায় সে, তারই বা মানে কী? অভ্যাস?

ঊর্ধ্বশ্বাস টেনে কমুহূর্ত নিঃশ্বাসটা বুকের মধ্যে ধরে রাখল রজত, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বাবার মুখটা মনে করবার চেষ্টা করল। তারপর মার। অস্পষ্ট আদল ভেসে উঠল চোখে—ক্রমশ আরও খানিকটা। তবু ধরা পড়ল না এ মুহূর্তে হাসলে বা দুঃখিত হলে ঠিক কীরকম দেখতে হবে তাদের! এ মুহূর্তে তার যেমন হঠাৎ মনে পড়ল তাদের কথা, অতোদূর দূরত্বে থেকে তাদেরও কি মনে পড়ছে তার কথা! নাকি সেখানেও সেই অস্পষ্টতা—নিষ্প গাছের মতো একটা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সারাক্ষণ, পাতা নড়ে না, ছায়া ছড়ায় না! হঠাৎ মনে পড়ে যায় বাবার সঙ্গে শম্ভুনাথের এখানে উঠে আসা প্রথম দিনটি। তার আগের দিন রাতে বাবা আর দাদায় কী কথা হয়েছিল সে জানত না ঠিক, তখনো এতোটা হয়ে ওঠেনি। ভোর না হতেই তাকে নি ট্রামে উঠেছিল রোগা, লম্বা, কুঁজো হয়ে যাওয়া লোকটি। হাতে ডাঁট-বাঁকানো পুরনো ছাতা, পায়ে কাদা-শুকনো রবারের জুতো, সাবানকাচা পাঞ্জাবি শ্রী নেই কোনো। হাঁটছিল জোরে জোরে, অকারণ, যেন খুব দেরি হয়ে গেছে না-রোদ সকালে তাকে ছাতার নীচে টেনে নেবার সে কী চেষ্টা! আত্মস্থ মাঝে মাঝেই বিড়বিড় করে বলছিল, এতো বড়ো সংসারে জায়গা হবে না একটু সবাই কি আর ফেলে দেয়! শম্ভু নিশ্চয়ই রাখবে। নিজেকেই বলা—বড়ো অসহায় অথচ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর সেই গলা—যেন ভেঙে গেছে পারাপারের সেতুটা, তবু যেতেই হবে, তাই সাঁতার না জেনেও শুধু প্রার্থনায় ভর করে খলবলে জলস্রোতে নেমে পড়েছে বাবা!

হাতটা ব্যথা করতে শুরু করেছে আবার, সিরসির করে উঠল চোখের তল নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে রজত ভাবল, আজই বাবাকে চিঠি লিখবে একটা—যে-কোনো চিঠি, যদিও বিষয়টি জানা নেই তার।

পিঠের পিছনে উঁচু করে বালিশ দেওয়া, বিছানায় আধশোয়া হয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন শম্ভুনাথ। বিবর্ণ মুখে রাতজাগার ক্লান্তি। গেঞ্জি পরা বুকটা ওঠানামা করছে অল্প। কেন জানে না, লোকটির সামনে এলেই আড়ষ্ট বোধ করে সে, সঙ্কোচে কুঁকড়ে যায় শরীর। এখনো ডাকবে কি

ডাকবে না ভেবে খানিক দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। তারপর ডাকল, 'কাকা?'

চোখ খুললেন শম্ভুনাথ, আধখোলার মতো করে। আবার বন্ধ করে আবার খুললেন—যেন বহুকালের ঘুম টানছে তাঁকে, চেষ্টা করছেন জড়তা কাটিয়ে উঠতে। চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন বন্ধ জানলাটার দিকে।

'বুকের ব্যথাটা নাকি আবার শুরু হয়েছে?'

'জানলাটা খুলে দিতে পারো?'

বিছানায় হাঁটু ভেঙে উঠে জানলাটা খুলে দিল রজত। আলোয় ভরে উঠল ঘরটা। রোদে শুকনো বালির মতো চিকচিক করছে শম্ভুনাথের গালের কুচি-কুচি দাড়ি। অলস চোখদুটো তুলে এবার তাকালেন সোজাসুজি।

'কে বলল? কাকীমা?'

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল রজত।

শম্ভুনাথ বললেন, 'চিন্তা করো না। আমার কিছু হবে না—'

'একটা ই-সি-জি করালে হতো না!' ইতস্তত করে বলল রজত, 'ডাক্তারকে খবর দেব?'

'এখন থাক। ওষুধটা খাই—পরে দেখা যাবে।'

লোকটা এইরকমই। গোঁ ছাড়ে না। অসুস্থতাকেও পরাজয় ভাবে। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে এখন কী বলবে ভেবে পেল না রজত; এমনকি চলে যাবে কি না, তাও নয়। শুধু বুঝতে পারছে সোজা তার দিকে তাকিয়ে আছেন শম্ভুনাথ। মাথা তোলা যায় না।

'তুমি কেমন আছো?'

'ভালো—'

থেমে গিয়ে বাইরে তাকালেন শম্ভুনাথ। রোদ দেখছেন। এমনও হতে পারে দৃষ্টিটা উপলক্ষ, এর পরের কথাটির জন্যে শব্দ খুঁজছেন তিনি। এবার চলে যাবে কিনা ভাবল রজত। পারল না। এই পরিস্থিতিতে যাওয়া না যাওয়াটা যেন সম্পূর্ণই নির্ভর করছে শম্ভুনাথের কথার ওপর।

'কাল তোমার বাবা এসেছিলেন—'

রজতের অস্বস্তি লাগল। এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে পারলেই ভালো হতো। এখন আর পারা যাবে না। সময় নিয়ে চোখ তুলল সে।

'কিছু বলছিলেন?'

'না।' আবার জানলার দিকে। আলোও কখনো কখনো মলিন করে দেয় মানুষকে। সেদিকে তাকিয়েই বললেন, 'ক্রন্দন করছিলেন—'

'কেন?'

'জানি না।' এই স্বরটাই স্বাভাবিক। দু' হাতে মাথার মাঝামাঝি চুল চিরে দু'দিকে নামাতে লাগলেন শম্ভুনাথ। একটু বা উত্তেজিত। খানিক পরে বললেন, 'তোমার জন্মের আগে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে পৃথিবীতে, সেগুলো

জানলে বুঝতে—'

'আমি এ-সব বুঝি না।' প্রায় ভয় পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রজত, 'কান্নাকাটি আমার ভালো লাগে না। আছেই বা কী!'

'যে-মানুষ কাঁদতে এসেছে সে কাঁদবেই!' শম্ভুনাথের গলা ভারী হয়ে এলো, 'বাপ হয়েছেন, কাঁদবেন না!'

'আমার জন্যে?' মরিয়া হয়ে রজত বলল, 'আমি তো খারাপ নেই—'

'এ-কথাটা তুমি তাঁকে বুঝিও।'

আবার মাথার চুলে হাত নিয়ে গেলেন শম্ভুনাথ। ঈষৎ লালচে হয়ে উঠছে মুখ—সম্ভবত জোর করে চাপতে চাইছেন কোনো আবেগ, কোনো কথা।

রজত একটা সুযোগ পেল।

'বুকে ব্যথা। এতো কথা বলবেন না। আমি যাচ্ছি—'

বলতে বলতেই বেরিয়ে যাচ্ছিল রজত। শম্ভুনাথ ডাকলেন, 'শোনো—'

রজত ঘুরে দাঁড়াল।

'এদিকে এসো। আমার কাছে।'

হাত বাড়িয়ে ওর কব্জিটা একবার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলেন শম্ভুনাথ। ছেড়ে দিলেন আবার। রজতের মনে হলো জ্বরও আছে। কাছে ডাকার রহস্য বুঝল না।

'অসুস্থ না হলে আমিই তোমার কাছে যেতাম। কয়েকটা কথা বলার ছিল—'

আবার চুপ করে গেলেন শম্ভুনাথ। একটু পরে বললেন, 'তোমার দাদার অ্যালাউন্স না কি একটা কাটা গেছে, মাসে মাসে তোমাকে টাকা দিতে অসুবিধা হচ্ছে। তুমি আর ওর কাছে নিও না। এখন থেকে আমিই তোমাকে দেব টাকাটা। তোমার চিন্তা করার কিছু নেই—'

কথাগুলো আলাদা আলাদা করে কানে তুলল রজত, তারপর ভুলে গেল। কী যেন একটা হতে থাকল মাথার ভিতর। অবর্ণনীয় একরকম অনুভূতিতে শরীর কাঁপিয়ে সে তাকিয়ে থাকল শম্ভুনাথের বালিশলাগা মুখের দিকে। ক্রমশ ভিজে এলো চোখের পাতা। কান্না সে একদম পছন্দ করে না—এটা ভাবতে গিয়ে, নিজেকে নিরস্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, টপটপ করে জল পড়তে লাগল তার চোখ দিয়ে।

'তুমি তোমার বাবার স্বভাব পেয়েছ! সহজেই কাতর হও। এ-সব আছেই—', আবার হাত বাড়িয়ে রজতের কব্জিটা ধরে ফেললেন শম্ভুনাথ। শান্তভাবে বললেন, 'আমি এখনো অনেকদিন বাঁচব--আমি তোমার ভালো দেখে যাবো—'

চোখটা মুছে নিল রজত। তবু বেশ কিছুক্ষণ একটা লালচে আভা লেগে থাকল চোখে। এই চোখে দেখলে এখন সবই অন্যরকম লাগছে। ক্রমাগত গতি বদল করছে নিঃশ্বাস। একটা বড়ো কিছু ঢুকে গিয়ে ভরতে ভরতে খালি করে

যাচ্ছে বুক। সেখানে হাত বুলিয়ে দেখল বোতামের ঘরগুলো খালি নেই আর। শরীরের এই স্বাদ, মাথার ভিতরের এইসব অনুভূতি নিয়ে ইচ্ছে করে কোথাও মাথা পেতে রাখতে। অনেক, অনেকক্ষণ। বুঝতে পারে নিজের বোধ আর অনুভবগুলো নিয়ে একা-একা হাঁটতে পারে না কেউ—এলোপাথাড়ি হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস। এতোদিন হয়ে গেল, আমার কথা তোর মনে পড়ে না, টুপুর? কী পেয়ে গেলি সেখানে! ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরাল রজত, হাঁটতে লাগল অন্যমনস্ক। রোদের ভিতর দিয়ে এখন অনেক দূর অব্দি দেখতে পায় সে। গাছগাছালির ভিড়ে সেখানে আড়াল হয়ে থাকে রোদ—ছায়ার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যায় দু'জন।

সকালের ভোঁতা, কিছু মনে-না-পড়া ভাবটুকু আর নেই। ভাবনার মধ্যে ঢুকে পড়েছে মায়াময় আলস্য—গ্রহণ করবার জন্যে প্রখর হয়ে আছে অনুভূতিগুলো। একই সময়ে কেমন পলকা লাগছে নিজেকে—যেন সে যা ছিল তা নেই আর, যেখানে ছিল সেখান থেকে চলে এসেছে অপরিচিত কোনো জায়গায়। এখানে সবই ভেজা-ভেজা। অনেকদিন পরে দয়ামায়ার ছোঁয়াটাকে বৃষ্টিভেজা জামার মতো গায়ে জড়িয়ে নিল রজত। বড়ো দুঃখী মনে হলো নিজেকে। বেঁচে থাকার প্রযোজনগুলো যে কেড়েকুড়ে নিতে পারে না, প্রতি পায়ে নির্ভর কবতে হয় কারো না কারো দয়ার ওপর—একটি সঙ্গের জন্যে কাতর হয়ে অপেক্ষা করতে হয়, দুঃখী ছাড়া সে আর কী? অথচ সে কি এমন হতে চেয়েছিল, কোনোদিন বুঝতে পেরেছিল এ-রকম হবে! ঠেকে ঠেকে যে-অবস্থাটা সহ্য হয়ে আসছিল ক্রমশ, কেন মনে হচ্ছে আবার তাতে একটা ওলটপালট হবে! আজ সকালে কি আবার উড়োচিঠি পেয়ে গেল সে?

কাছাকাছি ওষুধের দোকানে ট্যাবলেটটা পেল না। প্রেসক্রিপসনে চোখ বুলিয়ে কাউন্টারের লোকটি পত্রপাঠ বিদায় করতে চাইল তাকে—'সাপ্লাই নেই, দেখুন আর কোথাও পান কি না''

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে রজত দেখল কাউন্টারের পাশে টেবিলের ওপর চকচক করছে টেলিফোন। মনে হয় এইমাত্র ঝাড়ামোছা হয়েছে, সারা রাত বিশ্রামের পর এখন আবার বিনিময়ের জন্যে তৈরী। ডায়াল করলেই রিং হবে। তারপব ওপাশ থেকে—

'একটা ফোন করতে পারি?'

লোকটি একইভাবে বলল, 'চাবি নেই—'

বুঝতে সময় লাগল। কাগজ পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লোকটি, উদাসীন মুখ, আর একবার অনুরোধ করলে হয়তো বলবে সাপ্লাই নেই। অন্য সময় হলে রজত বলতে পারত, ধাপ্পা! আমার চোখ নেই! হয়তো ধমকেই কাৎ হয়ে যেত লোকটা। কিন্তু এখন সে দেখছে লালচে দৃষ্টিতে, ভিজে নরম হয়ে আছে গা, ইচ্ছে করলেও বেঁকে দাঁড়াতে পারবে না।

মুচকি হেসে বেরিয়ে এলো রজত। যে করেই হোক শম্ভুনাথের ওষুধটা জোগাড় করতে হবে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। কাছে পিঠে টেলিফোন না পেলে হয় পোস্টাপিসে, না হয় চলে যেতে হবে অনীশদার বাড়ি। অফিসের কাজে দিন দুয়েক হলো দিল্লী গেছে অনীশদা, শিখা বউদি একা—তার ওপর শুনেছিল শরীর ভালো নয়। যাওয়া দরকার। কালই যেতে পারত, পল্লবের সঙ্গে সেলুনে ঢুকে আর নাইট শোয়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল বেমালুম। সাপ্লাই নেই বলতে কী বোঝায়! যদি একেবারেই পাওয়া না যায়? তাহলে বাড়ি না ফিরে এক্ষুনি ছুটতে হবে ডাক্তারের চেম্বারে, বদলে নিতে হবে প্রেসক্রিপসনটা। তাতে একটু দেরি হবে। তা হোক, ওষুধটা চাই-ই।

সামনে ইউনিক ফার্মেসী। এখনই বেশ ভিড়। ওষুধটা চাইবার আগেই কাউন্টারে মাথা গলিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল টেলিফোন আছে কিনা। নেই। ওষুধটা পেয়ে গেল। যাক, দেরি হবে না। প্রেসক্রিপসনটা জমা দিয়ে অপেক্ষা করতে করতে রজত ভাবল, এখনই একবার চলে যাবে নাকি অনীশদার বাড়ি? না, থাক। পাঁচ দিন পারলে আরও কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই পারবে।

ওষুধটা নিয়ে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল কানে। একটুও দেরি না করে ছুটে গিয়ে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল রজত।

'একটা ফোন করতে পারি?'

লোকটি তাকাল, ঠিক ততোক্ষণ, যার মধ্যে যে-কোনো উত্তর ভেবে নেওয়া যায়।

'কথা বলছে। অপেক্ষা করতে হবে।'

'ঠিক আছে—'

'খুচরো আছে? পঞ্চাশ পয়সা?'

রজত ঘাড় নাড়ল। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ। লোকটি বলল, 'যান—'

কাউন্টারের পাশ দিয়ে ডক্টর-মার্ক। ঘরে ঢুকে ঝপ্ করে রিসিভারটা তুলে নিল রজত। হাতটা কাঁপতে লাগল অল্প। যাক, এনগেজড্ নয়। পৃথিবীর মধুরতম শব্দটি ভেসে এলো কানে। রিং হচ্ছে।

'হ্যালো—'

'টুপুর আছে?'

'ও তো ফেরেনি—'

'ফেরেনি!'

'না। তুমি কে?'

জবাব না দিয়ে রিসিভার-ধরা হাতটাকে দূরে নিয়ে গেল রজত। এক মুহূর্ত। তারপর নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল জায়গা মতো। পয়সা দিয়ে বেরিয়ে

...লা বাইরে। চারিদিকে সাইলেন্স্ টাঙনো। নিঃশব্দে। রাস্তা পার হলো। নিঃশব্দে। আর একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে ফুটপাথের পানের দোকানের সামনে দড়ির আগুন দেখতে পেয়ে মনে মনে হাসল সে। দেশলাইও শব্দ করে।

যাক। নিঃশব্দে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে রজত ভাবল, শম্ভুনাথের বুকের ব্যথাটা তো কমুক। কতো দায়িত্ব তার—বেঁচে থাকা জরুরী। তার ভালো দেখার জন্যে এখনো অনেকদিন বেঁচে থাকবে শম্ভুনাথ। এখন থেকে মাসে মাসে ষাট টাকার দায় বেড়ে গেল কাকার। মাসে মাসে ষাট টাকার দায় থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে দাদা। একেবারে ক্লাস টুয়ের অঙ্ক। ষাট। ষাট। হাতে রইল'র ঝামেলাটুকু পর্যন্ত নেই। তার আড়ালে কতো সহজে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। তাকে নিয়েই সব -অথচ এ-সব ডিসিসনের কোথাও সে নেই। ষাটে ষাট, মেলালেই হলো। আচ্ছা তো, এর জন্যেই সক্কালবেলায় জহর গাঙ্গুলীর স্টাইলে নাটক করে গেল লোকটা! জানলাটা খুলে দাও, কাছে এসো, তোমার জন্মের আগে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে পৃথিবীতে— অ্যাঁ! শুনে সেও ঝপাঝপ জল বের করল চোখের! এ তো শালা জেনারেশন গ্যাপের ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য! ফিল্ম্-টিল্ম্ হয়ে যাবে নাকি!

ট্যাবলেটের স্ট্রিপটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে হাত নিসপিস করে উঠল রজতের। কোনোরকমে সামলে নিল নিজেকে। খলবলে একটা হাসি উঠে এলো গলায়। নিঃশব্দে। পল্লব শালা ঠিকই বলেছিল, বাপটা একটা জিনিস। পয়লা নম্বরের ফক্কিবাজ—কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ার মতো চোখের জল ফেলে যায় গোপনে। কী যেন ডায়লগটা? যে-মানুষ কাঁদতে এসেছে, সে কাঁদবেই! কী ডায়লগ মাইরি, শরৎচন্দরকেও ছাড়িয়ে যায়! আমার জন্যে? কাঁদবেই যদি, তাহলে বাপ হতে গিয়েছিলে কেন? কে বলেছিল জন্ম দিতে? তখনই নুনের জোগাড় করে রাখোনি কেন! আরও তো অনেক বাপ আছে, কারুর ছেলেরই ভাগ্য তো ষাট টাকার নাটকে দাঁড়িয়ে থাকেনি! তুমি দায়ী, তুমিই কালপ্রিট। শুরু করতে হলে তোমাকে দিয়েই—

কানে তালা লাগাব মতো একটা নৈঃশব্দ্য যাবতীয় রাগের স্তব্ধতা নিয়ে ঝন্ঝন্ করে বাজতে লাগল রজতের কানে। রাস্তা ভর্তি লোকজনের মধ্যে একা হতে হতে তার মনে হলো মাথার ভিতর শিরার জালগুলো ফাঁপতে ফাঁপতে মোটা হয়ে উঠছে কেঁচোর মতো, যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে। বুঝতে পারল না কেন এমন নিঃশব্দ চারিদিক! কেউ কি পারে না এটা ভেঙে দিতে! কেউ কি পারে না?

একটা কুকুর শুয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। প্রায় জ্ঞানশূন্য রাগে প্রচণ্ড একটা লাথি ছুঁড়ল রজত। ছিটকে উঠে অনেকটা দূর পর্যন্ত তেড়াবেকা হয়ে দাঁড়ে গেল কুকুরটা—অপ্রস্তুত কিছু লোকজন ছুটে গেল এদিকে ওদিকে—

দম বন্ধ করে রজত শুনল কুকুরটা চিৎকার করছে পরিত্রাহী গলায়, কর্কশ সেই আওয়াজে খানখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে স্তব্ধতা।

মনে মনে হাসল রজত। চ্যাঁচা শালা, কুকুর! আমি তো মানুষ!

লম্বা চেহারার একটি যুবক ছুটে এলো তার সামনে। ফিটফাট পোষাক, বোধহয় অফিস যাচ্ছে। গায়ে ভুরভুর করছে সেন্টের গন্ধ।

'কী ব্যাপার, দাদা? কামড়াবে না!'

হেসে মাথা নাড়ল রজত। কামড়াবে। সুতরাং, প্রস্তুত থাকো। নিঃশব্দ চোখ তুলে তাকাল লোকটির মুখের দিকে। মনে মনে বলল, কুকুর বলে বেঁচে গেল। তুমি হলে ফিনিশ হয়ে যেতে।

কিছু না বলেই চলে গেল যুবকটি। যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখল তাকে। হাসতে হাসতে আরও একটু এগিয়ে গেল রজত। খুব অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল, খুব ভোরবেলায় একটা ট্রেন ছাড়ে ধানবাদ থেকে। আসে দুর্গা-পুরের ওপর দিয়ে—কলকাতা আর কতোদূর! তখন ভাবল, সকালের গাড়িই ভালো। যদি একা আসে, রাতবিরেতে না ফেরাই ভালো—খচ্চরে ভরা চারিদিকে তোর সরল মুখের মর্যাদা দেবে না কেউ। এতো দূর অস্পষ্টতার ভিতর দাঁড়িয়ে আমি হয়তো টেরই পাবো না কিছু। না, সকালেই ভালো। যদি তাই হয়, তাহলে এখন সে ট্রেনে। আমি তৈরি হয়ে বেরুতে বেরুতেই সময় হয়ে যাবে হয়তো। যদি সব ঠিক-ঠিক চলে, অনীশদার বাড়ি থেকে আর একটা ট্রাই নেবে।

দরজা খুলতেই সুধার হাতে ওষুধের স্ট্রিপটা তুলে দিল রজত। সঙ্গে প্রেসক্রিপসন আর খুচরো টাকা পয়সা। সকালে যে-রকম দেখেছিল তার চেয়ে এখন একটু অন্যরকম লাগছে সুধাকে। হাসিখুশি। বোধহয় বিনা ওষুধেই ব্যথা নেমে গেছে শম্ভুনাথের। অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। এক পলক দেখে নিজের ঘরের দিকে হেঁটে গেল রজত।

সুধা জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবি আর?'

'না। আমি এখুনি বেরুব।'

'এতো সকালে!' উল্টোদিকে তাকিয়েও রজত অনুভব করল সুধার হাসি পিঠ ছুঁয়ে যাচ্ছে তার, 'বাড়িতে তোর মন টেঁকে না, না?'

'মনটন বুঝি না। ওসব তোমাদের—', অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাগুলো বেরিয়ে এলো রজতের মুখ দিয়ে, 'বুড়োটা এবার এলে বলে দিও কান্নাকাটি নাটক আমার ভালো লাগে না। আমার জন্যে ভাববার দরকার নেই। আমারটা আমিই বুঝব—'

'কী হলো তোর, হঠাৎ!'

'হবে আবার কি, কিছুই না। ভাত পাওয়া যাবে এখন? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

সুধা কি বলল না বলল শোনা প্রয়োজন মনে করল না রজত। হয়তো কিছুই বলেনি, হয়তো তার কথার ধরনে আহত হলো একটু। হু কেয়ারস্!

বিছানাটা ইতিমধ্যে গুছিয়ে দিয়েছে সুধা। চাদরের ওপরে ডোরাকাটা রোদ। টান-টান করে নিজেকে ছড়িয়ে দিতেই সেটা চেপে বসল বুকের ওপর। অনীশদা বলেছিল মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে। কোন মাটি? চারিদিকে শুধু জল আব জল, প্রতি মুহূর্তেই হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে আরও। তীর দেখা যায় না। এই জল সাঁতরে যাবেই বা কোনদিকে? নাকি এলোপাথাড়ি হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হুস্ করে তলিয়ে যাবে একদিন! খুব কি ক্ষতি হবে পৃথিবীর? মনে তো হয় না। এই ঘর, এই বিছানাটা খালি হয়ে যবে হয়তো—বন্ধ জানলার গায়ে চুপচাপ অপেক্ষা করবে রোদ। ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে সুধা ভাববে, শম্ভুনাথ তো খান না, কী লাভ একার জন্যে এই কাকভোরে উঠে উনুন ধরানোর, চায়ের জল চাপানোর? ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাবে আলস্যে। বাপটা তো এখনই রিহার্সাল দিয়ে যাচ্ছে কান্নার, হয়তো ডেডবডি দেখে উপুড় হয়ে চিল্লাবে কিছুক্ষণ—মরাকান্না বলে কথা আছে না একটা?—আস্তে আস্তে ভেবে নেবে, নুলোর চেয়ে চুলো ভালো। বুড়ো বয়সে জোর কমে আসে স্মৃতির, এক-একটা বিকেলে যখন বাঁশি বাজিয়ে স্টেশন ছাড়িয়ে যাবে কেষ্টনগর লোক্যাল, একবারও কি ভাববে বহুকাল কলকাতা যাওয়া হয় না! মা? তার মুখ মনেও পড়ে না, কথা প্রায় বলেই না বলে গলার স্বরও। তবে, এই একটা জায়গায় দ্বিধা থেকে যায় অল্প। মনে পড়ে, জেল থেকে বেরুনোর পর গভীর রাতে উঠে এসে হাত বোলাতো তার হাতের ক্ষতটায়—হ্যাঁ রে, লেগেছিল খুব? এমনিতে চুপচাপ, কিছুদিন পরে পরেই যখন জিজ্ঞেস করত মনে হতো স্নেহ, মায়া, দুঃখবোধ পেরিয়ে রক্তে জড়িয়ে গেছে প্রশ্নটা, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে হঠাৎ। হয়তো এবারও তাই হবে। এমনও হতে পারে, প্রশ্ন থাকবে না কোনো—শুধু স্বাভাবিকের চেয়ে অন্যরকম হয়ে যাবে শ্বাসপ্রশ্বাস। বুকে ব্যথা নিয়েও আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবার দায় থাকবে না শম্ভুনাথের। আর কে? দাদা? ঋণটা থেকে যাবে, এই যা। খারাপ লাগবে বটে অনীশদা আর শিখা বউদির। পুজো দেওয়ার-লিস্টি থেকে কেটে যাবে একটি নাম, অনীশদার অভাব কাটানোর জন্যে একা-একা লুডোর ছক পেতে নিয়ে বসবে শিখা বউদি—খেলবে কি? কী ভাববে অনীশদা, এর চেয়ে হাজতে মরলেই ভালো করতিস! আর কে? পল্লব, অসিত, ঈপ্সিতা, পিনাকী, চন্দনা? টুপুর? একজনও কি আছে, রজত নেই বলে পৃথিবী শূন্য মনে হবে যার কাছে, যেখানে যখন চলে যাবে, সেখানে, ঠিক তখনই থেমে যাবে যার দিন রাত? টুপুর? না। পাঁচ দিন থেকে পাঁচ মাস, পাঁচ মাস থেকে পাঁচ বছর, পাঁচ বছর থেকে পঞ্চাশ বছরে চলে যাওয়া খুব বেশী কঠিন নয়। সময় টাল খাবে না কোথাও।

ভাবনাটা জড়িয়ে গেল। একেই বলে আঙুলে গোনা যায়--পাঁচ অঙুলের

কুঁড়িটা দাগও ছুঁতে পারে না। চেনাশোনা সব মুখগুলির সামনেই প্রশ্ন ঝোলানো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাবলীল চোখে রাস্তার লোকজন দেখতে লাগল রজত, গতি অব্যাহত রেখেই যতোটা দেখা যায় দেখতে লাগল প্রতিটি মুখ। একই রাস্তার ওপর দিয়ে এই যে হাঁটছি আমি তোমাদের সঙ্গে, একই রোদ মাথায় করে, একই সঙ্গে ট্রামে বাসে উঠব, টিকিট কাটব একই কন্ডাকটরের কাছ থেকে—তাহলে, তোমরা কারা? আমাকে চেনো? কী সম্পর্ক তোমাদের সঙ্গে আমার? যদি মরে যাই, বল হরি হরি বোলের কাঁধে চড়া খাটটার দিকে আড় চোখে তাকাবে হয়তো। আমার কথা ভাববে কি? তোমরা কি বুঝতে পারো, অন্য সকলেই যখন বেঁচে আছে তখন আমার পক্ষেও বেঁচে থাকাটা কতো জরুরী! না, পারো না। কেউ পারে না। পারে না বলেই খুব তাড়াতাড়ি একটা ডিসিসন নিতে হবে আমাকে। বাঁচা, না মরা? বাঁচতে হলেই প্রতিশোধ নিতে হবে, নিজের চামড়ায় উল্টেপাল্টে ঘষে ঘষে শান দিতে হবে ছুরিতে, তাতে যদি দাগটা ওঠে। তা না হলে মরা। খুব কঠিন কিছু নয়। সাধারণ মেয়ে বউরাই এটা ওটা খেয়ে টেঁসে যাচ্ছে দিব্যি, আমি তো লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকের ছেলে—একটা উপায় খুঁজে পাবো না! তবে, হ্যাঁ, যদি মরতেই হয়, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়, ওসব ন্যাকামিতে যাবো না। স্পষ্টই দায়ী করে যাবো। কাকে?

একটা ধাঁধার মতো লাগছে পুরো ব্যাপারটা। যতো দিন যাচ্ছে ততোই আরও উদ্ধত হয়ে উঠছে রাগ, কিন্তু সেটা যে কার প্রতি বুঝতে পারছে না ঠিক। এমনই বা হবে কেন! অনীশদা বলেছিল একদিন, শত্রু এই ঘুণধরা সমাজটা, ঘা দিতে হবে এটাকেই। এ তো সেই মিনিস্টারের বুকনির মতোই শোনাচ্ছে—আজ সকালেই না পড়েছিল কাগজে! ও মশাই, সমাজ ব্যাপারটা কী? সমাজ কি এই মানুষগুলো, ওই পুলিসগুলো, কিংবা, ওই মিনিস্টারগুলো? সবই তো ছাইঠাসা কাকতাড়ুয়া—একইরকম চোখমুখ, এঁড়ে বকনায় তফাত করা যায় না কোনো। ঘা-টা দেবো কাকে!

একটু বা ঘোর নিয়ে অনীশের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল রজত। বেল টিপল।

'আ-রে! এসো। আমি ভাবলুম কে!' দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শিখা বলল, 'আর একটু দেরি করলেই বেরিয়ে পড়তাম। কী ব্যাপার, এতো গম্ভীর কেন?'

'কিছু নয়। এমনিই। বেরুচ্ছিলেন?'

'ডাক্তারের কাছে। ফোন করেছিলাম, বলল এক্ষুনি চলে আসতে।'

এতোক্ষণ ভুলেই ছিল প্রায়, শিখাই যেন ডায়াল করে দিল। থেমে থেমে, কিন্তু স্পষ্ট, রিং হতে লাগল মাথায়। রজত বলল, 'এখনো ভুগছেন? কোন ডাক্তার?'

'সেই যে—বালীগঞ্জে, ডক্টর মিসেস সোম। একবার গিয়েছিলে না আমার সঙ্গে?'

মুখ দেখে মনে হয় না কোনো রোগটোগ আছে শিখার, ভুগছে। বরং শ্রী ফেটে আলোয় ঝিকঝিক করছে চোখদুটো। রজতের ইচ্ছে করল অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ওই চোখদুটোর দিকে। ঘাড় নাড়ল। গিয়েছিল।

'অনীশদা ফিরছেন কবে?'

'সকালে ট্রাঙ্ককল করেছিল। কাল না হলে পরশু তো নিশ্চয়ই।' সম্ভবত অন্য কোনো খুশিরও কারণ আছে শিখার। হাসিটা জিইয়ে রেখে বলল, 'চা খাবে? এসেছ যখন বসে যাও একটু?'

'বউদি, একটা ফোন করব?'

'করো। চা খাবে?'

'থাক।'

শিখা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'যাচ্ছ কোথায় বলো তো? কলেজে?'

'কলেজে?' কাঁচুমাচু ভাব করে হাসল রজত। ট্রাউজার্সের পকেট থেকে রোল-করা খাতাটা বের করে বলল, 'যাবো বলে সঙ্গে নিয়েছি। যাবো কি না জানি না।'

'তাহলে চলো না আমার সঙ্গে? সেখান থেকে চলে যেও। তুমি থাকলে একটা ট্যাক্সিও ধরে দিতে পারবে—'

'ঠিক আছে।'

রজত ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে অপেক্ষা করল খানিক। একটু ভাবল। গতকালের হিসেবটাই মনে আছে তার। পাঁচদিন নয়, আজ ছ'দিন। যদি ফিরে আসে—, না, টেলিফোনে সব বলা যায় না। খরচোখে নাম্বারগুলোর দিকে তাকিয়ে একলক্ষ্যে আঙুলটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল রজত। ডায়াল করল। রিং হচ্ছে। এটা অসময় নয়, তবু ফোন ধরতে এতো দেরি হবে কেন!

'হ্যালো—'

জ্যাঠামশাই সম্ভবত। আশ্বস্ত হলো রজত।

'টুপুর আছে?'

'ও তো দুর্গাপুরে গেছে—'

'ও।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে গিয়েও কী ভেবে আঁকড়ে থাকল রজত। গভীর গলায় বলল, 'ফেরেনি!'

'না। কে কথা বলছ?'

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না শিখাকে। হয়তো পাশের ঘরে কিংবা ডাইনিং টেবিলের সামনে। নিশ্চয়ই কান পেতে নেই। তারও তাড়া আছে।

'পল্লব। টুপুরের বন্ধু।'

'ও। টুম্পুর তো ফেরেনি।'

'কবে ফিরবে?'

'আজ সকালে ট্রাঙ্ককল করেছিল। বোধহয় দু' তিনদিন পরে। কিছু—'

নামিয়ে রাখল। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। একমনে দাঁড়িয়ে রিস্ট-ওয়াচের ব্যাণ্ড লাগাচ্ছে শিখা। হাতটা মুঠো করা। কাছাকাছি পৌঁছে রজত বলল, 'চলুন—'

চোখের পাশ দিয়ে শিখা দেখল তাকে।

'মৌরি খাবে?'

রজত হাত পাতল। বন্ধ মুঠোটা উপুড় করে দিল শিখা। মৌরির গন্ধ, পাশাপাশি হাঁটছে ভিজে চুলের ঠাণ্ডা সুগন্ধ। চাবিটা নিয়েছে কিনা দেখার জন্যে ব্যাগ খুলল শিখা। নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে, বাইরে থেকে টেনে দিল দরজাটা। ঠেলে দেখল। রজত ভাবল, এই একটা চ্যালেঞ্জের ভিতর দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করে নিতে পারে সে। ঘুঁষি মারলে হাত ফেটে যাবে। পায়ের জোরে ভাঙবেই। তাতে শব্দ হবে বিকট। কাঠ বলেই হবে। সব ভাঙায় শব্দ হয় না।

নিজেকে যতোটা সম্ভব স্বচ্ছন্দ করে নিল রজত। শিখা নেমে গেছে কয়েক ধাপ। দ্রুত ও পরপর কয়েকটা সিঁড়ি নেমে এলো সে।

'অনীশদা ট্রাংককল করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। একেবারে ভোরে।' শিখা বলল, 'আজ ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে—'

'কেমন লাগে?'

'কী?'

'দূর থেকে ভেসে আসা কারুর গলা শুনতে—?'

'ভালোই তো লাগা উচিত।' শিখা রহস্য করল, 'সবই নির্ভর করে কে করছে তার ওপর, কী বলছে তার ওপর। তোমার কেমন লাগে?'

'আমার?' রজত হাসল। বলল, 'আমার তো টেলিফোন নেই। থাকলে বুঝতে পারতাম।'

শিখা বলল, 'যার গলা শুনতে চাও, সে যেখান থেকেই কথা বলুক, একই-রকম লাগবে।'

'বোধহয়—'

হাঁটছিল সামনে তাকিয়ে। হঠাৎই 'ট্যাক্সি, ট্যাক্সি' বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে গেল রজত। ট্যাক্সিটার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা ধরে দৌড়ল খানিক। দাঁড়াবার পর নিঃশ্বাসটা সইয়ে নিতে নিতে ভাবল, দু' তিনদিনের মধ্যে আর টেলিফোনের জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না।

'তুমি খুব পয়া তো!'

'আমি নয়। আপনি—'

'তুমিই। এই সময় রাস্তায় নেমে—', থেমে গিয়ে শিখা বলল, 'সামনে কেন! তুমিও এখানে এসো—'

শিখার পাশে বসে রজত বলল, 'বালীগঞ্জ—'

'এই, শোনো? ধরো তো?'

ডান হাতের দুটো আঙুল আলাদা করে বাড়িয়ে দিয়েছে শিখা, একটা ধরতে হবে। অল্প ইতস্তত করে দুটোর মধ্যে ছোটটাকে ছুঁয়ে দিল রজত। হাতটা টেনে নিল শিখা। তারপর চুপচাপ হয়ে গেল। হাসিটা এখনো লেগে আছে ঠোঁটে। বাইরে তাকিয়ে রাস্তা দেখছে, কিংবা কিছুই দেখছে না। ওদিকটায় ছায়া, তবু শেষ রাস্তাটুকু দ্রুত হেঁটে আসার জন্যেই সম্ভবত, ঘাম চিকচিক করছে কানের তলায়। রজত মুখ ফিরিয়ে নিল। আজ নিয়ে ছ'দিন হলো, আরও দু'দিন হলে আট দিন হবে। তিন দিন হলে ন'দিন। সময় থেমে থাকে না। রজত বলল, 'আমায় বোঝাচ্ছিস কেন!'

'বুঝতে চাইছিস না বলে।' টুপুর বলল, 'দুটো দিন তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে—'

'হঠাৎ শর্মিলার কাছে?'

'বন্ধুর কাছে বন্ধু যায় না!'

'তুই শর্মিলার বাড়িতেই যেতে চাইতিস না!'

'জায়গাটারও টান আছে—, আগে যাইনি।'

'তাই বল!' জের টেনে রজত বলল, 'ডায়মণ্ডহারবার, ব্যাণ্ডেল—এ-সব জায়গায়ও তো যাসনি কখনো?'

রাস্তা। টুপুর থেমে দাঁড়াল।

'সব ব্যাপারে তোর কাছে কেন জবাবদিহি করতে হবে বল তো?'

রজত তাকাল ওর দিকে। বিকেলে সুন্দর হয়ে ওঠে টুপুর, ছায়া ছড়ালে আরও। কাছে থাকাটাই তখন হয়ে ওঠে দুরত্বময়। রাগটা চেপে রাখতে হয়। এখনো তাই করল। ওকে পাশে আসার সময় দিয়ে বলল, 'আমি কিছুই জানতে চাইনি। তুই-ই বলছিস!'

'বেশ করছি বলছি। তোকেও শুনতে হবে।'

'চল, চা খাই—'

বেয়ারা পর্দা টেনে দিয়ে গেল। রজত সরিয়ে দিল আবার। হাসতে লাগল আপন মনে। চায়ে চুমুক দেবার আগে বলল, 'ঘামছিস। ঘামটা মুছে নে—'

আঁচল তুলে আলগোছে কানের তলাটা মুছে নিল টুপুর।

'কাল হঠাৎ ওইভাবে চলে এলি কেন!'

'ভালো লাগছিল না—আমি যেতে চাইনি—'

'ওরা কী ভাবল!'

'ওরা!' সোজাসুজি টুপুরের চোখে চোখ রাখল রজত, 'ও, ওরা! ক
যায় আসে—'

টুপুরও দেখছে তাকে। দেখতে দেখতে ওর হাতে হাত রাখল। পদ
নেই, একবারের জন্যে রজত ভাবল হাতটা সরিয়ে নেবে। এতোদিন রঙটা
দেখেছে, আর নিটোল আঙুলের নড়াচড়া। ছোঁয়াছুঁয়িও হয়নি তা নয়। কিন্তু
রাখল এই প্রথম—সেটা বুঝবার জন্যেই রজত সময় নিতে লাগল।

'ক'দিন থেকে তোকে আমার খুব ভয় লাগছে!'

'ডায়লগ দিস না।'

'সত্যি।' বেয়ারাটা ঘুরঘুর করছে। টুপুর নিজেই তুলে নিল হাতটা
থেমে থেমে বলল, 'কেন জানি না!'

'হেঁয়ালি ছাড়। শর্মিলাটা ন্যাকা। ওর সঙ্গে অতো কিসের!'

'শর্মিলাকে টানছিস কেন?'

'চা খেয়েছিস? ওঠ!'

টুপুর হঠাৎ বলল, 'না। আমি উঠব না এখন। তোকেও বসতে হবে—'

বোধ হয় এসে গেল। নড়ে উঠে শিখাকে দেখল রজত। কানের পাশ দিয়ে
ঘামটা নামছে রেখা হয়ে। শিখা তৈরী।

'ব্যাস, ব্যাস, এইখানে—'

ভাড়া দেবার জন্যে ব্যাগ খুলল শিখা। ঘড়ি দেখে বলল, 'দেরি হয়নি—

'আমি বাইরে দাঁড়াব?'

'কেন! এসো?'

চেম্বারে লোক কম নেই। অধিকাংশই মহিলা। ভিতরের দরজাটা আধ
ভেজানো, তার ওপর হালকা সবুজ পর্দাটা পুরো টানা। অস্পষ্ট কথাবার্ত
শোনা যাচ্ছে ভিতর থেকে, মনে হয় পেসেন্ট আছে। একটি মাঝবয়েসী নার্স
শিখার হাতে ভিজিটরস্ স্লিপ এগিয়ে দিল। শিখা বলল, 'কলমটা
দাও তো?'

গোটা গোটা লেখা শিখার, ঈষৎ হেলে পড়ে বাঁ দিকে। ওমনি টুপুরেরও
তিন দিন যার অপেক্ষা করার কথা চুপচাপ, সে এতো মিল খুঁজে পাচ্ছে
কেন! নাকি সে দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়—নদীগুলো নেমে আসছে
মোহনার দিকে! গভীর জলের সম্মোহনী হাত-পাগুলো অবশ করে ফেলছে
ক্রমশ; একটু পরেই ডুবে যাবে টুপ করে।

পর্দা সরিয়ে নার্সটি ভিতরে ঢুকল এবং বেরিয়ে এলো।

'যান—'

উঠে দাঁড়িয়ে শিখা ডাকল, 'এসো—'

'আমি থাকি না?'

পলকের জন্যে দোমনা হলো শিখা। ভাবল।

'এসো। আমার দেরি হবে না—'

রাশভারি চেহারা। চোখে মেয়েদের পক্ষে অস্বাভাবিক মোটা ফ্রেমের চশমা। কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে অল্প। ইশারায় বসতে বলার আগে রজতের দিকে তাকালেন একবার। তারপর সামনে বসা মেয়েটির দিকে।

'ইউরিন রিপোর্টটা নিয়ে এসো আগে। পজিটিভ কি না দেখতে চাই।'

মেয়েটি উসখুস করে উঠল।

'নিজেই তো বুঝতে পারছি—'

'পেসেন্ট সব বুঝে নিলে ডাক্তারের দরকার হয় না।'

গলা শুনে বোঝা যায় মিসেস সোম নয়, নামের আগে ডক্টর বসানো। কথার শেষে দাঁড়ি—যার মানে আর কোনো কথা নয়।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। চুলে ঈষৎ খরখরে ভাব থাকলেও সব মিলিয়ে ভালো। চিন্তায় নরম হয়ে আছে মুখ, গলায় নীল শিরার আভাস। ব্যাগ খুলে বলল, 'আপনার ফি?'

'পরে হবে। রিপোর্টটা নিয়ে এসো—'

চেয়ার ঠেলে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল মেয়েটি। এতোক্ষণের মধ্যে একবারও তাদের দিকে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না।

'মেয়েটিকে দেখলে? কনসিভ করেছে। কিউরেট করাতে চায়। নিজেই চলে এসেছে—'

রজত মাথা নীচু করে নিল। কথাটার মানে জানে, সেইজন্যেই অস্বস্তি। শিখা বোধহয় খুবই ছেলেমানুষ ভাবে তাকে, না হলে টেনে আনত না। অন্তত এইখানে। এখনই কি উঠে যাওয়া যায়? মেয়েটির মুখ ভাবতে গিয়ে গলার নীল শিরাটাই শুধু ভেসে উঠল চোখে।

'এ-রকম প্রায়ই আসে আজকাল। লিগালাইজড্ হলেও এতোটা ভাবা যায় না।' চশমা নামিয়ে বাঁ হাতে চোখ রগড়ালেন ডক্টর মিসেস সোম। এগুলো স্বগতোক্তি—চোখ এখনো পর্দার দিকে। বললেন, 'আনম্যারেড। চাকরি করে। বয়স মোটে চব্বিশ! জীবন উপভোগ করছে না নষ্ট করছে বুঝতে পারি না। একেবারে প্রফেসানাল অ্যাটিচুড। ফিয়ের টাকা নিয়ে এসেছে—'

কথাগুলো শুনতে শুনতে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল রজত। না পাওয়া পর্যন্ত শিখার দিকে তাকানো যাবে না।

'অনীশ ফিরছে কবে?'

শিখা জবাব দেবার আগেই উঠে পড়ল রজত।

'বউদি, আপনি সেরে নিন। আমি বাইরে আছি—'

বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যারা বসেছিল তাদের সকলেই তাকাল তার দিকে। প্রশ্নে প্রখর দৃষ্টিগুলো, আমল দিল না রজত। সম্ভবত এখনো হাঁটছে মেয়েটি। আজ হোক কিংবা কাল আবার ফিরে আসবে এখানে। আবার ফিরে

যাবে। চব্বিশ হলে প্রায় তার সমবয়সী কিংবা একটু বড়ো। হাবেভাবে আরও। এতো আত্মবিশ্বাস পেল কোত্থেকে! তার জোর তো ভেঙে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই—জলের মধ্যে অসহায় হাত-পা ছুঁড়ছে শুধু, পৌঁছুতে পারছে না কোথাও! বোধ হয় ওই চাকরিটা—চাকরিটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে। মানি মেক্স এ ম্যান—হেলপ্স্ হিম টু মেজার হিমসেল্ফ্, ইভন্ হিজ সোল! কার কথা?

রজত একটা সিগারেট ধরাল। চেম্বারের বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল রোদের দিকে, এক দৃষ্টিতে। এবং ভাবল, তফাৎ আছে। মেয়েটির গায়ে ছাপ নেই কোনো।

চাপা হাসিমুখে বেরিয়ে আসছে শিখা। ভোরের ঠাণ্ডায় অলস হাতে গায়ে চাদর টেনে নেওয়ার মতে ধীরেসুস্থে ওর হাসিটা দেখতে লাগল রজত। মেয়েদের কলকব্জা অনেক বেশী, একদিন পার্কের বেঞ্চিতে বসে পল্লব বলেছিল, খুলে দেখিস—ঘড়িও হার মানবে। হয়তো ঠিকই। রজত বুঝতে পারল না তখন সে শিখার ইচ্ছামতোই আঙুলটা ছুঁয়েছিল কি না!

'তুমি এখানে! আমি ভাবলাম—'

'চলে গেছি?' রাস্তার আধখানা ছায়া, ছায়ার দিকে শিখাকে সরে যেতে দিল রজত। কথা আসছে না। এমনিই বলল, 'যাবো কোথায়? যাবার জায়গা কমে আসছে—'

চোখ তুলে কিছু আঁচ করার চেষ্টা করল শিখা।

'কলেজে যাবে না?'

'যাবো। আপনি কি বাসে, না—?'

'যদি উঠতে পারি।'

কথা। তার পরে কথা। তারও পরে কথা। ভেবে চুপ করে থাকল রজত। ফুটপাথ জুড়ে দোকান, দোকান ও বাড়ির মাঝখানের জায়গাটুকু গিসগিস করছে ভিড়ে। ওরই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে থেমে হাঁটতে লাগল শিখার সঙ্গে সঙ্গে। এইভাবে বাসস্টপ পর্যন্ত যাবে, অপেক্ষা করবে বাসের, শিখা উঠবে। এই কাজগুলোর ভিতর দিয়ে শিখাই এগিয়ে যাবে, যেমন এতোক্ষণ এগলো। সে? শুধুই স্থান পরিবর্তন—জল দিয়ে ঘেরা গণ্ডির ভিতর পিঁপড়ে যেমন একদিক থেকে আর একদিকে ঘুরে ঘুরে শুধুই জল শুঁকে বেড়ায়, বেরোতে পারে না। কী লাভ হলো সঙ্গ দিয়ে শিখাকে? সময় কাটানো? সময় তো কেটেই যায়। দেখতে দেখতে যাদের কেটে যাবার কথা, সেই দুটো দিন এখন ছ'দিনে পৌঁছে রুমাল নাড়ছে নাকের ওপর, গন্ধটা ঢুকে পড়ছে নাকে। সব সুগন্ধেই তো আর নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না!

শিখা চলে যাবার পর একা-একা আরও খানিকটা হাঁটল রজত। একা-একা বাসে উঠল। সে ছাড়া আর কোনো যাত্রী নেই। কণ্ডাকটর নেই, এমনকি

ড্রাইভারও নেই। কোনোখানে বাসস্টপ নেই। ওঠানামা নেই। বাসটা এগিয়ে যাচ্ছে তবু ঊর্ধ্বশ্বাসে, জিব বের করে। থামবে, যদি পাহাড়ের মতো কোনো একটা দেয়াল সামনে এসে দাঁড়ায়—ধাক্কা লেগে ভয়ঙ্কর শব্দে ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

মাথার ভিতর সেই শব্দটা শুনতে পেল রজত। লাফিয়ে উঠে টান দিল দড়িতে। একবার, দু' বার, তারপর যন্ত্রের ধরনে বার বার।

'গাড়ি থামান—'

বাসের সমস্ত যাত্রী এখন তাকিয়ে আছে তার দিকে। কন্ডাকটর ছুটে এসে বলল, 'স্টপে নামতে পারেন না!'

দাঁতে দাঁত ঘষল রজত। শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল। বাসটা থেমে গেছে। মুঠো শক্ত করে রজত দেখল রক্তে ভেসে যাচ্ছে লোকটার মুখ। না, এ নয়। কিছু বলল না। আস্তে আস্তে নেমে পড়ল বাস থেকে।

পোস্টার পড়েছে বিল্ডিংয়ের দেয়ালে। 'শিক্ষা ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে।' নীচে হিজিবিজি। 'ছাত্ররা প্রতিষ্ঠানের পুতুল নয়।' মানে কী? চোখ গেল পরেরটায়, 'শোষণের আর এক নাম পরীক্ষা।' কার পরীক্ষা? কে শোষণ করছে? কাকে? কথাগুলোর গা থেকে শব্দ বেরুচ্ছে ঠং ঠং করে, ওই বাসের ঘন্টির মতো। থামছে না। অল্প হেসে এগিয়ে গেল রজত। শালা! প্যান্ট খুলে ফোয়ারা ছোটানোর মতো কথা ফুটে উঠছে সবখানে!

'এই রজত—রজত?'

থেমে দাঁড়াল। ঈপ্সিতা।

'কালা নাকি রে! শুনতে পাস না?'

রজত হাসল। ঈপ্সিতার ভুরু ফেটে কয়েকটা স্ট্রাইপে ভাগ হয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে গালের ওপর। হেসে বলল, 'কালা হয়ে গেছি—'

'তোর চোখদুটো এমন ঘোলাটে কেন! জ্বর? না, খেয়েছিস কিছু?'

'দ্যাখ—'

রজত হাত বাড়িয়ে দিল। জ্বর দেখার মতো করে ওর হাতটা ছুঁয়ে দেখে ঈপ্সিতা বলল, 'জ্বর নয় তো! একদম ঠান্ডা।'

'মুখ শুঁকে দেখতে পারবি? কিছু খেয়েছি কি না?'

'অসভ্য।' লজ্জিতভাবে আশেপাশে দেখে নিয়ে চোখ তুলল ঈপ্সিতা। বলল, 'সত্যি, এতো লাল কেন চোখদুটো!'

রজত এগিয়ে গেল। ক্লাসের সময় হয়ে এসেছে। ঈপ্সিতাও এগোচ্ছে। পা রাখল সিঁড়িতে। ভরা চেহারা, মেপেজুপে মাংস বসানো। রেডি-টু-ওয়্যার। ওয়্যার! গেঞ্জি? না জাঙিয়া?

'টুপুরের খবর রাখিস?'

'ফেরেনি এখনো।' বেঁকিয়ে হাসল ঈপ্সিতা, 'সেইজন্যে! কাঁদছিলি

নাকি ?'

'কেঁদেছিলাম। আজ সকালে—'

'টুপুরের জন্যে !'

'না। তোদের সকলের জন্যে। সকলের হয়ে অ্যাডভান্স কান্না।' ঠোঁ ছতোটা পারে হাসি ফুটিয়ে রজত বলল, 'কিন্তু সবই আমার জন্যে, নিজে জন্যে—'

'পাগলা ! তুই সত্যিই পাগলা !'

ক্লাসের সামনে বারান্দায় অনেকের জটলা। পল্লব, অসিতকে দেখতে পে রজত। মেয়েগুলো ভিতরে। ডেস্কের ওপর বসে হাত নেড়ে চন্দনাকে ক বোঝাচ্ছে পিনাকী, খুব মন দিয়ে শুনছে নন্দিতা, বসুন্ধরা আর অজিত ঈপ্সিতাও জুটে গেল ওখানে। ব্ল্যাকবোর্ডে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—'নু জোগাড় করে রাখো'। একটু দাঁড়িয়ে লেখাগুলো পড়ল রজত। পল্লব এগি এলো।

'পড়ছিস কি! তোরই বাণী।'

'যতো বাজে ব্যাপার! মুছে ফ্যাল—'

'ইউনিয়নের ইলেকসন, সবাই শালা স্লোগান মারছে। আমাদেরটাও মে দিলাম।'

'মুছে ফ্যাল।'

পল্লব বলল, 'তোর চোখটা লাল কেন রে!'

'জানি না। জ্বরটর হবে হয়তো।' চেপেচুপে চোখের পাতা বন্ধ কর রজত, খুলল, আবার বন্ধ করল। তারপর, খুলে, জিজ্ঞেস করল, 'খুব লাল

'খুব নয়। তবে লালই—'

'মেজাজটা ভালো নেই। বোধহয় কিছু হবে—'

বেল পড়ে গেছে। ওরা ক্লাসে ঢুকল, জায়গা নিয়ে বসতে লাগল ঈপ্সিতার পাশে জায়গাটা খালি। বসবার আগে দু'দিকে সাজানো ডেস্ক ও বেঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রজত পল্লবকে বলল, 'মুছে দে—'

ওপাশে চন্দনা। পাশাপাশি অজিত, পিনাকী, অসিতরা। চন্দনা বল 'কথাগুলোর মানে কী রে?'

ডাস্টার হাতে বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে পল্লব বলল, 'গান্ধীজী বলে ছিলেন—লবণ আন্দোলনের সময়। ইতিহাস পড়িস নি!'

ঠিক তখনই ব্যস্তভাবে তিন চারটি ছেলে ঢুকে পড়ল ক্লাসে। ইউনি ভার্সিটিরই। মুখ চেনা। বোঝা যায় ইলেকসনের ব্যাপারে। লম্বা চেহারা খয়েরি পাঞ্জাবি পরা ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কার ক্লাস?'

অজিত বলল, 'বিজয়বাবুর—'

'উনি বোধহয় আসেননি আজ।'

'উনি বোধহয় আসেননি আজ।' খয়েরি পাঞ্জাবি বলল, 'যাক। আমরা কিছু বলবার জন্যে এসেছি। আমার নাম দিলীপ দত্ত। ইনি সুদীপ চ্যাটার্জী। আমাদের প্রেসিডেন্ট। সুদীপ কিছু বলবে—'

ওরা তাকিয়ে থাকল। রজত দেখল সুদীপ ছেলেটি স্বাস্থ্যবান, গায়ে স্পোর্টস্ সার্ট, ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছে বোতামগুলো। কনফিডেন্স? হতেও পারে। কিন্তু, ভোট চাইতে এসে বলার কী আছে! এ-সব দেখলে গা জ্বালা করে।

স্বাস্থ্যবান ছেলেটি গলা খাঁকারি দিল, চোখ ঈপ্সিতার দিকে। আবার গলা খাঁকারি দিয়ে হাসল। চোখ নামিয়ে চাপা গলায় ঈপ্সিতা বলল, ইডিয়েট!'

'বন্ধুগণ—'

রজত জিজ্ঞেস করল, 'তুই চিনিস নাকি?'

'না। দেখলেই হাসে!' ঈপ্সিতা ফিসফিস করল, 'লোফার। একবার পৌষমেলায় আমাদের পিছু নিয়েছিল। টুপুর জানে—'

'বন্ধুগণ, বলার কথা বিশেষ নেই। আমরা আশা করি, আপনারা আমাকে আর দিলীপকে ভোট দেবেন। কেন ভোট দেবেন? এই কারণে যে, আজকে ছাত্র সমাজের যে অবস্থা, যে দুর্দশা, যে-ধরনের শোষণ চলছে তাদের ওপর, ডিসিপ্লিন আর পরীক্ষার নাম করে প্রতিষ্ঠান যেভাবে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে গোটা ছাত্র সমাজকে—তার থেকে মুক্তির জন্যে চাই সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন, চাই উচিত নেতৃত্ব, চাই—'

'আপনি কি মুক্তিদাতা!'

গোটা ক্লাস দেখল রজত উঠে দাঁড়িয়েছে, হাত দুটো মুঠো করে রাখা ডেস্কের ওপর—কাঁপছে। পিছন থেকে উঠে এসে ওকে বসাবার চেষ্টা করল পল্লব, 'রজত! বোস—'

'ছাড়! এ-সব বুজরুকি আমার জানা আছে—'

থতমত খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল ছেলেটি। এবার সোজাসুজি রজতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে!'

'মানে সোজা।' ডেস্কে ঘুষি ঠুকল রজত, 'ভোট চাইতে এসেছেন, ভোট চেয়ে চলে যান। বুলি ছিটোবেন না—'

ঈপ্সিতা ওর গায়ে ঘেঁষে এলো; রজতকে চেনে। দেখল, ওদিকে অসিত, পিনাকীও উঠে দাঁড়িয়েছে। চন্দনা বলল, 'কী করছিস রজত! চুপ কর!'

'এ-সব কথা শুনলে গা জ্বালা করে—'

'কী বললেন!' ছেলেটি হঠাৎ এগিয়ে এলো দু' পা। বুকখোলা সার্টের কলার মুঠো করে ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'গা জ্বালা করলে বেরিয়ে যাও। এটা তোমার বাপের জায়গা নয়—'

চোখের পলকে ঘটনাটা ঘটে গেল। কেউ কিছু বুঝবার আগেই নিজের জায়গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে ছেলেটির পেট লক্ষ করে প্রচণ্ড লাথি ছুঁড়ল রজত। ছেলেটি গড়িয়ে পড়ল টীচার্স ডেস্কের ওপর, ডেস্কসুদ্ধ ঘেঁষটে পিছনে সরে গেল কিছুটা—যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল চোখদুটো। তারপরেই উঠে এলো টলতে টলতে।

রজত এগিয়ে যাচ্ছিল, খয়েরি পাঞ্জাবি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওকে। রজত চেঁচিয়ে বলল, 'সরে যান! শালাকে খুনই করে ফেলব আজ—'

কথাটা শেষ করতে পারল না। তার আগেই স্পোর্টস সার্ট পরা ছেলেটি ঘুঁষি চালালো রজতের মুখ লক্ষ্য করে। ওরা দেখল, পাল্টা দেবার জন্যে শরীর টান করে দাঁড়িয়েছে রজত; এক মুহূর্ত, তারপরেই নাক মুখ বেয়ে গলগল করে বেরিয়ে এলো রক্ত। ওপর দিকে মুখ তুলে হাঁ করল রজত, এলোমেলো হাত বাড়িয়ে ডেস্ক চেপে ধরার চেষ্টা করল—ঝিমঝিম করে উঠল মাথা। ভারসাম্য হারিয়ে টাল খেয়ে পড়ছিল, একই সঙ্গে চন্দনা, পল্লব আর ঈপ্সিতা ধরে ফেলল ওকে। মুখটা চন্দনার বুকে। মুঠোয় চুল চেপে ধরে ওর মুখটা তুলে ধরেই শিউরে উঠল পল্লব। ঈপ্সিতা কঁকিয়ে উঠল, 'কী হলো, রজত—এ কী হলো তোর!'

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকল। তারপরেই দ্রুত বেরিয়ে যেতে ব্যস্ত হলো ইউনিয়নের দলটি।

পিনাকী এতোক্ষণ কিছু বলেনি। শুধু চোখ দুটো স্থির করে রেখেছিল স্পোর্টস্ সার্টের ওপর। ছেলেটি পালাবার চেষ্টা করতেই ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরল দু' হাতে। ওই অবস্থাতেই ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। এতোকাল চুল আঁচড়েছে, এক্সারসাইজ করেছে, ভিটামিন খেয়ে গেছে শুধু স্বাস্থ্য আর চেহারার জন্যে। পাত্তা পায়নি। কাঁধ ও হাতের পেশীগুলো ফুলে উঠতেই সে চিনতে পারল নিজেকে। রাগে অস্ফুট গলায় বলল, 'আমার নাম পিনাকী। তুমি যতো বড়ো লীডারই হও, আজ তোমার লাশ পড়ে থাকবে এখানে—'

লাথির চোটেই কাহিল হয়েছিল ছেলেটি। এখন গলায় পিনাকীর সাঁড়াশির মতো দশটা আঙুলের চাপে জিভটা বেরিয়ে এলো—মনে হলো চোখ দুটোও বেরিয়ে আসছে কোটর ছেড়ে।

'পিনাক, ছেড়ে দে! মরে যাবে!' পিনাকীর হাত দুটো ধরে ছাড়াবার চেষ্টা করল অসিত, 'রজতকে দ্যাখ। ছাড়, ছেড়ে দে! মরে যাচ্ছে—'

'মরুক, শালা! মরে যাক।' অপ্রকৃতিস্থ গলা পিনাকীর, 'আমরা কি কুত্তার বাচ্চা! শুধু মারই খেয়ে যাবো!'

খয়েরি পাঞ্জাবি এতোক্ষণ বিভ্রান্তভাবে ছুটোছুটি করছিল। পিনাকীকে সামলানো যাচ্ছে না দেখে থাপ্পড় মারল নিজেরই কপালে, তারপর হাত জোড়

করে বলতে লাগল, 'দাদা, ছেড়ে দিন, ক্ষমা চাইছি—আমরা ক্ষমা চাইছি—ওদিকে একজন সিরিয়াসলি ইনজিওরড—ওকে দেখুন—'

পিনাকী শুনল কি শুনল না বোঝা গেল না। চারিদিকে ভিড়, গোলমাল শুনে ছুটে এসেছে আরও অনেকে। স্থির চোখে স্পোর্টস্ সার্টের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল জল গড়াচ্ছে ছেলেটির চোখ দিয়ে, লালা বেরোতে শুরু করেছে ঠোঁটের কষ বেয়ে। হয়তো সত্যিই মরে যাবে এবার। হঠাৎই মনে হলো, মেরে কী লাভ! তখন হাত দুটো আলগা করে নিল। আর কোনো-দিকে না তাকিয়ে ছুটে গেল রজতের দিকে।

'মরে গেল নাকি রে!'

পল্লব কোত্থেকে জল নিয়ে এসেছিল। রজতের ঘাড়ে মাথায় ছিটোতে ছিটোতে বলল, 'সেন্স্ নেই মনে হচ্ছে। ব্লীড করছে। ফেটে গেছে মনে হয়—'

বিড়বিড় করে কী বলল পিনাকী বোঝা গেল না। তাকাল ঈপ্সিতার দিকে। রজতের একটা হাত মুঠোয় ধরে ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে আছে ঈপ্সিতা, যেন হাতের ঠিক ওই জায়গাটুকুতেই প্রাণ থাকে। হঠাৎই বুক ভরে গেল তার। বলল, 'কিছু হবে না—কিছু হবে না—'

এতোক্ষণের এতো ঘটনার মধ্যে চন্দনাই শুধু চুপ। সেই তখন থেকেই রজতের মুখটা ধরে রেখেছে বুকে। ঘামের মতো কুলকুল করে রক্ত নেমে যাচ্ছে বুকে। ব্লাউজটা ভিজে গেছে পুরো। যাক। এই অনুভূতিটা আলাদা—যেন এই অনুভূতিটার জন্যেই এতোকাল হ্যাংলার মতো প্রার্থনা করেছিল সে। চুপচাপ থেকে শরীরের সমস্ত উত্তাপ বুকের মধ্যে জড়ো করে রজতের শরীরে সঞ্চার করতে চাইল চন্দনা, চিবুক চেপে ধরল মাথায়। তিন-চার মিনিট হয়েছে কি হয়নি, তবু মনে হচ্ছে অনন্তকাল পেরিয়ে গেল। এ ভাবনার মানে হয় না কোনো, তবু, আজ টুপুর নেই বলে খুশিই হলো ও।

পুরো ভিড়টাই এখন ওদের ঘিরে। ওরই মধ্যে হঠাৎ ভিড় সরাতে শুরু করল খয়েরি পাঞ্জাবি। অসিত বলল, 'সর, সর। ডাক্তার এসেছেন। দেখতে দাও—'

৬

একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। যেভাবে কালো হয়ে এসেছিল আকাশ আর মেঘ ডাকছিল ঘন ঘন, মনে হচ্ছিল থামবে না সহজে। বড়ো বড়ো ফোঁটায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল চারিদিক। মিনিট পনেরো যেতে না যেতেই থেমে গেল। রোদও উঠল। এখন আকাশের দিকে তাকালে মনেই হবে না এতো জোর বৃষ্টি নেমেছিল! টুকরো টুকরো মেঘ এখনো ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে; কিন্তু, ওগুলো যে দুর্বল, ঝকঝকে নীলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না তা দেখলেই চেনা যায়। এখন বিকেল। পশ্চিমে গিয়েও সূর্য তার বাতিল হওয়া খেলাটা শুরু করতে চাইছে আবার।

বৃষ্টি হয়ে গরমটা গেছে। ঠাণ্ডা না হলেও খোলামেলা একটা হাওয়া বইছে, থেকে থেকেই ওড়াউড়ি করছে দাপটে। না হলে এখানকার গরম সত্যিই পচা। বিশেষত দুপুরবেলায়। বারান্দা, ব্যালকনিতে খসখস টাঙিয়ে যতোই জল স্প্রে করো আর ঘর অন্ধকার করে পাখা চালিয়ে দাও ফুল স্পীডে—তাপ কমবে না সহজে। এয়ার-কণ্ডিশনার থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু, শর্মিলাদের কোয়ার্টার্সে একটাই মেশিন, ওদের বেডরুমে লাগানো। গরম লাগবে ভেবে প্রথম দিন টুপুরকে জোর করে শুইয়ে দিয়েছিল ও-ঘরে, অশোক আর শর্মিলা উঠে গিয়েছিল গেস্টরুমে। এর আগে কখনো ঠাণ্ডা ঘরে শোয়নি টুপুর। রাত্রে আরামে ঠেসে ঘুমোলেও ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যাবার পর টের পেল নাক বুজে গেছে, গলার ভিতর কেমন একটা কাঁটাফোটা ভাব, ঢিসঢিস করছে শরীর। পরের দিনই ঘর বদল করে নিল। চলে এলো গেস্ট-রুমে। এক প্রান্তের এই ঘরটা পেয়ে ভালোই লাগছিল টুপুরের। একার জন্যে আলাদা একটা ঘর—দরজা বন্ধ করলেই নিজস্ব। সবচেয়ে লোভনীয় ওই ব্যালকনিটা। এসে দাঁড়ালেই নীচের বাগানটা চোখে পড়ে পুরোপুরি, তাছাড়াও একটা গোটা আকাশ আর অনেক দূর পর্যন্ত দুর্গাপুর, কারখানার চিমনি, রাস্তা, হালপ্যাটার্নের সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর গাছগাছালি। বিশেষত, আকাশে জিবছোঁয়ানো ওই লম্বা চিমনিটা—সকাল দুপুর রাত যখনই তাকাও সারাক্ষণ ম্যাজিসিয়ানের মতো লাল আগুন আর ধোঁয়া উগরে যাচ্ছে মুখ দিয়ে। ওটা রাবণের চিতা, প্রথম দিন ঠাট্টা করে বলেছিল অশোক। পরে অবশ্য বুঝতে পারে।

বৃষ্টির পর চুপচাপ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল টুপুর। যখন যেদিকে ইচ্ছে সরিয়ে সরিয়ে রাখছিল চোখদুটো, তবে নির্দিষ্ট কিছুই দেখছিল না। কোয়ার্টার্সের সামনে গেটের পাশে উঁচু দেবদারু গাছটা বৃষ্টির জলে ধুয়ে ভরে উঠেছে লাবণ্যে—রোদে ঝলমলে চুড়োটার সবুজে রুপোলী আভা, যতো নীচের দিকে গেছে ততোই পাতাগুলো ক্রমশ সবুজ হয়ে উঠেছে আরও। বাগানের গাছগুলো সুন্দর করে ছাঁটা, রঙ বেরঙের ফুলের টব ছড়িয়ে আছে নানাদিকে—সবই ডিজাইন করে সাজানো। বৃষ্টির ঝাপটায় লনের ওপর খসে পড়েছে দোপাটির পাপড়ি। এটা ফুলের সিজন নয়, তবু নিঃসঙ্গ একটা গোলাপ ফুটে আছে টবে; বিষণ্ণতা মাখানো তার দুধে-আলতা রঙ। লনের ডানদিকের কোণে একটা কাঠচাঁপার গাছ। ওদিকের ঘাস ঘন; কিংবা, ছায়া ছড়িয়েছে বলেই হয়তো ঘন লাগছে আরও। ভিজে ঘাসমাটির গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সবুজ একটা গন্ধ ভেসে আসছিল থেকে থেকে। অপরিচিত এই গন্ধটাই আরও অচেনা করে দিচ্ছিল সবকিছু। এই মুহূর্তের নির্জনতায় একটা রহস্য আছে—মন খারাপ করে দেয়, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেই কেমন যেন আস্তে আস্তে চেপে বসে বুকের ওপর।

রেলিংয়ে আলতো হাত রেখে, শরীরটা পিছনে ঠেলে, সামান্য ঝুঁকে বাগানের দিকে তাকিয়েছিল টুপুর—অন্যমনস্কতার মধ্যে একটার পর একটা এলোমেলো ভাবনা ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে, অথচ গুছিয়ে ভাবছে না কিছুই; হঠাৎ লনের ওপর চোখ পড়তেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভয়ে ছমছম করে উঠল সারা গা। একটা সাপ! লম্বায় প্রায় হাতখানেক কিংবা আরো বড়ো, কালো আর হলদেয় মেশানো ছিট-ছিট রঙ। কাঠচাঁপা গাছের তলা থেকে বেরিয়ে লনের ভিজে সবুজের ওপর দিয়ে এগিয়ে এলো অনেকটা, তারপর মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে গেল ওইখানে সাজানো ফুলের টবগুলোর আড়ালে—চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই বেরিয়ে এলো আবার। গোলাপের টবটার পাশে এসে ফণা তুলল। এখন দুলছে লেজে ভর দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে। জিব দেখাল; কালো পুঁতির মতো তার জ্বলজ্বলে চোখদুটো পরিষ্কার দেখতে পেল টুপুর—রোদ পিছলে যাচ্ছে গায়ের ওপর দিয়ে; মনে হলো ওইভাবে ফণা তুলে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। একটু পরেই আবার ফণা গুটিয়ে এঁকেবেঁকে এগোতে লাগল গেটের দিকে।

টুপুর সাপ চেনে না। কলকাতার বাড়িতে সাপ বেরোয়নি কখনো; জ্যান্ত সাপ দেখেছে চিড়িয়াখানায় আর রাস্তার ধারে সাপুড়ের খেলায়। ইউনিভার্সিটির লাগোয়া পুকুরের পাশে একবার মাথা থ্যাঁতলানো একটা মরা সাপ দেখে গা গুলিয়ে উঠেছিল শুধু। তবু, এই মুহূর্তে সাপটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো বিষাক্তই হবে। গোখরো কিংবা কেউটেও হতে পারে। ওইটুকু জীব, কিন্তু হিংস্র চেহারায় সূর্যের আলোটাকেও ম্লান করে দিচ্ছে যেন!

নীচের তলার ফ্যামিলিটা ছুটিতে গেছে, এখানে এসে পর্যন্ত দেখছে কোয়ার্টার্সের জানলা দরজা সব বন্ধ—লেটারবক্সটা গাদাগাদি হয়ে আছে চিঠিতে। গা ধুতে বাথরুমে ঢুকেছে শর্মিলা, বেরুলে টের পেত। ঘড়ি নামের যে-লোকটা শর্মিলাদের কাজকর্ম করে, বৃষ্টি থামবার পর পরই সে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেছে বাজারে। লনের পাশে লাল সুরকির প্যাসেজের ওপর এখনো লেগে আছে চাকার দাগ। আশেপাশে আর কেউ নেই কোথাও, চিৎকার করে ডাকলেও শুনতে পাবে না কেউ। সে দাঁড়িয়ে আছে দোতলায়, এখান পর্যন্ত সাপটার এগিয়ে আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তবু ভয়ে আর আশঙ্কায় হিম হয়ে এলো বুক। দেবদারু গাছের পাশ দিয়ে গেটের কাছাকাছি পেঁৗছে আর একবার মাথা তুলল সাপটা, তারপরেই গেটের তলা গলে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। ওদিকটায় পাঁচিলের আড়াল, আর দেখা যাচ্ছে না। তবু, আরও কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকল টুপুর। বিড়বিড় করে বলল, 'লতা—লতা—লতা—।' সাপ দেখা ভালো নয়; খুব ছোটবেলায় এই মন্ত্রটা শিখিয়ে দিয়েছিল মা।

বেতের গোল চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল টুপুর, নীচু রেলিংয়ে চিবুক পেতে রাখল। কোথাও কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে. সে বুঝতে পারছে না ঠিক। কাল রাত থেকেই একটা অস্বস্তি ছুঁয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। সাপটা এখনই দেখল; কিন্তু কাল রাতে দেখা স্বপ্নটার মানে কী! এখনো মনে পড়ছে, এই কোয়ার্টার্স, ওই দেবদারু গাছ আর কাঠের গেটটা হানা দিয়েছিল ঘুমে। ঈষৎ লম্বাটে, কালো একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে, তারের জাল দিয়ে ঘেরা তার ভিতরটা দেখা যায় না। চারিদিকে আর কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। হঠাৎই একটা রোগা মতন ছেলেকে নির্দয়ভাবে টেনে হিঁচড়ে ওই গাড়ির দিকে নিয়ে যেতে লাগল কয়েকটা ষণ্ডামার্কা লোক। তাদের গায়ে কালো পোশাক—জ্যোৎস্নার আলো সত্ত্বেও কোনো মুখই স্পষ্ট নয়। ছেলেটি চিৎকার করে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে উঠে বসল টুপুর। লোনা স্বাদে ভরে আছে মুখ, ঘামে জ্যাবজেবে হয়ে উঠেছে গলা—অন্ধকার ঘরে কাচের দরজার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে জ্যোৎস্না। একটা ট্রেন চলে যাচ্ছে দূরে, তার শব্দ। শব্দটা অনেকক্ষণ লেগে থাকল কানে। আস্তে উঠে ব্যালকনির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল টুপুর। বাইরে শব্দহীন নিশুতি। শুধু ওই উঁচু চিমনিটা আগুনের জিব বুলিয়ে যাচ্ছে আকাশে।

আবার বিছানায় ফিরে উত্তেজনাটা সইয়ে নিতে লাগল টুপুর। স্বপ্নটা চেনা; স্পষ্ট বুঝতে পারছিল কতো বছর আগেকার একটা দৃশ্য ওলটপালট হয়ে ফিরে এসেছে তার কাছে। কিন্তু কেন, ওই দৃশ্যটাই বা কেন!

অন্ধকার আবেগে বালিশে মুখ গুঁজে শরীরের কাঁপুনি টের পেল টুপুর। ঠিক কান্না নয়, তবে কান্নারই মতো। কেন এইভাবে হঠাৎ-হঠাৎ জাগিয়ে দিস

আমাকে! এতোদূরে চলে এসেছি, সেখানেও তুই! আসবিই যদি, এ-রকম বীভৎস হয়ে আসিস কেন! একটু ভালোভাবে সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো আসতে পারিস না! কোন ভয় তুই দেখাতে চাস আমাকে! আমি কি আড়াল দেবো তোকে, দিয়ে যাবো! আমাকেও তো চলে যেতে হবে একদিন না একদিন, নাকি তখনো এইভাবে জ্বালাবি আমাকে! কেন এই অসম্ভবের পিছনে সারাক্ষণ ছুটে বেড়ায় তোর চিৎকার? এইভাবে আর্ত, অনিচ্ছুক ঘুমের মধ্যে আবার ফিরে যেতে যেতে টুপুর ভেবেছিল, এ-সব কথা কোনোদিন বলা যাবে না রজতকে। যদি যেত, তাহলে অন্যরকম হতো জীবন। তাহলেও কি সে ছুটে আসত এখানে? এ কেমন টান, যা শুধুই ঘুরে ঘুরে বৃত্ত কেটে যায় চারপাশে, জড়ায় না কখনো? নাকি পুরনো অনুভূতি থেকে স্বাদ নিয়ে নিয়ে নিজেই জালটাকে বড়ো করেছে সে—যতো দিন যাচ্ছে ততোই জড়িয়ে পড়ছে তাতে; রজত এ-সবের কিছুই জানে না! জানলেই বা হতো কী? স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে কি ভালোবাসা হয়! যদি হয়ও, তারপর? ফুটো নৌকোয় কতোদিন পাল তুলে রাখা যায়! এতো জেনে বুঝেও তবু কেন যে মন কেমন করে! না, দরকার নেই এখানে—এই ভার নিয়ে এখানে থাকার মানে হয় না কোনো। সকালেই অনেকগুলো ট্রেন আছে, শর্মিলাকে বলবে তাকে তুলে দিতে, সে একাই ফিরে যেতে পারবে।

রাতের মনে রাত চলে গেল। কেমন ব্যাপার, দ্যাখো, কিছুই যদি ইচ্ছেমতো হয়! এতো ভেবেও এই বিকেলে আমি বসে আছি এখানে! আজ ফেরা হলো না, কাল হবে না—তার পরের দিনও নয়। আমার কি ইচ্ছে নেই, জোর নেই কোনো! তারও পরের দিন বুঝি কলকাতায় যাবে অশোক, সে যতোক্ষণ না নড়ছে ততোক্ষণ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে এখানে! ওই ট্রাঙ্ককলটাই মাটি করে দিল সব। কাল রাতে ওরা ঠিক করল পরেশনাথ বেড়াতে যাবে শনিবার, কেন যে রাজি হতে গেল তাতে! সন্দীপও বলেছিল বলে? হতে পারে। মা ভাববে, কথা ছিল দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরবে—চিঠি দিলে হয়তো পৌঁছুবে না সময়মতো। সেইজন্যে ট্রাঙ্ককল। তখনই কয়েকবার চেষ্টা করল অশোক, না পেয়ে সকালের জন্যে বুক করে রাখল লাইন। মাঝরাতে অমন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবার পর টুপুর ভেবেছিল, কাজ নেই পরেশনাথে গিয়ে—আজই সে ফিরবে কলকাতায়, যে করেই হোক। শর্মিলাকে বলবে, ট্রাঙ্ককলের দরকার নেই, এখানে ভালো লাগছে না আর—আমি ফিরে যাবো। হলো না। এমনিই শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল! ঘুম ভাঙল অশোকের দরজা ধাক্কায়—'তাড়াতাড়ি! তোমার মা—।' ছুটে গিয়ে দেখল যা বলার সবই শর্মিলা বলে ফেলেছে ততোক্ষণে; রিসিভারটা হাতে নিয়ে 'মা?' বলবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো চাঁপার, 'শুনেছি। দু'দিন পরেই এসো। ভালো আছো তো?' ঘুম-জড়ানো মাথায় সব ইচ্ছে জট পাকিয়ে

গেল কেমন, মরিয়া গলায় জিজ্ঞেস করল টুপুর, 'মা, কেউ খোঁজ করেছিল আমার?' বড্ড ডিসটারবেন্‌স্‌ লাইনে, শুধু নিজের গলাই শুনতে পেল সে—চাঁপা কী বলল বোঝা গেল না! ওদিক থেকে যান্ত্রিক গলায় অপারেটার বলে উঠল, 'সিক্স মিনাট্‌স্‌ ওভার।' তারপরেই কেটে গেল লাইন।

সূর্যটা বোধহয় ডুবতে শুরু করেছে, আলো মলিন হতে তাই মনে হলো টুপুরের। কলকাতার মতো নয়—সকাল, দুপুর, রাত সবই এখানে চেনা যায় আলাদা করে। আর, রাত মানেই রাত, ছোটবেলায় বইয়ে পড়া ছমছমে শব্দ-গুলো জোট বাঁধতে শুরু করে একসঙ্গে। তবু, অল্প ছায়াছড়ানো বিকেলের আলোর দিকে তাকিয়ে টুপুর ভাবল, রাতই ভালো—আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দিন পেরিয়ে যাবে সে। ছ'দিন হয়ে গেল, কাল ভোরে জেগে উঠলে পা দেবে সাতদিনে। আরও চব্বিশ ঘন্টা পরে আটদিন, তারপর—। খুব ভালো হতো যদি ওষুধ দিয়ে কেউ তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখত। দু' তিন-দিন—ঘুম ভাঙতেই নিজেকে আবিষ্কার করত কলকাতার ট্রেনে। এমন হবে জানলে একটা চিঠি দিতে পারত রজতকে। যা ছেলে, হয়তো গুরুত্বই দিত না কোনো! দেখা হলে বলত, স্ট্রেট প্রেমপত্তর ঝেড়ে দিলি! যাঃ, প্রেমপত্র হবে কেন! সে বড়ো লজ্জার! এমনিই চিঠি, ছোট্ট চিঠি, নীচে আরও ছোট্ট করে লেখা—টুপুর। কোনো মানে হতো না সে-চিঠির, তবু।

দুঃখের মধ্যে নাক ঘষে যায় সুখ। মনখারাপ ঢেউ তুলে যায় বুকে। শব্দ হয় না কোনো। একা পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে টুপুর। ঠিক বুঝতে পারে না, কেন সে শর্মিলার কথায় হুট করে চলে এসেছিল এখানে, কেন এক কথায় রাজি হয়ে গেল মা! কেন সে নিজেই ভেবে দেখল না, সত্যি সত্যিই এই যাওয়ার কোনো মানে হয় কিনা। সন্দীপের জন্যে? একদিনের একটু ভালো লাগাকে চিরদিনের মতো বাঁচিয়ে রাখার জন্যে? যদি তাই হয়, এ ক'দিনে তো অনেক বেড়ানো হলো একসঙ্গে, অনেক কথা—মাইথন যাবার রাস্তায় একই গাড়িতে পাশাপাশি বসে গিয়েছিল তারা, অন্য গাড়িতে শর্মিলা আর অশোক; তবুও কেন মনে হচ্ছে এই মেলামেশার কিছুই স্বাভাবিক নয়, এর সবকিছুর মধ্যেই কেমন একটা হ্যাংলামো জড়ানো! কেন মনে হচ্ছে সে শুধুই পেতে চাইছে—পাবার ইচ্ছেটা যতো তীব্র, দেবার জন্যে ব্যস্ত নয় ততো! তবে কি সন্দীপের সঙ্গে দেখা হবার পর নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনে মনে একটা ধারণা গড়ে তুলেছিল সে—সযত্নে হাত বুলিয়েছে সেই ধারণাটার গায়ে; বিয়েটা হতেই হবে এই ভেবে একটা স্বাচ্ছন্দ্য থেকে পা বাড়িয়েছিল আর একটা স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে? ওরা যে অ্যারেঞ্জড বলে, তা কি এই? তাহলে সন্দীপ কেন, কেন সে অপেক্ষা করতে পারবে না আরও কিছুদিন? হয়তো বহুদিন! যে-জীবনটা এখনো পড়ে আছে তার জন্যে, তা কি এতোই খারাপ? এ কেমন ভালো লাগা যা খুশি হয়ে ওঠে সান্নিধ্যে, অথচ আড়াল হলেই

একাকার হয়ে যায় যে-কোনো অনুভবের সঙ্গে? এ-সব জেনেও যদি মেনে নিই, তাহলে, দেখতে দেখতে আমিও কি হয়ে যাবো শর্মিলার মতো? কিংবা, তার চেয়ে একটু ভালো, বা একটু খারাপ? শর্মিলার মতো! আ-হা, কী জীবন!

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল টুপুর। দূর থেকে সাইকেলের ঘন্টি শুনে দেখল, ঘড়ি আসছে। মাঝবয়েসী মানুষটা। নিজের মনে কাজ করে যায় সারাক্ষণ, কাজ করতে করতেই গুনগুন করে, হাসে। কাছেই বেনাচিতি না কোথায় নিজের ঘরসংসার আছে তার। রাত্রে চলে যায়, ভোর না হতেই ফিরে আসে আবার। কখন যায়, কখন ফিরে আসে—এ ক'দিনে বুঝতে পারেনি টুপুর। সে তো সারক্ষণই দেখছে! মানুষটা ভালো, বোঝা যায় না সুখী না দুঃখী। বুঝতে দেয় না। বললে কি ঘড়িই পারবে না তাকে কলকাতার ট্রেনে তুলে দিতে!

এভাবে ভালো লাগে না। এতোক্ষণের চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা বুকের মধ্যে পাকিয়ে উঠতেই ঠোঁটে হাত চাপা দিল টুপুর, হাই তুলল। সকালে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি, ভাবল, এবার শর্মিলাকে বলবে, পরেশনাথ থাক। না হয় পরে আসা যাবে আবার। তুই যা ভাবছিস তা নয়—আমার আর এক মুহূর্তও ভালো লাগছে না এখানে। আমার ফেরার ব্যবস্থা কর।

গেট খুলে ভিতরে ঢুকল ঘড়ি। এক হাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল, অন্য হাতে একসঙ্গে অনেকগুলো মুরগী ঝোলানো। তাকে দেখে হাসল, হাত তুলে দেখাল পাখিগুলো।

'তন্দুরী বনে গা। আজ রাত কো পার্টি হ্যায় না যশবীর সিং সাবকো কোঠি মে—'

টুপুর হাসল। জানে। অশোকদের বন্ধু যশবীর, কাজ করে একসঙ্গে। পরশু এসেছিল বউ রেশমীকে নিয়ে, অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-চৈ করে গেল। হালে বাইরে গিয়েছিল সুইডেন না কোথায়—কী সব ফিল্ম্-টিল্ম্ নিয়ে এসেছে সঙ্গে, দেখাবে। রাতে ওর কোয়ার্টার্সেই ডীনার। রেশমী মেয়েটা সুন্দর; যেমন অ্যাট্রাকটিভ, তেমনি স্মার্ট। তাকেও যেতে বলেছে। টুপুর জানে, ওটা ভদ্রতা। না গেলেও কিছু নয়। ওরা যায় যাক। এতো হৈ-চৈ ভালো লাগে না—আজ তার একা থাকতেই ভালো লাগবে।

সাইকেলটা গায়ে ঠেসিয়ে রেখে মুরগীর মাথা গুনছে ঘড়ি। বোধহয় হিসেব মেলাতে পারছে না। লনের ওপর সাইকেল আর মানুষের কিম্ভূত ছায়া। একটু আগে দেখা সাপটার কথা মনে পড়ে গেল টুপুরের। উঠে দাঁড়াল।

'এই, ঘড়ি—', কাঠচাঁপার গাছটার দিকে আঙুল তুলে টুপুর বলল, 'উধর সাপ কিঁউ হ্যায়?'

'সাপ!' মুরগী গোনা ছেড়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়াল ঘাড়ি, আশেপাশে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হলো একটু, 'কিধর মেমসাব?'

'ওই গাছকে তলাসে বার হোকর লনসে চলা গিয়া—'

টুপুরের আঙুল লক্ষ্য করে গেট পর্যন্ত তাকিয়ে সায় দিয়ে মাথা নাড়ল ঘাড়ি। গুরুত্ব দিল না তেমন। বলল, 'সাপ তো জরুর হ্যায়—'

টুপুরের মনে হলো লোকটি তার ভাষা বুঝতে পারছে না। হয়তো এখনো আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে সাপটা, যে-কোনো সময়েই বেরিয়ে আসবে আবার। যাকে সামনে পাবে তাকেই ছোবল মারবে। যেন এখনো দেখতে পাচ্ছে তার কালো জ্বলজ্বলে চোখদুটো, ফণাটাও! অল্প কেঁপে উঠল টুপুর। লোকটা বুঝছে না কেন, ওর কি ভয়ডর নেই!

আর কিছু বলবার আগেই চলে যেতে যেতে একগাল হাসল ঘাড়ি। বলল, 'সাপ মুরগী নেহি খাতা—সাবলোগ খাতা—'

কোন কথার কী উত্তর! টুপুর হেসে ফেলল। আচ্ছা বোকা তো!

ঘরের মধ্যে থেকে শর্মিলা বলল, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস, টুপুর?'

দু' হাতে দু' কাপ চা, গায়ে আলগা করে জড়ানো শাড়ি। ব্লাউজ পরেনি এখনো। চায়ের গন্ধ ছাপিয়ে ভুরভুর করছে সাবানের সুগন্ধ। গা ধুতে এতোটা সময় লাগে না—দেরির কারণটা বোঝা গেল। চা তৈরি করছিল শর্মিলা।

ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে টুপুর বলল, 'আমি একটা সাপ দেখলাম!'

'সাপ! কোথায়!'

'ওই গাছটার তলা থেকে বেরিয়ে গেটের বাইরে চলে গেল। মনে হলো গোখরো—'

'গোখরো!' একবার কাঠচাঁপার গাছটার দিকে তাকিয়ে নিল শর্মিলা। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তুই সাপ চিনিস?'

'না।'

'তবে!' চায়ে চুমুক দিতে দিতে পুরো লনটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল শর্মিলা। কথাটা হাল্কাভাবে বললেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না যেন, খুঁজছে। পরে বলল, 'বর্ষায় শুনেছি হেলে সাপটাপ বেরোয়। আমি কখনো দেখিনি—'

'হেলে সাপের ফণা থাকে?'

'তাও তো জানি না। বোধহয় থাকে না—,' শর্মিলা বলল, 'ঘাড়িকে বললি? কী বলল?'

'ও আমার কথা বুঝতেই পারেনি—'

'কাল বলব তো!'

দু'চারজন করে মানুষ দেখা যাচ্ছে ক্রমশ। ক্রিং-ক্রিং বেজে উঠছে সাইকেলের

ঘন্টি। ক্বচিৎ মোটরের হর্ন। তার মানে ছুটির সময় হলো। এরপর আস্তে আস্তে লোকজন বাড়বে; কিছুক্ষণের ব্যস্ততা, শব্দ। অন্ধকার হলেই থেমে যাবে আবার। এখনই পড়ে এসেছে বেলা। টুপুর দেখল, আগুনের জিব থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আকাশে উড়ে যাচ্ছে ছোট বড়ো রাশি রাশি ফুলকি। এখনো সাদাটে ভাব যায়নি; অন্ধকার গাঢ় হলে পুরোপুরি লাল হয়ে যাবে রঙ। সেদিন মাইথন থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হয়েছিল—অনেক দূর থেকেই দেখেছিল টুপুর, নিরাকার আকাশে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আভা ছড়াচ্ছে আগুনটা। তারা আসছিল, চুপচাপ—শব্দ বলতে ওই গাড়িতেই যেটুকু। সন্দীপ বলল, 'রাতের অন্ধকারে সবই কেমন অন্যরকম লাগে না?' হয়তো লাগে, টুপুর ঠিক জানে না—হয়তো সমস্তই নির্ভর করে সবই-টা কী, তার ওপর। জবাব না দিয়ে সন্দীপের স্টীয়ারিং-ধরা হাতটার দিকে তাকাল ও। সেদিন পিকনিকে যাবার সময় একভাবে ভেবেছিল, আজ কিছুই ভাবল না। সময় সব ভাবনা যত্ন করে তুলে রাখে না। শুধু দেখল, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে রিস্টওয়াচের রেডিয়াম। সময়ই জেগে থাকে।

চা-টা তাড়াতাড়ি শেষ করল টুপুর। শর্মিলাও শেষ করেছে ইতিমধ্যে। দুটো কাপই তুলে নিয়ে ঘরে রেখে এসে আবার জায়গায় দাঁড়াল টুপুর। শর্মিলার চোখ চিমনিটার দিকে। আকাশ আরও একটু কালচে হলে আগুনটা লাল হবে আরও। সেটা অশোকের বাড়ি ফেরার সময়। কোন ভোরে বেরিয়ে যায়—দুপুরে খেতে আসে ঘন্টাখানেকের জন্যে, তারপর বেরিয়ে যায় আবার। এর ওপরেও যখন-তখন আছে; টেলিফোন এলেই হলো, ছোটো। একা-একা সারাদিন কী করে যে কাটায় শর্মিলা! কীরকম জীবন এদের! অশোক তো সন্ধ্যে হলে রোজই মদের গ্লাস তুলে নেয় হাতে! চেহারাটাও অন্যরকম হয়ে যায় তখন, মনে হয় নিজের ভিতরে ডুবে গিয়ে ভাবছে কিছু—এমন কিছু যার সঙ্গে সম্পর্কটা তারই একার। আর কেউ এসে পড়লে অবশ্য অন্য কথা। প্রায়ই আসে—কিংবা ওরাও যায়; সন্দীপ আছে; তারপর, সেদিন যেমন যশবীররা এসেছিল। হৈ-চৈ জমে ওঠে। তখন শর্মিলাও গ্লাস তুলে নেয় হাতে। ভাবা যায়! জোরজার করায় সেদিন সেও অবশ্য একটু ব্র্যান্ডি চেখে দেখেছিল; 'ব্র্যান্ডি রুগীরাও খায়—', সন্দীপ বলল, 'ওতে দোষ নেই।' টুপুর জানে, শেখরও খায় মাঝে মাঝে—বলে তো ব্র্যান্ডি! কান আর পায়ের চেটো গরম-গরম লাগতেই এক চুমুকে তলানিটুকু শেষ করে সরিয়ে রেখেছিল গ্লাসটা। যশবীর বলল, 'কাম, হ্যাভ অ্যানাদার।' সে গা করেনি।

'কিছু ঠিক করলি?'

'কী?'

শর্মিলা তাকাল: এমনভাবে—যেন এরই মধ্যে উত্তরটা আশা করেছিল। একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'জানিসই তো সন্দীপদা বাইরে যাবে। তার

আগেই—মাসীমাকেও একটা কিছু বলতে হবে তো!'

'যা বলার আমিই বলব।' আড়াল না রেখে বলল টুপুর, 'তুই এতো ব্যস্ত হচ্ছিস কেন!'

শর্মিলা কী বুঝল কে জানে, চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'সন্দীপদাকে তোর ভালো লাগেনি?'

'ভালো লাগবে না কেন!' টুপুর হাসল, 'আমার কাউকেই খারাপ লাগে না—'

'তাই বুঝি!' একটু বা অবাক শর্মিলা, কথাটা রহস্য না সত্যি বুঝবার চেষ্টা করল—একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লনের দিকে। ভাবতে ভাবতেই বলল, 'বিয়েটা যার যার ভাগ্যে। তোর ভাগ্য ভালো, তাই এমন একটা সম্বন্ধ এসে গেল। ফেলে দিলে ঠকবি—'

'আমি এখন ওসব ভাবছিই না—।' কথা বলতে ভালো লাগছিল না টুপুরের। তবু, শর্মিলা সিরিয়াস দেখে হাল্‌কা করার চেষ্টা করল, 'তোর সন্দীপদার কুষ্ঠিটা দেখিস তো, সেখানে আমিই আছি কিনা—'

'কুষ্ঠি দেখে বিয়ের দিন চলে গেছে।' পরের কথাটা আগেই ভেবে নিল শর্মিলা। বলল, 'সকাল থেকেই মনমরা দেখছি তোকে! কী হয়েছে বল তো!'

'কবে বাড়ি ফিরব ভাবছি—'

'বাড়ি! এই ট্রাঙ্ককল করলি সকালে—পরেশনাথ যাবার প্রোগ্রাম হলো—!' টুপুরের কাছে ঘেঁষে এলো শর্মিলা, কী ভেবে হাত ছোঁয়ালো কপালে, 'ব্র্যান্ডি খাবি একটু? চাঙ্গা লাগবে।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না টুপুর। দেখল, ঘড়ি এসে দাঁড়িয়েছে নীচে। হাতে রক্তমাখানো ছুরি। ওপরে তাকিয়ে শর্মিলাকে বলল, 'তিশ পিস্‌ নিকালা, মেমসাব—'

'ঠিক হ্যায়। বানাও—।' গায়ের কাপড়টা ঠিকঠাক করে নিল শর্মিলা। ঘড়ি চলে যেতে বলল, 'লোকটা কাজের—'

'তোরা মদ খাস কেন?'

'মদ! কী গাঁইয়া কথা রে বাবা! ড্রিঙ্কস্‌ বল—!'

'ওই হলো।'

'এখানে সবাই খায়।' শর্মিলা বলল, 'লোকগুলোর খাটুনি এতো—রোজগার করতে করতে জিব বেরিয়ে যায়। রিল্যাক্সড হবার জন্যেও তো একটা কিছু দরকার—'

হয়তো। চুপ করে থাকল টুপুর। এরই মধ্যে বদলে গেছে ঘাস ও সুরকির রঙ; পশ্চিম দিকের আকাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে কমলা আভা। কাঠচাঁপার গাছটা ঝুঁকে গেছে আরও, ঘন ছায়ার জন্যেই সম্ভবত, পাশের

দেয়াল বা নীচের মাটি আলাদা করে চেনা যায় না। সাপটাকে যখন দেখেছিল তখন রোদ ছিল, আর একটু পরেই অন্ধকার হবে—যদি আবার ফিরে আসে দেখা যাবে না। ভেবে কেমন যেন গা সিরসির করে উঠল টুপুরের। এক যদি রেডিয়ামের মতো জ্বলজ্বল করে চোখদুটো!

'ওই রজতটার সঙ্গে মিশেই তুই এমন হয়ে গেছিস! এর চেয়ে যদি পল্লবের সঙ্গে মিশতিস—বেশ স্মার্ট—'

শর্মিলা অন্যমনস্ক; নিজেকেই শোনাল যেন। প্রসঙ্গটা ধরতে পারল না টুপুর। রাগও হলো।

'ওদের টানছিস কেন!'

'এমনিই।' নিজেকে আড়াল করে গেল শর্মিলা। হেসে বলল, 'আসলে কি জানিস, বিয়ের আগে ছেলেদের একরকম লাগে, বিয়ের পরে আর একরকম!'

'কী করে বুঝব! বিয়ে তো হয়নি—'

'হবে, হবে। হলে বুঝবে আমার পছন্দটি কেমন!' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে টুপুরের গাল টিপে ধরল শর্মিলা, নাক ঘষে দিল ঘাড়ে। বলল, 'তখন দেখবি বিয়েটাও মন্দ—'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল টুপুর।

'হঠাৎ এতো খুশি হয়ে উঠলি!'

'বলব কেন!' শর্মিলা রহস্য করল। তারপর ব্যস্তভাবে বলল, 'বাথরুমে যাবি তো যা, এইবেলা তৈরি হয়ে নে। অশোক এলেই কিন্তু আমরা বেরুব—'

'আমি যাচ্ছি না—'

'কেন!'

'এমনিই। ভালো লাগছে না।' টুপুর বলল, 'তোরা ঘুরে আয়। আমি বাড়িতেই থাকব।'

'এই একা বাড়িতে!'

'একা কেন? ঘড়ি থাকবে তো!'

'ওকে আজ একটু ছুটি দেবো ভাবছি। কোথায় যাত্রাপার্টি এসেছে—দেখে আসুক।'

'তাহলে একাই থাকব—'

'একা বাড়িতে তোমাকে রেখে যাবো আমি?'

'কী হয়েছে, কলকাতায় কতোদিন একা থাকি—'

'এটা কলকাতা নয়।' শর্মিলা বলল, গলায় শাসন মেশানো, 'আমার কথাও তো শুনবি একটু! আমি বলেছি নিয়ে যাবো তোকে। সবাই যাচ্ছে; না গেলে ভাববেই বা কী!'

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে টুপুর বলল, 'ভালো না লাগলে কী করব!'

'গিয়ে দ্যাখ তো, গেলেই ভালো লাগবে।' সোজাসুজি তাকিয়ে বলল শর্মিলা, 'ভালো না লাগলে ফিরে আসিস আমার সঙ্গে—'

কথাটা শেষ হবার আগেই দূরে গাড়ির হর্ন শুনল ওরা। চেনা আওয়াজ। অশোক ফিরছে। গাড়িটাকে কোয়ার্টার্সের কাছাকাছি আরও খানিকটা এগিয়ে আসতে দিল শর্মিলা। তারপর ভিতরে যেতে যেতে বলল, 'তৈরি হয়ে নে—'

এই এক অসুবিধে তার, টুপুর ভাবল, তেমন করে জোর খাটাতে পারে না কোথাও। সাত-পাঁচ এতো যে ভাবে, তবু কোনো ভাবনাটাকেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে না শেষ পর্যন্ত। মন খাড়া করে যে ধরে থাকবে একটা কিছুকে, তা আর হয় না। মনটা খারাপ হয়ে যায় আরও। মনে হয় এতোটুকু প্রতিরোধ নেই তার—নেই নিজস্ব কোনো দুর্গ, ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারে যার আড়ালে। একটু আগেই রজতকে নিয়ে একটা খোঁচা দিল শর্মিলা। মিলের ব্যাপারই যদি হয়, রজত তো তার একেবারে উল্টো! নিজে যেটা বুঝবে, যেটা গোঁ ধরবে, তার বাইরে কেউ তাকে নড়াক দেখি একচুলও! অথচ, সে? পারত না কি শর্মিলাকে বলতে, কে কী ভাবল আমার যায় আসে না কিছু; এই যে মন—এটা আমার, আমারই, এর মান-অভিমান-ইচ্ছা-অনিচ্ছা তোর ওই যশবীরের পার্টিতে যাওয়ার চেয়ে কিছু কম বড়ো নয়! অন্তত আজ, এই মুহূর্তে, এই মনটাকে আমি চিনতে পারছি আগের চেয়ে অনেক ভালো করে। তোরা তোদের আনন্দ নিয়ে থাক—একে নিয়েই একা-একা দিব্যি সময় কেটে যাবে আমার। আমি যাবো না।

না, আমার কিছু হবে না। আমি শুধুই ভেবে যাবো। মনজোড়া কথা নিয়ে আজ বাদে কাল ফিরে যাবো কলকাতায়; কাউকে কি বলতে পারব কিছু?

চাপা অভিমান নিয়ে এরপর অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল টুপুর। যেন সে শুধুই ভেবে যাচ্ছে, তার হয়ে তাকে গুছিয়ে দিচ্ছে আর কেউ। সে-ই বলল, জলজরি পাড়ের ওই কালো শাড়িটা পরো, টুপুর, তোমাকে মানাবে। কপালের ঠিক মাঝখানে ছোট্ট করে টিপ এঁকে নাও একটা; ঠোঁটে হালকা ন্যাচারাল কালার। কেউ বলবে না মন খারাপ বলেও তুমি সেজে এসেছ। তবে, এই সাধারণ সাজেও তুমি সুন্দর। কপালের ডান দিকে চিরুণিটা বুলিয়ে নাও তো, ব্যাস। ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ বেরিয়ে আছে—ব্লাউজের হাতাটা গলার কাছে টেনে নাও অল্প। আর কিছু নয়। নিজেকে স্বাভাবিক করো। আজ যাও। শর্মিলাকে যা বলেছ তাতেই তার বুঝতে পারা উচিত তোমার কাছে ফিরে যাওয়াটাই এখন সবচেয়ে জরুরী। তুমি না চাইলে কে আটকাবে তোমাকে! যেন একটা কলের পুতুল—বুকের ওপর হাত রাখল টুপুর, মার শেখানো, কোথাও যাবার আগে যেমন করে। তারপর এগিয়ে গেল।

অশোক দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির সামনে। দেখেই বলল, 'বাঃ

লজ্জিতভাবে বলল টুপুর, 'খারাপ লাগছে?'

'ডিভাস্টেটিং! বলব?' চোখ বুজে ভাববার ভান করল অশোক, 'দ্য নাইট হারসেলফ্ হ্যাজ কাম ডাউন উইথ অল হার বিউটি!'

শর্মিলা পিছনেই উঠছিল, টুপুরকে দেখতে দেখতে মন বদলালো। সামনের দরজা খুলে অশোকের পাশে বসতে বসতে বলল, 'শিফনটা পরলি না কেন! মানাতো!'

'যেটা সামনে পেলাম, পরলাম।' সীটের পিছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকাল টুপুর। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ভেবে পারিনি—'

'টুপুর তো যেতেই চাইছিল না—! সাধতে হলো।'

'কেন?'

প্রশ্নটা তাকেই। তবু চুপ করে থাকল টুপুর।

পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে পলকের জন্যে তাকে দেখে নিল অশোক।

'তোমারই তো যাওয়া দরকার। না গেলে একটা এক্সপিরিয়েন্স মিস করতে—'

টুপুর শুনল। আধখানা মন দিয়ে জবাব দেওয়া যায় না সব কথার। দরকারই বা কী! বরং সে চুপ করে থাকবে, এইভাবে, ওই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। ভাবতে ভাবতে চোখ বন্ধ করল টুপুর। ক্লান্তি। সবচেয়ে ভালো হতো যদি ঘুমোতে পারত।

পাঁচ মিনিটও নয় বোধহয়। ওরা পেঁছে গেল। দরজা খুলেই তাকে দেখে হাত ধরে টেনে নিল রেশমী।

'আমরা ভীষণ খুশি—'

এরই মধ্যে এসে পড়েছে অনেকে। সকলের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে শর্মিলা জিজ্ঞেস করল, 'সন্দীপদা আসেনি?'

'এসে যাবে—।' যশবীর বলল, 'হি র‍্যাং আপ। একটু আটকে পড়েছে; বাট হি উইল কাম।'

'ব্যস্ত হবার কি আছে!' শর্মিলার দিকে তাকিয়ে অশোক বলল, 'ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও টুপুরের—'

'আয়।' শর্মিলা বলল, 'ইনি মিস্টার রেড্ডী, আনম্যারেড। অলোক দত্ত। খেয়ালী—মানে মিসেস দত্ত। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস প্যাটেল—।' পরিচয় শেষ করে হাসল শর্মিলা, 'আর একজন আসবে। তাকে তুই আগেই চিনিস!'

ভালো লাগে না বার বার একই ধরনের কথা। বিকেলে অতো কথার পরও কেন যে জের টেনে চলেছে শর্মিলা বোঝা যায় না। নিজেকে গুটিয়ে নিল টুপুর। হাতে হাতে গ্লাস দেখে মনে হচ্ছে এরা আগেই এসেছে। সবাই খায়, কথাটা ভুল বলেনি শর্মিলা। মেয়েরাও? অশোকের হাতে গ্লাস তুলে দিল যশবীর। এক দিকে উঁচু টেবিলের ওপর আর একটা টুল চাপানো, তার ওপর প্রোজেকটার। সোফা ও চেয়ারগুলো যেভাবে সাজানো তাতে মনে হয় সামনের

দেয়ালটাকেই পর্দা করবে। শেখরের বিয়ের পর বিয়ের ছবিগুলো এইভাবে দেখানো হয়েছিল তাদের বসার ঘরে। এখানে কোন ছবি? গ্লাস হাতে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রেড্ডী—একটু বা ঝিমুনো, তবু পলক পড়ছে না চোখের। চোখ ফিরিয়ে নিল টুপুর। রেশমী ছুটে এসে বলল, 'হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ টুপুর? কী দেবো?'

এরা স্বামী-স্ত্রী বাংলাটা ভালোই বলে। টানটা যদিও অন্যরকম। টুপুর বলল, 'কিছু না—'

'কিছু না কেন? ইউ মাস্ট হ্যাভ সামথিং!'

টুপুর শর্মিলার দিকে তাকাল, কিছুটা অসহায়। ততোক্ষণে রেশমী ওকে বসার ঘরের সংলগ্ন গ্রীল-দেওয়া জায়গাটায় নিয়ে এসেছে, ওখানেও কতক-গুলো রঙীন, গদি-আঁটা চেয়ার। গ্লাস হাতে খেয়ালীও এসে পড়ল। শর্মিলা বলল, 'ব্র্যান্ডি খা না! আগেও তো খেয়েছিস?'

'আমি বরং কোল্ড্ ড্রিংক্স্ কিছু খাই—'

'এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন ভাই!' খেয়ালী নিজের গ্লাসটা তুলে দেখাল 'রেশমী, গিভ হার ব্র্যান্ডি!'

শর্মিলা বলল, 'আমি কিন্তু হুইস্কি—'

রেশমীর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে একটুক্ষণ নাকের কাছে ধরে রাখল টুপুর। আমি বদলে যাচ্ছি না তো? ভাবল, খাবো? তারপর একসঙ্গে অনেকটা গিলে ফেলে গলা ও বুকের অতর্কিত জ্বালায় চোখ বন্ধ করল, আবার খুলল—যেন একটা খেলা; ঈষৎ হেসে গ্লাসে চুমুক দিল আবার।

'অতো তাড়াতাড়ি খাস না!' শর্মিলা বলল, 'মাথায় চড়ে যাবে—'

'কিচ্ছু হবে না।' রেশমী বলল, 'টেক ইট ইজি। ফীল হোম্লি। এখানে কোনো অসুবিধা নেই—'

হাত ধরে একটা চেয়ারে ওকে বসিয়ে দিল রেশমী। খেয়ালীও বসল। টুপুর দেখল, মিসেস প্যাটেলও এসে দাঁড়িয়েছে। শাড়ি পরার ধরনটা আলাদা। একটু লক্ষ করে বুঝল, বাচ্চা হবে। এখনই বোঝা যায়।

'তুমিই বলছি—,' খালি গ্লাসটা রেশমীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে খেয়ালী বলল, 'খুব চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি বলো তো তোমাকে?'

প্রশ্নটা শুনেও শুনল না টুপুর। ওর শাড়ির আঁচলটা হাতে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কী দেখছে মিসেস প্যাটেল। রেশমী পাশের ঘরে—ও-ঘর থেকে হঠাৎ ভেসে এলো উঁচু গলার হাসি। টুপুর একটা জ্বালা অনুভব করল, আলতো হাত তুলে ছুঁয়ে দেখল বাঁ কানের লতিটা। হাতের আঙুল না কানের লতি—কোনখানে উত্তাপ বেশি? মাঝে মাঝে এইভাবে নিজেকে আদর করতে ভালো লাগে, ইচ্ছে করে ভুলে যেতে সবকিছু—একটু আগেই গাড়িতে আসতে আসতে যেমন ঘুমের কথা ভেবেছিল। আঙুলদুটো লতি থেকে আলাদা

করল না টুপুর। ওইভাবেই চুমুক দিল গ্লাসে। খেয়ালী তখনো তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'কোথায় ?'

'ভাবছি, মনে পড়ছে না—'

শর্মিলা বলল, 'সাউথ ক্যালকাটার মেয়ে। রাস্তা-ঘাটেই দেখেছ হয়তো—'

'না।' অল্প ঘোর-লাগা চোখ খেয়ালীর, 'গঙ্গার ধারে ওই রেস্তোরাঁটা —কী যেন নাম—!'

'সেখানে আবার কবে গেলি, টুপুর ?'

উত্তর না দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথাটা হেলিয়ে রাখল টুপুর। একটা নয়, যেন একসঙ্গে দুটো মাথার ভার তার কাঁধের ওপর। চোখের পাশ দিয়ে দেখল গ্লাস শেষ করে আর একটার জন্যে নিজেই টেবিলের ওপর রাখা গ্লাস আর বোতলগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শর্মিলা। দেখাদেখি ও-ও শেষ করল। দেখল, সে আর রজত আগে পরে হয়ে উঠছে সিঁড়ি দিয়ে। উঠছে, না নামছে ? মাথাটা দু'পাশে একটু দুলিয়ে নিল টুপুর। মনে মনে বলল, ঠিক করিনি। ওর হাত থেকে গ্লাসটা সরিয়ে নিল খেয়ালী। রজত, কাল—কাল—অবশ্যই কাল; তার আগে পর্যন্ত একটু একলা থাকতে দে আমাকে! এইভাবে, কানের লতি থেকে ভারী হাতটা কোলের ওপর নামিয়ে আনল টুপুর। সামনে রেশমী—ওর দিকে বাড়িয়ে ধরেছে হাতটা।

'না। আর না—'

'হ্যাভ ইট! আমরা সকলেই খাচ্ছি—'

'নো। প্লীজ!'

'কাম—।' জোর করে ওর হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিল রেশমী, শব্দ করে চুমু খেল কপালে, 'ইউ আর সো সুইট! আই ফীল লাইক মেকিং ইট!'

সকলেই হেসে উঠল একসঙ্গে। মিসেস প্যাটেল হাততালি দিয়ে বলল, দ্যাট্স্ ইট! মেক ইট—'

শব্দগুলো উল্টোপাল্টা হয়ে ঢুকতে লাগল কানে। কথা হারিয়ে যাচ্ছে, কিংবা তার মানে বোঝা যাচ্ছে না কোনো। ভারী মজার অবস্থা তো! নিজের মনেই হাসতে হাসতে গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিল টুপুর। অস্পষ্টভাবে ভাবল, কী আছে! ব্র্যান্ডি রুগীরাও খায়। কে বলেছিল? কে বলেছিল যেন! ভাবনাটা ধরে রাখতে পারল না।

শব্দ মিশে যাচ্ছে শব্দে। হাসি হাসিতে। আলো অন্ধকারে। অন্ধকারটাই গড়িয়ে যায়—আশেপাশের সমস্ত জায়গা অন্ধকারে মিশে ছোট হতে হতে ঢুকে পড়ে মাথার মধ্যে। একা লাগে। একা।

ঠিক কতোক্ষণ পরে জানে না, উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথাটা টলে গেল টুপুরের। প্রাণপণে সামলে নিয়ে দু' পায়ের ওপর নিজেকে দাঁড় করাল কোনোরকমে। তারপর হাঁটতে লাগল।

'এই, টুপুর! কী হয়েছে!'

শর্মিলার গলা। চেপে ধরেছে হাতটা। টুপুর বলল, 'আমি বাড়ি যাবো—'

'বাড়ি কেন!' ওকে বসাবার চেষ্টা করল শর্মিলা, 'তখনই বলেছিলাম ওভাবে খাস না!'

'মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে—', মুখে হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ করল টুপুর, 'গা গুলোচ্ছে। বাড়ি যাবো।'

'বমি করবি?'

'না। বাড়ি—কেন কথা বলছিস এতো!'

টুপুর এগোবার চেষ্টা করল। তাড়াতাড়ি ধরে, অশোককে ডাকল শর্মিলা।

'ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে—।' ব্যস্ত হাতে ব্যাগ খুলে বাড়ির চাবিটা অশোকের হাতে তুলে দিল শর্মিলা, 'নভিসদের নিয়ে যা হয়! আমি ওকে ধরছি, তুমি আমাদের পৌঁছে দাও—'

অশোক দু'জনকেই দেখল। তারপর বলল, 'এখানেই শুইয়ে দাও না—। কী টুপুর, শরীর খারাপ লাগছে?'

বরফজলের বাকেটে হাত ডুবিয়ে তাড়াতাড়ি টুপুরের কপালে বুলিয়ে দিল রেশমী। কয়েকবার। হাতটা নিয়ে গেল ঘাড়ে। টুপুর হাসল। বলল, 'না, না—। আমার কিছু হয়নি।'

'দ্যাট্‌স্ লাইক এ গুড গার্ল!' চাবিটা পকেটে রাখতে রাখতে অশোক বলল, 'খারাপ লাগলে বোলো। পৌঁছে দেব—'

যশবীর এতোক্ষণ বিব্রতভাবে লক্ষ করছিল ওদের। টুপুরকে কিছুটা স্বাভাবিক দেখে বলল, 'নো মোর ড্রিঙ্ক্‌স্ ফর হার। লেট্‌স্ স্টার্ট দ্য ফিল্‌ম্‌স্—'

'গুড আইডিয়া!' টুপুরের হাত ধরে টান দিল খেয়ালী। টলছে। বলল 'শুধু চোখদুটোই খুলে রেখো ভাই, আর কিছু—'

শর্মিলা একটা নতুন গ্লাস তুলে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, 'ডোন্ট বি সিলি! আয়, টুপুর, আমার সঙ্গে আয়—। সন্দীপদাটা যে কী, এখনো এলো না!'

ওরা বসবার সঙ্গে সঙ্গেই আলো নিবে গেল। শর্মিলার পাশে বসে টুপুরের মনে হলো ঠান্ডা জলের আরাম কাটিয়ে আবার ভারী হয়ে উঠছে মাথা—ঘোরটা উঠে আসছে দ্রুত। ঠিক একটু আগে যেমন হয়েছিল। অল্প এলিয়ে বসল ও। লক্ষ করে ওর হাতে চাপ দিল শর্মিলা, 'সোজা হয়ে বোস। নাম্বার কাউন্ট কর, ঠিক হয়ে যাবে—'

শর্মিলার ওদিকে অশোক। বলল, 'আবার কী হলো?'

'কিছু নয়।' গ্লাসে চুমুক দিল শর্মিলা। টুপুরকে বলল, 'বেশি শরীর খারাপ লাগলে বলবি—'

'ক্লোজ ইওর আইজ, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন—,' প্রোজেকটারের পিছন থেকে যশবীর বলল, 'উই আর কামিং টু এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড নাও। দ্য ওয়ার্ল্ড অফ লাভ! নাউ, প্লীজ ওপেন—'

পর্দায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে কয়েক জোড়া যুবক-যুবতী। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই তারা পরস্পরের দিকে ঘুরে উলঙ্গ করতে শুরু করল নিজেদের। তারপর—

চোখ বন্ধ করল টুপুর। আবার খুলল। মনে হচ্ছে শরীর জুড়ে মাথা ছাড়া আর কিছু নেই; মাথাটাও কেউ চেপে বসিয়ে দিচ্ছে ঘাড়ের ওপর। আর একটু পরেই অন্ধকার হবে। হঠাৎ উঠে-আসা একটা বমির ভাব চাপা দিল টুপুর। মনে হচ্ছে ক্রমশ তলিয়ে যাবে একটা গভীর গর্তের মধ্যে—তারপর আর উঠতে পারবে না। নিজেতে ফেরবার চেষ্টায় ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে ও বলল, 'ছি, এ-সব কী! এই দেখাতে এনেছিলি!'

'ন্যাকা!' চাপা বিরক্তির গলায় বলল শর্মিলা, 'ঘ্যান ঘ্যান করিস না—'

পর্দা জুড়ে রঙীন মাংসের চিৎকার। অন্ধকারে চোখ সরিয়ে নিতে গিয়ে টুপুরের মনে হলো, পাশের সোফায় বসে খেয়ালীর বুকে মুখ ঘষছে দত্ত। খেয়ালীই তো? দত্ত তো? অমন করছে কেন লোকটা! প্রশ্নগুলো দানা বাঁধবার আগেই হারিয়ে গেল। ও চোখ বন্ধ করল এবং ঘোরের মধ্যেই শরীর জুড়ে একটা ঠান্ডা ভয় অনুভব করতে করতে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি—'

'আঃ! ইম্‌পসিব্‌ল্‌!' শর্মিলা অশোককে বলল, 'দাও, ওকে বাড়ি পৌঁছে দাও—'

টুপুর ওঠার ভঙ্গি করতেই শর্মিলা ওর হাত ধরে টানল। ঘর জুড়ে স্তব্ধতা। মাংসের চিৎকারে মনে হচ্ছে দেয়ালটাই ফেটে পড়বে এবার। কিংবা পর্দাটা। দৃশ্যটা এড়িয়ে গেল অশোক। একবার ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যাবে না?'

'না—'

'ও একা থাকতে পারবে?'

'পারবে, পারবে।' পর্দায় চোখ রেখে অদ্ভুত গলায় বলল শর্মিলা, 'ল্যাচ টেনে দিলেই হবে। তুমি ফিরে এসে আমাকে নিয়ে যাও—'

বলতে বলতে গলা জড়িয়ে এলো শর্মিলার, হঠাৎ কপাল চেপে ধরল অশোকের কাঁধে।

'বিহেভ ইওরসেল্‌ফ্‌!' আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অশোক, 'আমি আসছি—'

টুপুর উঠে দাঁড়িয়েছে ততোক্ষণে। অশোক ওর কব্জি চেপে ধরল; তারপর প্রায় টেনেই এগিয়ে নিয়ে গেল অনেকটা। সামনে দিয়ে যাবার সময় মিসেস প্যাটেল বলল, 'ইউ শুডন্‌ট্‌ হ্যাভ ব্রট হার হিয়ার।'

'টেক ইট ইজি—'

একইভাবে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল অশোক। রেশমী ছুটে এলো। থমথমে মুখ। খসে পড়া আঁচলটা ঠিকমতো গুছোতে পারছে না টুপুর, হাত রাখছে এলোমেলো। আঁচলটা গুছিয়ে দিয়ে পিঠে হাত রাখল টুপুরের।

'পুওর গার্ল! আমার এতো খারাপ লাগছে!'

অশোক হাসল। টুপুরের মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। হাতে অল্প ঝাঁকুনি দিতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'পারবে যেতে?'

মাথা নাড়ল টুপুর। নিজেই চেষ্টা করল এগোতে।

'নেভার মাইন্ড। ইট্‌স্ ও-কে। আমি ফিরে আসছি—'

সুবিধে এইটুকু, জায়গাটা সমতল। দোতলা হলে নামাতে অসুবিধে হতো, অশোক ভাবল, যেভাবে দ্রুত নিজেকে হারিয়ে ফেলছে মেয়েটি তাতে এই মাথা-নাড়া ভাবটুকুও কতোক্ষণ থাকবে বলা যায় না—দোতলায় তুলতে অসুবিধে হবে। গেট পেরিয়ে গাড়ি পর্যন্ত এসে অল্প দ্বিধায় পড়ল সে, তখন কী করবে! টুপুরের একটা হাত তখন থেকেই ধরে রেখেছে শক্ত করে। তাপটা হুইস্কির কিংবা পেরিয়ে আসা দৃশ্যগুলোর নাকি এই মেয়েটিরই শরীরের, বুঝতে পারল না। শুধু অনুভব করল গরম হয়ে উঠেছে মুঠোটা। একটু দাঁড়িয়ে হাতে ঝাঁকুনি দিল অশোক, 'টুপুর, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? আমরা গাড়িতে উঠছি—'

জবাব না দিলেও কথাটা যে শুনেছে বোঝা গেল টুপুরের টান হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে। মাথাটা আবার ঝুঁকিয়ে ফেলবার আগেই চটপট হাতে দরজা খুলে ওকে ভিতরে ঠেলে দিল অশোক। না, এখনো বেহুঁস হয়নি একেবারে; হলে কাৎ হয়ে পড়তে পড়তেও সামলে নিত না। এই হুঁসটুকু থাকতে থাকতেই পেঁছুনো ভালো। তাড়াতাড়ি উঠে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল অশোক; বাড়ির চাবিটা ঠিকঠাক পকেটে আছে কিনা দেখে নিল। লোকটাও দিন বুঝে যাত্রা দেখতে বেরিয়েছে! না গেলে, যতোই খারাপ দেখাক, মদত দিতে পারত কিছুটা। ইতিমধ্যে ফিরে এলে ভালো। যদি না ফিরে থাকে, এবং এইভাবে পাশ-আউট করে মেয়েটি, তাহলে হয়তো পাঁজাকোলা করেই তুলতে হবে ওপরে। কিছুটা বিরক্ত, কিছুটা উত্তেজিতভাবে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল অশোক।

সীটের মাথায় একটা হাত আড়াআড়ি পাতা। মাথাটা রেখেছে তার ওপর। গাড়ির দুলুনিতেই সম্ভবত সাড় পেয়ে সোজা হয়ে বসল টুপুর।

'শর্মিলা কোথায়!'

'সে তো বসে রইল ওখানে। তুমিও থেকে গেলে পারতে—'

বলতে বলতে থেমে গেল অশোক; দেখল, মাথাটা আবার টলে আসছে

টুপুরের। তারই কাঁধের দিকে। সরিয়ে দিতে গিয়েও কী ভেবে নিরস্ত হলো ও। থাক। কালো শাড়ি ব্লাউজে মোড়া শরীরের মধ্যে মুখ আর হাত দু'টিই যা সাদা। আচ্ছন্ন আলোয় সেই সাদাতেও লেগেছে অন্যরকম আভা। নাকে একটা গন্ধ লাগছিল—নিশ্চয়ই চুলের। গন্ধটা টানে।

মুখ ঘুরিয়ে আস্তে ওর চুলের গন্ধ নিল অশোক; নিঃশ্বাস টানল জোরে। এইভাবে কয়েকবার। গন্ধটা নিঃশ্বাসে মিশে যেতেই একরকম অবসাদের মধ্যে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল তার। সন্ধ্যেবেলায় বেরুবার সময় কী বলেছিল মনে আছে এখনো—মনে মনে সেই কথাটিই বদলে নিল একটু, দ্য নাইট হারসেল্‌ফ্‌ হ্যাজ কাম ডাউন উইথ অল হার ফ্লেশ! ফ্লেশ! হাসতে লাগল। সন্দীপ, দিস ফ্লেশ বিলংস টু ইউ! এই মেয়েটাকে তোর সঙ্গে জুতে দেবার চেষ্টা চলছে—লাগলেই ছুটবি বাঘের মতো; রিস্ক নিয়েও সেদিন যেমন চাপ দিয়েছিলি ফীয়াটের অ্যাক্সিলারেটারে। এই মেয়েটা তোর। আটকে পড়ে মিস করলি। না হলে পাঁজাকোলা করে তুই-ই নিয়ে যেতে পারতিস ওপরে। আস্তে আস্তে শুইয়ে দিতে পারতিস বিছানায়। সকালে উঠে যখন শুনত কী হয়েছে, কার কোলে চড়ে উঠে এসেছে ওপরে—শুনে কি লজ্জা পেত? রোমাঞ্চিত হতো? বুঝি না। কিন্তু, নিশ্চয়ই তোর দিকে এগিয়ে যেত অনেকটা! আর, যদি আমাকে নিয়ে যেতে হয়! কী হবে? লজ্জা পাবে, দু'একবার সরি-টরিও বলতে পারে—ব্যাস, ফিনিশ! তফাতটা আগেই হয়ে গেছে। আমি যে বিবাহিত! নো চার্ম। নতুন করে কাউকে কিছু দেবার নেই, পাবারও নেই--কেউ আশাও করে না কিছু! ম্যারেজ মেক্‌স্‌ এ ম্যান পুওর!

একটা হাসি উঠে এলো অশোকের গলায়। শব্দে না ফুটে সেটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল গোটা শরীরে।

কোয়ার্টার্সের সামনে এসে কাঁধের ওপর থেকে টুপুরের মাথাটা সরিয়ে দেবার আগে এক মুহূর্ত গন্ধটা ধরে রাখল অশোক।

'টুপুর—?'

জবাব পেল না। তখন ওর গালে হাত দিয়ে চোয়ালটা নেড়ে দিল অশোক, 'টুপুর—?'

'কী বলছেন!' অল্প মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসল টুপুর। চোখ খুলল।

'এসে গেছি—।' ইচ্ছে করেই একবার হর্ন দিল অশোক যদি কেটে যায় নেশাটা। তারপর বলল, 'নামতে পারবে তো?'

ঘোরলাগা চোখে খানিক আশেপাশে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল টুপুর। আঁচলটা পড়ে গিয়েছিল, দু' হাতে জড়ো করে ধরল বুকের ওপর।

'শর্মিলা কোথায়?'

'ওখানে। যেখান থেকে এলে—', বলতে বলতে গাড়ি থেকে নামল অশোক, গেটটা খুলে আবার ফিরে এলো গাড়িতে। দেখল, সীটের ওপর হাত, হাতের ওপর কপাল, টুপুর ঢলে পড়েছে আবার। গাড়িটা ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে অশোক ভাবল, আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে ওপাশের দরজাটা খুলে দিল অশোক। কিছু ভেবে তুলে নিল ওর হাতটা।

'নেমে এসো—'

'আমি পারব।'

টুপুর নেমে এলো। প্রায় স্বচ্ছন্দে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো অশোকের, স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে। মাঝখানে কয়েকটা সিঁড়ির ব্যবধান। দরজা। পকেটে হাত দিয়ে চাবিটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সে।

টুপুর দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো খাড়া, তবু কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরটা অল্প দুলছে যেন। চোখদুটো লনের দিকে। কী দেখছে বোঝা যায় না। ওর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই কপালে ঘাম ফুটতে লাগল অশোকের। মিহি জ্যোৎস্নার আলোয় অন্ধকার কাটেনি। অন্ধকারে অন্যরকম হয়ে ওঠে মেয়েরা। ঠিক কেমন? ভাবতে গিয়ে শিরা কেঁপে উঠল। কিছু না ভেবেই এগিয়ে গেল অশোক।

'চলো—'

'ধরতে হবে না—'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল টুপুর। টলতে টলতে প্রায় সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়াল। মাথাটা আবার ঝুঁকে এলো বুকের ওপর।

'পারবে না—'

চোখ তুলবার চেষ্টা করল টুপুর। পাতা যেটুকু খুলল তার মধ্যে দিয়েই পরিষ্কার রক্তাভা দেখতে পেল অশোক। মনে হচ্ছে বসবার চেষ্টা করছে। আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়ার উপক্রম করতেই এক হাতে ধরে ফেলল কোনো-রকমে। তারপর ক্লান্তভাবে মাথাটা ঠেলে দিল পিছনে।

অশোক তৎপর হলো। ডান হাতে টুপুরের পিঠ ঘিরে, ওর বাঁ হাতটা তুলে জড়িয়ে নিল নিজের গলায়।

'পারবে না—কিছুতেই পারবে না—'

'শর্মিলা কোথায়!'

জিব দিয়ে কোনোরকমে ঠেলে দিল কথা দুটো। জবাব দিল না। ওঠবার ঝোঁকেই ওকে নিয়ে চার-পাঁচটা সিঁড়ি উঠে এলো অশোক; পরের দু'তিনটে ধাপ উঠবার আগে দম নিল। মাথা হেলে পড়েছে টুপুরের। চোখ বন্ধ। খুব কাছে বলেই খানিক আগেকার ফেলে আসা গন্ধটা আরও গাঢ় হয়ে ফিরে এলো নাকে। পর পর মনে পড়ল অশোকের, তাকে ফিরে যেতে হবে এবং ফিরিয়ে

আনতে হবে শর্মিলাকে। তার আগে কতোক্ষণ কীভাবে কাটবে জানা নেই। ভাবনাটা এলোমেলো করে দিল তাকে। যতো দ্রুত সম্ভব টুপুরের শরীরটা টেনে দরজা পর্যন্ত নিয়ে এলো ও। দরজা খুলল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। দরজাটা পিছনে ঠেলে দিয়ে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করাল ওকে।

'একটু দাঁড়াও। তোমার ঘরের আলোটা জেবলে দিই—'

চারিদিক নিঝুম-করা আচ্ছন্নতার মধ্যে টুপুরের মনে হলো একটা মুঠো এখনো চাপ দিয়ে যাচ্ছে তার ডান বুকে। গরম হয়ে আছে জায়গাটা। কিংবা, ভুলও হতে পারে। এ কেমন অনুভূতি! অশোক কি আলো জ্বালার কথা বলল? ঠিক বুঝতে পারছে না। শুকিয়ে-ওঠা গলার ভিতর থেকে কথা বের করার প্রাণপণ চেষ্টা করল সে। আর একটু এগোলেই বিছানায় পেঁৗছুতে পারবে। মাথাটা ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেইদিকে। কোনোরকমে মাথা তুলে বলল, 'আমি নিজেই যেতে পারব—'

অশোক কিছু বলবার আগেই কয়েক পা এগিয়ে গেল টুপুর। কয়েক পা মাত্র। তারপরেই থেমে দাঁড়িয়ে গেস্টরুম আর ডাইনিং হলের মাঝখানের দরজাটা ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল। মাথা নাড়তে লাগল ঘন ঘন। একটা কিছু হচ্ছে—আদ্যন্ত শরীর থেকে সমস্ত অনুভূতি তপ্ত হয়ে ছুটে চলেছে মাথার দিকে। একবার পড়লেই উঠতে পারবে না আর। এক্ষুনি আলো জ্বালার কথা শুনেছিল, তাহলে এমন অন্ধকার কেন!

'তুমি পারবে না, টুপুর! চলো—'

'পারব।' এই প্রথম খানিকটা সচেতন হবার চেষ্টায় অশোকের হাতটা গা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল টুপুর, 'কেন ধরছেন! বলছি তো পারব!'

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে গেস্টরুমের দরজাটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করল টুপুর। তারপরেই এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়।

অন্ধকার। বালিশে মুখ ডুবিয়ে টুপুরের মনে হলো বালিশের রঙ কালো। কালো ছাড়া কোথাও রঙ নেই কোনো। উল্টে-পড়া বোতল থেকে একদিকেই গড়িয়ে পড়ার মতো পা থেকে মাথার দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে কালো ঘুম। ঘুম। শুধু ঘাড়ের কাছে তিরতির করছে একটা অস্বস্তি—সেটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে কানের তলায়, গালে। অস্বস্তিটা বেশী হওয়ায় পাশ ফিরল টুপুর।

'কে!'

'কেউ নয়। তুমি ঘুমোও, টুপুর—'

'অশোকদা?' চোখ খুলতে গিয়ে মনে হলো জড়িয়ে গেছে আঠায়। অস্ফুটে বলল টুপুর, 'শর্মিলা কোথায়?'

'আসবে—'

অন্ধকার। শরীরে ঢুকে পড়ছে অন্ধকার; শরীর থেকে ছুটে যাচ্ছে মাথার দিকে। নিঃশ্বাস থমকে গেছে এক জায়গায়—সুড়ঙ্গহীন বুকের মধ্যে টুপুর

টের পেল তার এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো। অস্পষ্টভাবে অনুভব করল এক-রাশ পিঁপড়ে পিলপিল করে ঘুরছে তার চামড়ার ওপর, হাল্‌কা অথচ তপ্ত শুঁড় বুলিয়ে যাচ্ছে কপালে, গলায়, বুকের কাছে। ক্রমশ নাভির দিকে তাদের হাঁটাচলা টের পেল টুপুর। জানুর ওপর অস্বস্তি শুরু হতেই ছটফট করে সে বলল, 'কে হাত দিচ্ছে আমার গায়ে!'

'কেউ নয়। তুমি ঘুমোও।'

দু' একবার মাথাটা তোলবার চেষ্টা করল টুপুর। কোমর ভেঙে উঠে বসল বিছানায়। এখন আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে নিজেকে। বুকের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট হাত তুলে ব্লাউজের খোলা হুক্‌টা লাগাবার চেষ্টা করল সে, আঁচলটা মুঠো করে তুলে আনল বুকের ওপর। চোখদুটো খুলে রাখবার চেষ্টায় ঝাঁকুনি দিল মাথায়। তারপর বলল, 'আপনি এখানে কেন! আপনি যান—'

অশোক হাসল একটু। কাঁধদুটো ধরে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করল ওকে, মাথাটা চেপে ধরল বালিশে। মুখ নামাতে নামাতে বলল, 'ঘুমোও—'

৭

ক'টা দিন হাসপাতালে কাটিয়ে বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠল রজত। এও এক হাজত, তবে তফাৎ আছে। মারের বদলে ভিটামিন। ক্যাবিনের বিছানায় শুয়ে, ভালো-মন্দ খেয়ে আর পরিচ্ছন্ন ঘুমিয়ে মনে হয় ওজনও বেড়ে গেছে খানিকটা। কালই তো, ট্রাউজার্সের বোতাম আঁটতে গিয়ে টান পড়ল কোমরে—বোতামটা শেষপর্যন্ত ঘরবন্দী করতে গিয়ে বেগ পেতে হলো। কি রে বাবা, ভুঁড়ি হয়ে গেল নাকি? এতো রক্ত বেরুনোর পরেও! মার খেয়ে মোটা হয়—এ-রকম শুনেছ কখনো!

নিজের সঙ্গে এইরকম ইয়ার্কি করতে করতে খুশিতে ছেয়ে উঠছিল মন, এরই মধ্যে দুঃখ নেমে এলো ঝুপ্‌ করে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল রজত। নীলে সবুজে মিশে অদ্ভুত শান্ত চারিদিক। যতোদূর চোখ যায় মনে হয় সব বাড়িগুলোরই রঙ করা হয়েছে নতুন, সব গাছেরই পাতা ধুয়ে গেছে বৃষ্টিতে। একটুও তাপ না ছড়িয়ে ঝলমল করছে রোদ। চমৎকার হাওয়া বয়ে যাচ্ছে আকাশের তলা দিয়ে। এ-দৃশ্যে চোখ রেখে ক্রমশ বেড়ে ওঠে বাঁচার লোভ। মনে হয় দাগটা ভুয়া; কিংবা, যদি সত্যিও হয়—এ-সব দৃশ্যের আড়াল থেকে উঠে এসে খুব তাড়াতাড়ি কেউ মুছে দিয়ে যাবে একদিন! তবু তার ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে সিনেমায় দেখা ছবি এ-সব, তার জগৎটা আলাদা। খুব শীঘ্র সে পৌঁছে যাবে সেখানে!

প্লাস্টার তোলা গালের খসখসে চামড়ার ওপর আস্তে আস্তে হাত বোলালো রজত। নিজেকে লুকিয়ে নিঃশ্বাস চাপল। পনেরো দিন পরে আজ সে ছাড়া পাবে। নাকের পাশে ক্ষতটা যদিও পুরোপুরি সারেনি এখনো, তবু ব্যথা নেই কোনো। কাল বিকেলে ডাক্তার নিজে টিপেটুপে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, বাড়ি যেতে পারবে?' রজত ঘাড় নেড়েছিল। তার মানে সে এখন সুস্থ; একটু পরেই এক্স-রে হবে একবার, তার পরেই চুকেবুকে যাবে ব্যাপারটা। কিন্তু, লাভ কী? দিন গুনতে গেলে হিসেবটা গুলিয়ে যায় এখন। কুড়ি দিন, না একুশ দিন? কিছু এদিক ওদিক হলেও ক্ষতি নেই। মনে হচ্ছে এইভাবে পেরিয়ে গেছে অনন্তকাল—দিনের হিসেবে ধরা যায় না সময়টাকে। মনে হয়, এখানে তবু একটা অজুহাত ছিল, শাসন ছিল; বাড়ি ফিরে গেলেই তো আবার সেই একা!

ভাবনাটা দুলিয়ে দিল রজতকে। বালি খুঁড়লে শূন্য জায়গাটা আস্তে আস্তে ভরে ওঠে জলে, তেমনি দুঃখটাও। কানায় কানায় ভরে উঠে লাফাতে থাকে বুকের মধ্যে, ভয়, দেখায় যে-কোনো সময় উথলে পড়ার। স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে হয়তো—যাকে বলে বেঁচে ফিরে এলো; কিন্তু লাভ কী? কলকাতায় ফিরে এলি, এতো কাছে; তবু এতোদিনে একবারের জন্যেও কি তোর মনে হলো না, টুপুর, রজতটা মরে যেতে পারত! একটা কুকুর গাড়িচাপা পড়লেও তো মন খারাপ হয় মানুষের! নাকি এমন কিছু পেয়ে গেছিস তুই, ঘুমের ওষুধের মতো যা তোকে ভরিয়ে রাখছে সারাক্ষণ—এখন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে ভাববার সময় নেই!

ব্যাপারটা বুঝতে পারে না রজত। কেমন গোলমাল লাগে সবকিছু। জানলা থেকে বেড়ে সরে এসে আস্তে আস্তে হাত-পাগুলো ছড়িয়ে দিল সে, মাথাটা নামিয়ে রাখল বালিশের ওপর। অনীশদা একটা বই দিয়ে গেছে—পড়বে ভেবেও এ-পর্যন্ত শুরু করতে পারেনি একবারও। যতোক্ষণ কেউ কাছে থাকে, মনে হয়, ভালো; তারপরেই ছেঁকে ধরে বিষণ্ণতা। ইচ্ছে করে না কিছু, ভাবনা-গুলোও হয়ে ওঠে এলোমেলো। সেইরকম, এখনো, এলোমেলোভাবে বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সংকল্পের মতো কী একটা দপ্ করে জ্বলে উঠল মনের মধ্যে। আজ ছাড়া পাবো, রজত ভাবল, তাহলে আজই—আমাকে তুই এড়াতে পারবি না টুপুর! এই পৃথিবীটার সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা আমি ভুলিনি! আমি জানি, সহজে কিছুই আসবে না আমার কাছে। যদি না আসে, আমি ছিনিয়ে নেব।

অল্প উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল রজত। চোয়াল শক্ত হতেই টের পেল যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা মুখমণ্ডলে—বিশেষত ডান চোখের নীচের সমগ্র অংশে আর নাকের পাশে, ওপরের দাঁতের মাড়ি ভিজে উঠছে আঠা-আঠা থুথুতে। তার মানে সেনসিটিভ হয়ে আছে জায়গাটা, শিরার টান সহ্য করতে পারছে না এখনো। ডাক্তার বলেছিল, এখনো দু' মাস সাবধানে থাকতে হবে খুব, এই ধরনের ইনজিউরিতে যে-কোনো সময় ব্লীডিং শুরু হতে পারে আবার। সেটা ভালো নয়।

ক্রমশ নিজেকে সইয়ে নিল রজত। নিজেরই হাতে মমতা মিশিয়ে কপাল থেকে হাতটা টেনে আনল চোখের ওপর, আস্তে আস্তে বোলাতে লাগল চোয়ালে, গালে, নাকের পাশে। পল্লব নিতে আসবে সেই দুপুরের দিকে। তার আগে রিলিজ লিখে দেবে ডাক্তার। এই সময়টা কিছুই না করে চুপচাপ কাটিয়ে দিতে পারে সে। ছিমছাম রোদ এসে পড়েছে ক্যাবিনের হাল্‌কা সবুজ দেয়ালে—হাওয়ায় পর্দার কাঁপন রোদটাকেও কাঁপিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। দেখতে দেখতে মনটা অন্যরকম হয়ে গেল রজতের। যদি সত্যিই মরে যেতাম, ভাবল, সবুজ এই রোদ্দুরের সঙ্গে দেখা হতো না কোনোদিন। ভাবতে ভাবতে,

আলস্যে বইটা পাশে সরিয়ে রাখল সে, বন্ধ করে রাখল চোখদুটো।

সত্যি, কেমন অদ্ভুতভাবে ঘটে যায় ঘটনাগুলো! সেদিন ওই ছেলেটিকে আক্রমণ করবার আগে একবারের জন্যেও তার মনে হয়নি এমন একটা কিছু ঘটবে। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল সে একা নয়—লক্ষ মানুষের শক্তি জড়ো হয়েছে তার শরীরে আর আক্রোশে; তখন যে-কোনো বাধাই সে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। তারপর, অতর্কিত ঘুঁষিটা যখন মুখে এসে পড়ল, পিঠে ছুরি-বেঁধা যন্ত্রণায় টান-টান শরীরটা উঠতে চাইল ওপরের দিকে, প্রায়ান্ধকারে সে বুঝতে পেরেছিল মৃত্যু আসছে। সকাল থেকে সারাক্ষণ এই মৃত্যুর কথাই ভেবে যাচ্ছিল সে—এতো তাড়াতাড়ি এসে পড়বে ভাবেনি। তারপর কী হয়েছিল মনে নেই। চোখ খুলল এখানে, এই হাসপাতালে। তখনো ঝিমঝিম করছে মাথা। কাচের ওপর বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে অবিশ্রান্ত, মুখগুলি ঝাপ্সা। ক্রমশ স্পষ্ট হলো তারা—ক্রমশ অনুভব করল, এখন সে কথা বলতে পারবে না। মাথায় রাখা হাতটা ছুঁয়েই বুঝতে পারল, সে ভুল করেছিল, ওটা চন্দনার হাত। ওদিকে ঈপ্সিতা। শম্ভুনাথ। পল্লব, পিনাকী, অসিত। একটু একটু করে মনে পড়ল সব। সে তার পরিচিত পরিবেশেই আছে। কিছুই বদলায়নি তেমন। খানিক চেয়ে থেকে দেখতে দেখতে আনমনা দুঃখ এসে আবার ঝাপ্সা করে দিল সব।

ওরা আসে। প্রায় নিয়মিত, রোজই আসে পল্লব, পিনাকী, অসিত। কথা বলে। যেন ওষুধ, ইঞ্জেকসনের সঙ্গে সঙ্গে ওদের উপস্থিতিটাও দরকার। ক্যাবিনে জায়গা বড়ো কম, বসবার ব্যবস্থা নেই তেমন। কেউ পায়ের কাছে, কেউ মাথার কাছে—দাঁড়িয়ে থাকে কেউ। ভিড় বেশী হলে চলে যায় বারান্দায়, উঁকি দেয় মাঝে মাঝে, ফিরে আসে আবার। ওদের দিকে তাকিয়ে বুনো আবেগে চোখে জল এসে যায় রজতের; চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ওরা আমার, ওদের ধরে রাখার জন্যে আরও বড়ো ঘরের দরকার। মনে হয় হলঘরের মতো লম্বা চওড়া হয়ে ক্রমশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরটা—একার নিঃশ্বাসে কুলোচ্ছে না সেখানে। কথা বলা বারণ, তাই অন্ধ ঠোঁট আর জিবের সমস্ত ইচ্ছে সে ফুটিয়ে রাখে চোখে। হাসে। কে জানে কেন, সকলকেই মনে হয় নতুন। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সিরসির করে ওঠে চোখের কোণদুটো—কে কী বলছে মুহূর্তের জন্যে গুলিয়ে যায় কেমন। দেয়ালে তাকিয়ে মনে মনে একটা হিসেব ধরে রাখতে চায় রজত। ভাবে। ওরা চলে গেলে জানলা দিয়ে অন্ধকারটা দেখতে পাবে সে। তারপর রাত হবে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে যাবে আর একটা দিন। কতো দিন হলো যেন!

'ব্লাউজটা রেখে দিয়েছি। দেখাবো তোকে—।' চন্দনা বলল একদিন, 'বাব্বা! এতো রক্ত তুই পেলি কোথায় রে!'

হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল রজত।

'বেস্ট পারফরমেন্স তোর—', পল্লব বলল চন্দনাকে, 'তোকে সেদিন সুচিত্রা সেনের মতো লাগছিল।'

'যাঃ! কী যে বলিস! ভয়ে আমার কী যে হচ্ছিল তখন!'

'আর পিনাকটা?' অসিত বলল, 'ছেলেটাকে ফিনিশ করে দিয়েছিল প্রায়। রজত, তুই যদি পিনাককে দেখতিস তখন!'

ঈপ্সিতা বলল, 'ঠিকই করেছিল। আমারই মারতে ইচ্ছে করছিল—'

পিনাকী হাসল চুপচাপ। তাকাল ঈপ্সিতার দিকে। হাসতে হাসতেই বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কিছু মেলে।'

চোখের কোণ দিয়ে পিনাকীকে দেখল ঈপ্সিতা। একটু লজ্জাও পেল যেন। তারপরেই তড়বড় করে বলে উঠল, 'তা বলে ভেব না আবার পিকনিক করতে গেলে আমি তোমার পাশে গিয়ে বসব।'

পিনাকীর ভাবান্তর হলো না কোনো। যেমন হাসছিল, তেমনিই, বলল, 'রজত ভালো হলে একটা পিকনিক অ্যারেঞ্জ করতে হবে। এক্সক্লুসিভ। শুধু আমরাই থাকব। ওসব অশোক সন্দীপ-ফন্দীপ জুটলেই শালা ঝামেলা শুরু হয়ে যায়!'

রজতের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তোরা আমাকে এতো ভালোবাসিস কেন? তারপরেই ভাবল, তাকে একা কেন! ওরা যে যেভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে, তাকে জড়িয়ে একটা সুতো টানলে সকলেই টের পাবে। নদী ভাবলে একটাই স্রোত, ঢেউগুলেই যা আলাদা মনে হয়। ভাবতে ভাবতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সে। ঠোঁট ছুঁয়ে গেল হাওয়া। না বলবে না। বারণ না থাকলেও বলত না।

ঈপ্সিতা ঝুঁকে এলো কাছে, 'কষ্ট হচ্ছে কিছু? কিছু বলবি?'

ওর হাতটা আলতোভাবে ছুঁলো রজত। আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'টুপুরের খবর রাখিস?'

'জানি না। বললাম কতো করে জবাব দিল না কোনো। রোজ তো আসেও না দেখি! কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে!'

'আমাকে বলল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যায়।' চন্দনা বলল, 'চেহারাটা দেখেছিস, কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে।'

অসিত বলল, 'যাই হোক, এটা অন্যায়। আমরা আসছি, ও তো একদিনও আসতে পারত!'

কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল পল্লব। রজতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, সেদিন বলেছিলাম না! তুই তো তর্ক করে গেলি! আসলে সবাই একরকম। ও যা পাবার পেয়ে গেছে, এখন এড়িয়েই যাবে তোকে। তুই ভুলে যা—ভুলে যা ওকে।

দেখতে দেখতে জ্বলে ওঠে ক্যাবিনের আলো। অন্ধকার আর আলোর

মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে মলিন হয়ে যায় জানলার সাদা পর্দাটা।

দিল্লি থেকে ফিরেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল অনীশদা। সঙ্গে শিখা বউদি।

কেমন আলাদা মুখচোখ অনীশদার। মনে হলো ঠিক কী হয়েছে না বুঝেই একটা উদ্বেগ পুষে রেখেছিল মনে, দৃষ্টিটা তাই উদ্‌ভ্রান্ত। ধাতস্থ হয়ে বলল, 'ভালোই হয়েছে। তুই মরবি না। মার খেতে খেতে শক্ত হয়ে যাবি। আবার মারবি—'

'ও কি কথা!' শিখা বলল, 'শুধু শুধু মারামারি করা কি ভালো! কী যে বলো!'

'ঠিকই বলছি।' অনীশ বলল, 'আমরা পারিনি—স্বপ্ন দেখতে দেখতেই বুড়ো হয়ে গেলাম! তোরা পারবি—'

রজত বুঝতে পারে না, ঠিক কোন স্বপ্নের কথা বলছে অনীশদা! হয়তো আছে কিছু, ছিল; নিজের কথা তো বলে না কোনোদিন! আজই হঠাৎ বলে ফেলল।

'তুমি বড়ো সেন্টিমেন্টাল! এ-সব কথার মানে আছে কিছু!'

অনীশকে থামিয়ে রজতের কাছে এসে বসল শিখা। আদরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কলেজে গিয়ে মারামারি করবে জানলে সেদিন তোমায় ছাড়তাম না।'

শিখার কথায় লুকানো মৌরির গন্ধ পেল রজত। এই বিকেলে চুল ভিজে নয়, তবু ভিজে চুলের গন্ধটাও। আগে যা দেখেছিল তার চেয়ে আরো খুশি-খুশি আর রহস্যময় লাগে শিখাকে। নরম আঙুলগুলো চুলের ভিতর দিয়ে শিকড় ছড়িয়ে দিচ্ছে মাথার ভিতর। মায়াময় এই স্পর্শ আর কথার বদলে কিছু দিতে ইচ্ছে করে শিখাকে। কী দেবে? তার তো কিছুই নেই!

কেমন যেন গলা বুজে এলো রজতের। শিকড়গুলো টেনে নামিয়ে আনল বুক পর্যন্ত। মনটা হঠাৎ বুড়োর মতো হয়ে আশীর্বাদ করতে চাইল। শিখার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, বউদি, সেদিন ঠিক আঙুলটাই ধরেছিলাম তো? পারল না। শুধু ভাবল, ঠিক ভুল জানি না। তবু আমার ইচ্ছেয় ভুল ছিল না কোনো।

অনীশ উঠে গেছে বাইরে। সম্ভবত সিগারেট খেতে। ব্যাগের ভিতর থেকে একটা গিঁটবাঁধা ছোট্ট রুমাল বের করে আনল শিখা। তারপর তার কপালে আর বুকে ছুঁইয়ে টুকরোটা গুঁজে দিল পকেটে। ছোট করে বলল, 'এটা সঙ্গে রেখো—'

'কী এটা?'

'জিজ্ঞেস করছ কেন?'

সেই হাসি, সেই একই রহস্য শিখার ঠোঁটে। লাবণ্যে ভরা সেই মুখটি

ওরা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ ভেসে থাকল রজতের চোখে। মানুষের মুখে নির্মল হাসি দেখলে জুড়িয়ে যায় বুক। তবু সে এতো অসুখী কেন? জ্বালাটা জুড়োয় না কেন? তখন মনে পড়ে, ছাপটা আছে—ছাপটা যায়নি। যতোদিন থাকবে ততোদিন জ্বালাটাও থাকবে।

আসেন শম্ভুনাথ। প্রায় রোজই। কথা বলেন না কোনো। একবার মুখ দেখিয়েই বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বারান্দায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসেন আবার—একটুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরে যান। নিঃশব্দ তাঁর ফেরার গতি। মনে হয় আরও নিঃশব্দ, শিলার মতো মন তাঁর। কী ভাবছেন বোঝা যায় না কিছু।

একদিন সুধাকে নিয়ে এলেন শম্ভুনাথ। এসেই ঝটপট কথা বলতে শুরু করল সুধা, যেন এই তিন চারদিন আকুলিবিকুলি করছিল অপেক্ষায়।

'গুরুজনদের কথা শুনিস না! দেখলি তো কী হলো?'

'কী আর হলো!' মুখের বাধো বাধো ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে রজত বলল, 'কারুর হয় না!'

'যার হয় হোক। তোর কেন হবে?'

হাত বাড়িয়ে বুকখোলা সার্টের বোতামগুলো এঁটে দিল সুধা।

না হেসে পারল না রজত। বলল, 'বোতামে তোমার এলার্জি আছে, কাকীমা! যখনই খোলা দ্যাখো, আটকে দাও!'

'যা চেহারা তোর!' সুধা বলল, 'গায়ে মাংস লাগুক, তখন যতো ইচ্ছে বুক খুলে ঘুরে বেড়াস। এই চেহারা নিয়ে কী করে যে দাপিয়ে বেড়াস!'

সেদিন বিকেল হয়েছে সবে। শুধু পিনাকীই এসেছে তখন। অন্যরাও এসে পড়বে একে একে। হঠাৎ ক্যাবিনে ঢুকে পল্লব বলল, 'একটা বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তুই কেমন আছিস জিজ্ঞেস করছে—'

শুনেই শীত করে উঠল শরীর। ব্যস্তভাবে রজত বলল, 'ডাক তো!'

ক্যাবিনে ঢুকে দিশেহারার মতো চারিদিকে তাকাতে লাগল লোকটি, যেন কোথায় এসেছে ঠাহর করতে পারছে না ঠিক।

ইশারায় পল্লব আর পিনাকীকে বাইরে যেতে বলল রজত। প্লাস্টার খোলে নি এখনো, উঠে বসলেই তিরতির করে কী একটা কাঁপতে থাকে চোয়ালের ভিতর, নাকের পাশের ক্ষতে। ডাক্তার বলেছে যতোক্ষণ পারে শুয়ে থাকতে। উঠে বসতে গিয়ে সেই অস্বস্তিটা টের পেয়েই আর উঠল না রজত। বিছানার পাশে চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বোসো—'

যেভাবে বসল তাতে মনে হলো এতোক্ষণ যেন বসবারই অপেক্ষা করছিল। বসেই নাড়ি টেপার ধরনে হাতটা ধরে ফেলল তার। বলল না কিছু।

অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল রজত। হাতটা ছাড়েনি, কথাও বলছে না কিছু। খানিক পরে চোখ ফিরিয়ে দেখল শূন্য চোখ মেলে তাকিয়ে আছে

দেয়ালের দিকে; ঔজ্জ্বল্য নেই কোনো—চোখ জুড়ে একটা ধূসর রঙ। ছানি পড়তে শুরু করেছে হয়তো। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গিয়েও থমকে গেল রজত। ঝুলে-পড়া ঠোঁটদুটো নড়তে শুরু করেছে বুড়োর। আবজানো গলায় কোনোরকমে 'খোকা—' বলেই থেমে গেল।

রজত তাকিয়েই থাকল। অনেকদিন পরে দেখছে বলেই অচেনা লাগছে কেমন। বিশ্বাস হয় না এই লোকটাই তার বাবা। হয়তো যেমন আসে আর দেখা না পেয়ে ফিরে যায়, আজও এসেছিল তেমনি—খবর পেয়ে ছুটে এসেছে।

'এতো কষ্টের জীবন কেন তোমার!' বুড়ো হঠাৎ বলল, 'সে কি আমার অপরাধে!'

গলার খসখসে চামড়ায় শিরা আর খাঁজ, একটুকরো হাড় দ্রুত ওঠানামা করছে সেখানে। এর পরেই হয়তো কান্না জুড়ে দেবে! রজত বুঝতে পারে না বাবা সব সময়েই কেন অন্যরকম কথা বলে! কষ্ট ছাড়া আর কিছুই কি ভাবতে পারে না? কেন মন খারাপ করিয়ে দেয় এতো!

একটা রাগ এসে ঝিনঝিন করতে লাগল মাথায়। বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ —তোমারই জন্যে—, কোনোরকমে সামলে নিল নিজেকে। হাতটা ছাড়াতে গিয়েও জোর পেল না কোনো। ধূসর চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই তার মনে হলো লোকটা আন্দাজে কথা বলছে। দেখতে পাচ্ছে না, তাই হাতটা ধরে চেষ্টা করছে অনুভব করতে। আর বাঁচবে না বেশীদিন। এমন লোক শম্ভুনাথের মতো জোর দিয়ে বেঁচে থাকার কথা বলতে পারে না।

বুড়োটার জন্যে হঠাৎই কষ্ট শুরু হলো রজতের। খুব মন দিয়ে ভাববার চেষ্টা করল, এই লোকটাই তার বাবা। সুতোটা ছিঁড়ে গেছে কবে—চেষ্টা করেও কষ্টের চেয়ে বড়ো কোনো অনুভব পোঁছুতে পারল না সে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রজত বলল, 'চিন্তা কোরো না। আমি ভালোই আছি—'

'তোমার মাকে তাই বলব।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল রজত। অস্বস্তি লাগছে—ভীষণ অস্বস্তি, এটা বোঝানো যাবে না কাউকে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আসার দরকার নেই। এবার ওঠো। ফিরবে তো! অনেকটা রাস্তা—'

বুড়ো বলল, 'আর একটু বসি—'

বসবার জন্যেই এসেছিল। বসে থেকেই চলে গেল। যাবার ভঙ্গিতে সাড়া, ফিরেও দেখল না।

পল্লব ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে রে?'

'বাবা—'

'বাবা! তোর? বললি না কেন, পেন্নাম করতাম একটা!'

'কী হবে!' ঠাণ্ডা গলায় বলল রজত, 'এরপর কোনোদিন শুনব মরে

গেছে—'

স্মৃতি জড়িয়ে যাচ্ছে স্মৃতিতে, যেমন প্রায়ই যায়। আজ সকালেও একবুক বিষণ্ণতা নিয়ে বিভিন্ন স্মৃতি ও সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বেলার দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎই অসহায় বোধ করল রজত, যেমন প্রায়ই করে। ঠিক ধরা যাচ্ছে না এই মানুষগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, কিংবা তার সঙ্গে এদের! এরা দুঃখে ভাসিয়ে দেয়, এরাই ছুঁড়ে দেয় অবুঝ রাগের দিকে। হাসিতে রহস্য মাখিয়ে কখনো বা টেনে নেয় স্বপ্ন ও ভালোবাসায়—মন নুয়ে পড়ে কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু কে যে কী ভাবছে, ভাবছে কেমন করে, তার হদিশ মেলে না কোনো। কেন যেন মনে হয় সে আটকে পড়েছে রহস্যময় এক রাস্তার ধাঁধায়—মাঝখানের কোনো এক জায়গায়। একই মানুষজন যাতায়াতের রাস্তায় কখনো সুখে কখনো বা দুঃখিত মুখে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। সে একাই দাঁড়িয়ে আছে, কারণ সে একটু আলাদা—একটা দূরত্ব অবধি পৌঁছে হারিয়ে গেছে তার পরের নির্দেশ। কিন্তু, থেমে পড়া মানেই তো মরা! তাহলে দেয়ালের সবুজ রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে কেন তার মনে হয় বড়ো সুখ এই বেঁচে থাকায়, বড়ো ভালো লাগে এই আলো হাওয়ায় চোখ খুলে তাকিয়ে থাকতে!

ভাবনাটা মুহ্যমান করে দিল তাকে। সময় গুলিয়ে গেল। ভাগ্যটাগ্য বুঝি না—এই আলোয় তাকাতে হবে আমাকে, নিঃশ্বাস নিতে হবে এই হাওয়ায়।

একই সময়ে রাগে আর দুঃখে জড়িয়ে যেতে যেতে বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরের এবড়োখেবড়ো মাংসটা চেপে ধরল রজত, টের পেল যন্ত্রণাটা আসছে। বড়ো কষ্টের এই যন্ত্রণা। ডাক্তার বলেছিল, কিছুই করার নেই—শুধু সহ্য করে যেতে হবে। তা কী করে হয়? নিজেকে নিজেই জিজ্ঞেস করে রজত। উত্তরটাও পেয়ে যায় নিজেরই কাছে। চোখমুখ শক্ত করতে করতে ভুলে যায় ক্ষতটা পুরোপুরি সারেনি এখনো। ভাগ্য? সমাজব্যবস্থা? মানুষ? মারো. শালা, যতো পারো মারো। আমি মরব না। আমি শুধুই চিনে রাখছি এই ঘা-গুলোকে, আর তোমাদের। তোমরাই আমার জোর বাড়িয়ে দিচ্ছ।

দুপুরের দিকে পল্লব এসে নিয়ে গেল তাকে। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বলল, 'এতো চুপচাপ কেন রে!'

রজত বলল, 'এমনি—'

'আমি জানি, তুই একজনের কথাই ভাবছিস!'

'জানি না। হতে পারে—'

পল্লব হাত রাখল ওর হাতের ওপর। স্নেহে, মায়ায়, আবেগে। কেন জানে না, আজকাল প্রায়ই তার মনে হয়, রজতকে সে ভালোবাসে নিজের চেয়েও বেশী। ওর জন্যে সে যা হোক করতে পারে। কাউকে বলেনি, এই ভাবনা

থেকেই একদিন সে ছুটে গিয়েছিল টুপুরের কাছে। বাড়ি থেকে বের করে এনেছিল রাস্তায়।

'চ টুপুর, একবার দেখে আসবি রজতকে।'

'আমি যাবো না।'

টুপুর বদলে গেছে। বদলটা টের পাওয়া যায় ওর চোখমুখের দিকে তাকালে। ভিতরটা বোঝা যায় না। কেন? তা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছিল। মেয়েদের সে বোঝে না। খানিক পরে বলল, 'ক'দিন বাদে রজত ছাড়া পাবে। তোর সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন কি বলবি?'

'যদি দেখা হয়, বলব।' হঠাৎ ছটফট করে উঠল টুপুর, 'এ-সব বলার জন্যে কেন আমায় ডেকে আনলি বল তো! আমি যাচ্ছি—'

আর কিছু না বলে, প্রায় দৌড়েই হেঁটে গিয়েছিল টুপুর।

এ-সব বলা যাবে না রজতকে। বললেই ক্ষেপে যাবে, তুই এতো রগড়াচ্ছিস কেন! না, বলা উচিত হবে না। তখন রজতের হাতে অল্প চাপ দিয়ে বলল, 'সেদিন আমার কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলি। আজ আবার বলছি, ভুলে যা। না হলে আবার একটা ঘা খাবি।'

অসহিষ্ণুভাবে তাকাল রজত। চলে গেল অন্য কথায়।

'তোর কি মনে হয়, আমি একটা চোর? ডাকাত? খুনে? আমার কাছে আসতে ভয় লাগে?'

'সেন্টিমেন্ট!' পল্লব হাসল। তারপর বলল, 'আমি কি শালা ভগবান, যে বলব! দেখাটা যার যার নিজের—'

সময় চলে যাচ্ছে। জবাব না দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে জোরে চালাতে বলল রজত। এবং ভাবল, এ-সব কিছু নয়। টুপুরকে সে চেনে। যেতে হলে বলেই যাবে।

৮

বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরেই রজত সুধার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শম্ভুনাথ নেই, আজ অনেকদিন পরে সল্ট লেকে গেছে বাড়ির তদারকি করতে। ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে গল্পের বই পড়ছিল সুধা। হঠাৎ রজতকে দেখেই সোজা হয়ে বসল।

'কী হলো, উঠে এলি!'

'গোটা কুড়ি-পঁচিশ টাকা ধার দেবে, কাকীমা? আমার কাছে কিছু নেই—'

'টাকা! টাকা কী করবি?'

'দরকার! খুব জরুরী দরকার। আমাকে এক্ষুনি এক জায়গায় যেতে হবে।'

'বেরুবি! এই হাসপাতাল থেকে ফিরলি, এখুনি!' বিকেল হয়ে আসছে, সেদিকে তাকিয়ে সুধা বলল, 'আমি জানি না, বাপু! উনি ফিরুন, তারপর যেখানে যাবার যাস।'

'কাকীমা, তোমার পায়ে পড়ি—'

একটুক্ষণ কী ভাবল সুধা। নিঃশব্দে উঠে চলে গেল ঘরের মধ্যে। ফিরে এসে নোটগুলো হাতে দিয়ে বলল, 'যেভাবে যাচ্ছিস সেভাবেই ফিরে আসিস। তোর জন্যে আজ আমার কপালে দুর্ভোগ আছে—'

'দুর্ভোগ? দূর!' রজত বলল, 'কাকা কি আর সন্ধ্যের আগে ফিরবে! আমি তখন বিছানায়—'

রাস্তায় নেমে রজতের মনে পড়ল অনেকদিন সিগারেট খায়নি। এমনিতে না খেয়ে হাঁকুপাঁকু করে বুক; এবার করেনি—সম্ভবত যন্ত্রণাটাই ভুলিয়ে রেখেছিল। আজ মনে পড়ায় ইচ্ছেটা তাড়া দিল। প্রথম নোটটা সিগারেটের দোকানেই ভাঙাল সে, ধোঁয়া গিলতেই চনমন করে উঠল শরীর। আবার টানল। তারপর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রাস্তা, লোকজন, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, শব্দ, পড়ে-আসা আলো—সবকিছু দেখতে দেখতে ও অনুভব করতে করতে বলল, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি। অন্তত আজ—একদিন দয়া করো আমাকে। আমার ভালো লাগছে না, কিছু ভালো লাগছে না। অন্তত একদিন তোমরা আমার পরিকল্পনা মতো চলো। মনে মনে, এইভাবে, হাঁটতে শুরু করল সে।

সামনে ইউনিক ফার্মেসী। ফাঁকা। কাউন্টারে সেই লোকটি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে রজত বলল, 'একটা টেলিফোন করতে দেবেন? প্লীজ!'

লোকটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে। কিংবা ক্ষতটার দিকে।

কৈফিয়ৎ দেবার ছলে হাত তুলে চোয়ালে বুলিয়ে নিল রজত। বলল, 'অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল—'

'যান—'

আজ রবিবার। টুপুর থাকবে। থাকবে কী? রিসিভারটা হাতে নিয়ে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রজত। ওষুধের দোকানের টেলিফোন, দুঃখের খবরে অভ্যস্ত হয়ে গেছ তুমি। আমার কষ্ট কি বুঝবে! এইভাবে নাম্বারটা জারিয়ে নিল মনে। ডায়াল করল। কট করে শব্দ হলো একটা। অধৈর্য ঘাম ফুটে উঠল কপালে। ব্যস্তভাবে ডায়াল করল আবার। রিং হচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে—

'হ্যালো—'

অসুখের গলা। যেন ভেসে আসছে বহুদূর থেকে। বুকের ভিতর দ্রুত অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে এলো রজত।

'কে, টুপুর?'

উত্তর নেই।

'টুপুর? আমি রজত—'

'কী বলবি বল?'

'এমন গলা কেন তোর! কী হয়েছে!'

আবার চুপচাপ।

'টুপুর—?'

'শুনছি তো!'

'আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করবি না?'

একটু চুপচাপ। রজত ধরে থাকল।

'আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না—'

'শোন, তোর সঙ্গে আমার ভীষণ দরকার। আমি আসছি—ডাকবাক্সটার সামনে দাঁড়াব। তুই চলে আয়—'

'আমি আসব না।'

'আয়। প্লীজ! আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি—'

ওদিকে একটা শব্দ। এলোমেলো, গভীর ঘুমে পাশ-ফেরা নিঃশ্বাসের মতো। রিসিভারটা হাতে ধরে ঘামতে লাগল রজত। কিছুক্ষণ। আবার ফিরে এসেছে ডায়ালটোন। রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রজত। পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। সময় চলে যাচ্ছে, আর দশ মিনিটও নেই। বলল আসবে না। কেন! আসুক না আসুক—আমাকে যেতেই হবে।

আট মিনিট। চোয়ালের নীচে ফিরে আসছে তিরতিরে অনুভূতিটা। আসুক। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল রজত, 'ট্যাক্সি—ট্যাক্সি—'। শালা! দাঁড়াল না। ঠিক আছে, আমিও হারব না। আর একটু এগিয়ে গেলেই চৌমাথা—ওখানে নিশ্চয়ই থাকবে। অসহিষ্ণুভাবে ঘড়িতে চোখ রাখল রজত। সাত মিনিট। মাই গুডনেস্! সময়ও বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করল নাকি! ঠিক আছে, আমি হারব না। আজই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এখনো পা কাঁপছে আমার, তবু আমি পেঁছুবো। ভাবতে ভাবতে ছুটতে শুরু করল রজত। পনেরো দিন বিছানায় শুয়ে থাকা পেশীগুলো ফাঁপিয়ে তুলল—সেই একই অনুভূতি, যেন লক্ষ মানুষের শক্তি ঢুকে পড়েছে শরীরে! বাড়তি নিঃশ্বাসের জন্যে ওঠানামা করছে বুকটা। তবু ছুটতে ছুটতেই মনে হলো রজতের, সে যাচ্ছে নিজেরই গতির বিরুদ্ধে—এতোকালের মাপা দূরত্ব ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে আরও।

ঠিকই, একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। হাঁফাতে হাঁফাতে পেঁছে দরজার হাতল ধরে টান দিল রজত। খুলল না, ভিতর থেকে লক করা। ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

'কাছেই—রাসবিহারী এভিনিউ—'

'অন্য গাড়ি দেখুন। আমার দেরি হবে।'

রক্ত চেপে গেল মাথায়। প্রচণ্ড রাগে সোজাসুজি লোকটার দিকে তাকিয়ে রজত ভাবল, হয় খুন না হয় ক্ষমা—এ-ছাড়া আমার আর পথ নেই কোনো। কোনটা চাও তুমি?

লোকটা দমল না একটুও। নিরেট মুখে জবাব দিল, 'বলে লাভ নেই, দাদা। দেরি হবে।'

দেরি হবে! তারও দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি ট্রাম-বাসও নেই যে উঠে পড়বে। হেঁটে? অসম্ভব! এই রাস্তাটুকু দৌড়ে আসতেই হাঁফ ধরে গেছে বুকে। তখন মরিয়া হয়ে রজত বলল, 'পায়ে ধরলে যাবেন?'

'কী মুশকিল!' লোকটার চোখে বিরক্তি ও কৌতুক। দরজাটা খুলে দিতে দিতে বলল, 'ঠিক আছে, উঠুন—'

'একটু তাড়াতাড়ি। যতো তাড়াতাড়ি পারেন—'

চাবির এক মোচড়েই দুলে উঠল ট্যাক্সিটা। ছুটতে শুরু করল। এঞ্জিনের শব্দটা বুকের মধ্যে ভরে নিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে সীটের গায়ে হেলান দিয়ে বসল রজত। হাওয়া টানল। মনে হচ্ছে সে যেখানে থেমেছিল ঠিক সেখান থেকেই ছুটতে শুরু করেছে আবার—যেভাবে ছুটছে তাতে তিন-চার মিনিটের বেশী লাগবার কথা নয়। একটু বাড়াবাড়ি হলো হয়তো—প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে ওই-ভাবে দৌড়নো, কিংবা, ওই পায়ে ধরার কথাটা, সত্যি, হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কেন! বলেছে আসবে না, তবু, যদি আসে, অপেক্ষাও কি করবে

না একটু! কী হতো দশ মিনিটের একটু ওদিকে গেলে? কুড়িদিন, না একুশ দিন? এতোদিনই যদি অপেক্ষা করতে পেরে থাকে, তাহলে আর কয়েক মিনিটের দেরিতে কী এমন ক্ষতি হতো!

জানি না, জানি না কেন! গতির হাওয়ায় সর পড়তে শুরু করেছে গালে। আরও একটু এলিয়ে বসে মনে মনে বলল রজত, শুধু বুঝতে পারছি, তোকে আমার দরকার, ভীষণ দরকার। মনে হচ্ছে তোর সংগে দেখা হবে বলেই বেঁচে উঠলাম আমি—একবারও না-দেখতে আসার অপমান সহ্য করেও এখনো ছুটছি তোর দিকে! বোকা, পাগল, যে যা ইচ্ছে ভেবে নিক আমাকে টুপুর, তুই আয়। তুই আসবিই। আমি তোকে চিনি, তুই না এসে পারবি না।

'এই যে, ব্যাস, এইখানে—।' রাস্তার ওদিকে দেখা যাচ্ছে লাল ডাকবাক্সটা। নোটটা আগেই বের করে রেখেছিল রজত, ব্রেক কষার শব্দে হাত টান করে বাড়িয়ে দিল। খুচরোটা না নিয়েই দ্রুত কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। ঘড়ি দেখল। দশ মিনিট। ঠিক দশ মিনিট। দশ মিনিট পরে দাঁড়িয়ে দশ মিনিট আগে শোনা গলাটায় কান পাতল রজত। ক্লান্ত, অস্ফুট, ইচ্ছাহীন সেই স্বর কিছুই দিল না তাকে।

ডাকবাক্সের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে টুপুরদের বাড়ির রাস্তা। ওই রাস্তায় এমনিতেই লোক হাঁটে কম; বিকেল সদ্য বলেই হয়তো এখন একেবারে ফাঁকা। বড়ো রাস্তায় এখনো রোদ থাকলেও ওখানে নেই—গোটা রাস্তাটা নম্র হয়ে আছে দোতলা তিনতলা বাড়ির ছায়ায়। খরখর শব্দ তুলে উড়ে যাচ্ছে কাগজের ঠোঙা, সেই শব্দে উড়ে যাচ্ছে দু'তিনটে শালিক। ফাঁকা রাস্তাটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক হাতে একটা সিগারেট ধরাল রজত। বুঝতে পারল না এতক্ষণের ছুটোছুটি কী দিয়েছে তাকে! শুধু, নিঃশ্বাসটাকে সহজ করতে করতে অনুভব করল, সে ক্ষয়ে যাচ্ছে—ভেঙে যাচ্ছে ক্রমশ। রাস্তা থেকে ফুটপাথে উঠে দাঁড়িয়ে লাল ডাকবাক্সটার গায়ে আস্তে হাত রাখল রজত। অপেক্ষা আগেও করেছে, এইখানে, ঠিক এই-ভাবে—ডাকবাক্সটার গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু ভাঙার অনুভূতিটা নতুন। শুধুই বন্ধুত্ব কি দিতে পারে এতোটা?

আশ্চর্য সুখকর এক শীতে সিরসির করছে সারা গা। মন জুড়ে থম। নতুন-পাওয়া চাদরের মতো আরও অনেকটা সময় অনুভূতিটা জড়িয়ে রাখল রজত, জড়িয়েই থাকল। এখন আর কোনো তাড়া বোধ করছে না সে। একটু আগেই ছিল পাগলের ছুটোছুটি—সময় থেকে মুহূর্তগুলির দ্রুত হারিয়ে যাওয়া। তার দাঁড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে থমকে দাঁড়িয়েছে সময়ও, যা নিয়েছিল তার সমস্তই ফিরিয়ে দিচ্ছে একে একে। স্মৃতি গন্ধ নিচ্ছে স্মৃতির, কথা কথার। একই চোখ কান হাত মুখ বিভিন্ন ভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন খুঁজছে রূপ। ভাষায় ঢুকে পড়ছে কণ্ঠস্বরের বদল। সবই আলাদা আলাদা করে

চিনতে পারে রজত—অসংখ্য চিঠিভর্তি ডাকবাক্সের মতো ঠাসা লাগে বুকটা। ভারী হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস। অপেক্ষা করতে করতেই অন্যমনস্ক, রজতের মনে হলো বহুকাল এইভাবে এইখানে দাঁড়িয়ে আছে সে—থাকবে, আরও বহুদিন!

অন্যমনস্কতার মধ্যেই লক্ষ করল ছায়া পড়েছে ডাকবাক্সের সামনে—উঠে এসে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে তার নিজের ছায়ায়। ছায়াটাই চিনিয়ে দিল। অনেক শব্দ আর নিঃশব্দের মধ্যে থেকে কথাটা চিনে নিল রজত।

'এলাম—'

টুপুরের গলা। একটু ভাঙা, একটু জড়ানো—ঘুম কিংবা দুঃখের জের লেগে আছে এখনো। মুখ তুলে তাকাতেই গোড়ার কথাটা হারিয়ে ফেলল রজত। তবু, ওই শাড়িটা সে চিনতে পারছে, পিকনিকের দিন পরেছিল। ওই ব্লাউজটাও। চটিটা অন্য—যেন ভুল করে পরে এসেছে। কিছু বলার আগে পা থেকে আস্তে আস্তে টুপুরের মুখের ওপর চোখ নিয়ে গেল রজত। চোখের তলায় ওই ছায়াটাও ছিল না সেদিন। চাহনিটাও এমন ছিল কী!

তাকাবে না ভেবেও যেন অনিচ্ছা নিয়ে রজতের মুখের দিকে তাকাল টুপুর- তাকিয়েই থাকল। দৃষ্টি যতোটা পারে তার বেশী এগোতে গিয়েও থেমে আছে মণি দুটোয়। জিজ্ঞেস করল না কিছু। তারপর চোখ নামিয়ে বলল, 'ডেকেছিলি কেন?'

'বলছি—।' রজত বলল, 'বলব।' এইমাত্র পরের কথাটা খুঁজে পেল সে, 'দুর্গাপুর থেকে ফিরলি কবে?'

'অনেকদিন—।' হাতদুটো নাভির নীচে এক করা। আঙুলে আলগা হয়ে ঝুলে আছে ব্যাগটা। চোখ ডাকবাক্সের দিকে। টুপুর বলল, 'ওরা তো সবই জানে। বলেনি?'

রজত মাথা নাড়ল। ওরা তোর কতোটুকু জানে! আমি জানি। আমি সব জানি। যা জানতাম না, আজ তাও জেনে গেছি। তবু অচেনা লাগছে। টুপুর, আমার ভালো লাগছে না কিছু। দুদিনের নাম করে যেভাবে চলে গিয়েছিলি একদিন, ঠিক সেইভাবে ফিরে আয়।

সময় থেমে আছে। এখনো। শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে অবুঝ জ্বালা। রজত অনুভব করল বাল্‌বের ছেঁড়া তারের মতো কিছু একটা কাঁপতে শুরু করেছে তার বুকের ভিতরে। রাগ কিংবা দুঃখ বুঝতে পারে না, তবে এই অনুভূতিটাও সে চেনে। এক্ষুনি অন্য কিছু না হলে ফেটে পড়বে।। অনুভূতিটা চাপা দেবার জন্যে এলোমেলো গলায় রজত বলল, 'কী হয়েছে তোর, টুপুর?'

'জানি না—'

এখন রাস্তা দেখছে। সামনে রজত নেই. যেন সম্মুখহীন শূন্যতায় চোখ মেলে সেও অপেক্ষা করছে কারও জন্যে। কার জন্যে!

বুক ভারী হয়ে ওঠায় নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার তুলে নিল রজত। একটা

ম্যানিকিনকে ওই শাড়ি জামাগুলো পরালে এখন সেও দাঁড়াত একই ভঙ্গিতে, কথা বলত টুপুরের গলায়। আগে প্রায়ই বলত, আমি কি তোর কেনা! চলে যেতে বললে চুপচাপ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বাসস্টপে। কেনা না হলেও রজতের মনে হতো, কবে যেন নিজেই একটা লেবেল এঁটে নিয়েছে টুপুর। নিজেই দাঁড় করিয়ে রাখত নিজেকে। এই মুহূর্তে রাগটা এলেও কথাগুলো হারিয়ে ফেলল সে। কুড়ি একুশ দিনের দূরত্ব জোরটা কমিয়ে দিয়েছে অনেক—উধাও হয়ে গেছে বাসস্টপগুলো। এখন যদি যায়, আর ফিরবে না।

অন্ধকার হাতড়ে একটা পুরনো কথা কুড়িয়ে নিল রজত। প্রায়ই বলত। বলল, 'অমন প্যাঁচার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন! এদিকে তাকা—?' বলতে বলতে থেমে গেল। তারপর বলল, 'আমার কী হয়েছিল জিজ্ঞেস করবি না?'

চুপচাপ থেকে হঠাৎ চোখ তুলল টুপুর। এক মুহূর্ত। এক পলকের জন্যে ওর টলটলে চোখদুটো দেখতে পেল রজত। তারপরেই দেখল, মুখ ফিরিয়ে হঠাৎই দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত, হাঁটতে শুরু করেছে টুপুর। ঠিক বুঝল না কেন! তারপর, কিছু না ভেবেই ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেল সে।

পুরোপুরি বিকেল। খানিক আগেও যেটুকু তাপ ছিল রোদে, অলক্ষ্য থেকে হাওয়া এসে কখন শুষে নিয়েছে তা। এখন বহে যাচ্ছে এলোমেলো। নির্জনতা থেকে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে রাস্তা, ক্রমশ কাছে টেনে নিচ্ছে চেনাশোনা শব্দ ও দৃশ্যগুলো। ফুটপাথে ভিড়। এরই মধ্যে দিয়ে বৈচিত্র্য-ও-তারতম্যহীনভাবে হেঁটে যাচ্ছে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। হাঁটার ধরনে তাদের আলাদা করার উপায় নেই কোনো। ওই ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছে আবার—কিছু বলাবলি করে বেঁকে গেল ট্রামস্টপের দিকে। এখন দাঁড়িয়ে আছে, দু'জনের মধ্যে দূরত্ব এক হাতের বেশী নয়। ট্রাম এলো। বিকেলের ট্রাম প্রায় খালি, ফিরে আসবে গাদাগাদি ভিড় নিয়ে। মেয়েটি আগে উঠল, তারপর ছেলেটি। ওরা পাশাপাশি বসল। নিঃশব্দে। ট্রাম লাইন ধরেই চলে। থামে, আবার চলে। অল্প ম্লান হয়ে যায় বিকেলের আলো।

পাশে রজত, তবু একা-একা রাস্তা দেখছে টুপুর। গন্ধটা লেগে আছে নাকে। সাধারণ গন্ধ, তবু কতো আদরের! কাঁধে ছুঁয়ে যাচ্ছে কাঁধ—এতোকাল জ্বালায়নি তাই আজও কোনো বিদ্যুৎ জ্বালছে না শরীরে। তবু ভালো লাগছে। ইচ্ছে করে শুধু এইভাবে কাছাকাছি বসে থাকতে; এইভাবে, নিঃশব্দে, চলে যেতে অনেকদূর। ইচ্ছে করে ওই হালকা ছোঁয়াটুকু অনুভব করতে সারাক্ষণ। কেমন ছেলে দ্যাখো! সারাক্ষণ এতো রাগ পুষে রাখে শরীরে, আক্রোশে গুঁড়িয়ে ফেলতে চায় গোটা পৃথিবীটাকে—এই বেঁচে গেল মরতে মরতে, তবু হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এলো কেমন! একটাও রাগের কথা বলেনি এখনো। চুপটি করে বসে আছে কাদা হয়ে—যেন

সব দোষ তারই! ইচ্ছে করে ওই কাদায় মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকতে। তা তো হবে না! রাস্তা ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, বাড়িঘরের সীমানা পেরিয়ে ফুটে উঠছে সবুজ। কতোদিনের চেনা রাস্তা, ওই বড়ো বড়ো গাছ আর অফুরন্ত হাওয়ার মধ্যে দিয়ে কতোদিন হেঁটে গেছে দুজনে। পাগলটা প্রায়ই স্যুইসাইড করার কথা বলত—দুঃখ আছে, তবু দুঃখটাকে চিনতে পারত না। ঠিক ঠিক। আর কি কখনো ওইভাবে হাঁটতে পারব পাশাপাশি! তা তো হবে না! কথা ফুরিয়ে গেছে, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে রাস্তা। যদি এই ট্রামেও ফিরে আসে, তাও বেশীক্ষণ লাগবে না। চুপচাপ নেমে যাবে এক-সময়। আর কি দেখা হবে কখনো? লাল ডাকবাক্সটার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে যাবে রজত। সময় চলে যাচ্ছে। শরীরের ভিতর অন্ধকারটা ক্রমশ কালো হয়ে উঠছে আরও। আমি বুঝি, বুঝতে পারি—এই অন্ধকার নিয়ে হাঁটা যায় না। দোষ আমার। দোষ তোর। এতো যে ভালবাসিস, এতো যে চেঁচামেচি তোর, তবু ভালোবাসার কথাটা চেঁচিয়ে বলতে পারলি না কেন! আমি কি সত্যিই এড়াতে পারতাম তোকে! দোষ তোর। আমি যখন থাকব না, জানি, খুব কষ্ট হবে তোর। আর কোনোদিন টুপুরের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না তোকে। রাস্তা তো বদলায় না—ওই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যখন ডাকবাক্সটায় চোখ পড়বে, অন্ধ রাগে ছটফট করবি তুই—ইচ্ছে করবে প্রতিশোধ নিতে। না, মারামারি, খুনোখুনির মধ্যে যাস না আর। চেষ্টা করিস ভুলে যেতে। তবুও যদি মনে পড়ে, তোর শরীরের যতো রাগ আর শক্তি দিয়ে উপড়ে ফেলিস ওই ডাকবাক্সটা—

এতোদিন কাউকে কিছু বলেনি টুপুর। এতোদিন চুপচাপ থেকে নিজেকে একলা করে নিচ্ছিল ক্রমশ। চুপচাপ এগিয়ে যাচ্ছিল সেই দিনটির দিকে, শরীরের অন্ধকার যখন আর ভয় দেখাবে না তাকে—থেকে থেকে ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠবে না শরীর। চুপচাপ. নিঃশব্দে। কাল রাতের অন্ধকারে মাঝঘুম থেকে উঠে তার দিকে চাঁপার নিঃশব্দ চেয়ে থাকা দেখেই আরও বুঝেছে—সময় চলে যাচ্ছে, এইবার চলে যেতে হবে—একা। রজতের পাশে বসে আজও একা—বিশাল ঢেউয়ের মতো আবেগটা ভাসিয়ে দিল তাকে। এখনো বুঝতে পারল না সে কী করেছিল—কেন এমন হলো; এতোদূর সংস্পর্শের মধ্যে থেকেও সব ছেড়েছুড়ে কেন তাকে চলে যেতে হবে!

এমন অসহায়তার মধ্যে আগে কখনো নিজেকে আবিষ্কার করেনি রজত। ট্রাম। আশেপাশে লোকজন। সবই তার অসহায়তা বাড়িয়ে তুলল। ওরই মধ্যে হতচকিত টুপুরের হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সে।

'তুই কাঁদছিস, টুপুর!'

'না—'

জোরে মাথা নাড়ল টুপুর। ঠিক ভেঙে পড়ার মুহূর্তে সামলে নিল

নিজেকে। হাতের উল্টো পিঠে চোখ রগড়ে, সর্দি টানার মতো জোরে নিঃশ্বাস টেনে থামিয়ে দিল সব আবেগ। তারপর হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানে নামব—'

কিছু না বলে ওকে বেরুনোর জায়গা করে দিল রজত। নিজেও উঠল। কোনোদিকে না তাকিয়ে ওর পিছনে পিছনে হেঁটে গেল ফুটবোর্ডের দিকে।

ট্রাম থামবার পর প্রায় ঘোরের মধ্যে দ্রুত হাঁটতে লাগল টুপুর। একটু দাঁড়িয়ে আঁচল বুলিয়ে নিল মুখে। আবার এগোলো। হাঁটার এই ধরনটা তারই, সঙ্গ ধরার সুযোগ করে দেবার জন্যে থেমে দাঁড়াত মাঝে মাঝে। কাছে এসে টুপুর বলত, 'এতো জোরে হাঁটিস!'

'শাড়ি ছেড়ে বেলবটম পর। দেখবি, তুইও পারছিস।'

'বেলবটমের পর কি?'

'বব চুল।'

'তারপর?'

কোমর দুলিয়ে, একটু অঙ্গভঙ্গি করে রজত বলেছিল, 'আমি পারি না। অসিত থাকলে দেখিয়ে দিত।'

'তারপর কি? সিগারেট?'

'খাবি? খা না! দারুণ দেখাবে তোকে—'

অল্পক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে টুপুর বলেছিল, 'না রে, থাক! আমি যেমন আছি তেমনিই থাকব।'

নেই। আজ টুপুরই ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাকে। বার বার। টুপুরই দেখিয়ে দিচ্ছে কোনদিকে যেতে হবে। পায়ে কোনো জোর পাচ্ছে না রজত, ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে শুধু। এমনও হতে পারে এখনো দুর্বলতা কাটেনি শরীরের; তাই, মাথাটাও ছেয়ে আসছে দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে।

তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে টুপুরেব পাশে পৌঁছে গেল রজত। চেনা রাস্তা। সামনে ময়দান। ভিক্টোরিয়া। এরই মধ্যে আচ্ছন্ন হতে শুরু করেছে আলো। হয়তো আর একটু পরেই অন্ধকার নামবে।

'টুপুর, তুই এমন করছিস কেন! কী হয়েছে বল?'

'বললে বুঝবি?' গতি শ্লথ করে একটু যেন স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল টুপুর।

মুছলেও সবটা মোছে না। গালে এখনো লেগে আছে জলের দাগ। চোখের তলায় ছায়াটা ঘন হয়েছে আরও, দৃষ্টি শূন্য। প্রশ্নটা বোবা করে দিল রজতকে।

টুপুর হঠাৎ বলল, 'মেয়ে হলে বুঝতিস!'

তারপর দ্রুত হলো আবার। রজত দেখল, ও এগিয়ে গেছে অনেকটা—যেন ভুলে গেছে তাকে। হাঁটার ধরনে পা দুটো জড়িয়ে যাচ্ছে অল্প। এভাবে কাউকে

হাঁটতে দেখলে ভয় লাগে, মনে হয় পড়ে যাবে এক্ষুনি। তবু কী যেন টানছে টুপুরকে! টানটা আছে বলেই তর সইছে না আর। এইমাত্র বেঁকে গেল ভিক্টোরিয়ার ভিতরে।

অনেকক্ষণ ধরেই ঘোরটা টের পাচ্ছিল রজত, মাথার মধ্যে অশান্তিটা টের পেল এবার। ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দ্রুত টুপুরের কাছাকাছি পোঁছুবার চেষ্টা করল ও। পুকুরটা পেরিয়ে গিয়ে চাপা চিৎকারের গলায় বলল, 'দাঁড়া—।' তারপর এগিয়ে গেল। থেমে দাঁড়িয়েছে টুপুর। চোখে চোখ রেখে রজত বলল, 'যা বলবি স্পষ্ট করে বল। ন্যাকামি ভালো লাগছে না—'

'শুনবি! আমি খারাপ হয়ে গেছি—একটা মেয়ের যতোটা খারাপ হতে পারে—', বলতে বলতে থেমে গেল টুপুর। তারপর কী হলো বোঝা গেল না। হঠাৎই রজতের কাঁধদুটো ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ভাঙাচোরা মুখে টুপুর বলল, 'কী হলো তোর, রজত! ঘেন্না লাগছে না! ইচ্ছে করছে না আমাকে মেরে ফেলতে—!'

বলতে বলতেই আবার পিছন ফিরে মাঠের মধ্যে খানিকটা এগিয়ে গেল টুপুর। এলোমেলো ভঙ্গি। হঠাৎই বসে পড়ে মুখ গুঁজল হাঁটুতে।

গাছগাছালির ওপর রোদ। গাছগাছালির জড়াজড়ির নীচে আড়াল হয়ে গেছে রোদ। ছায়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুজন। দৃশ্যটা মাথায় নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেল রজত। তফাত রেখে বসল। বসে থাকল কিছুক্ষণ হাঁটুতে মুখ রেখে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে টুপুর—গুম, তবু স্বাভাবিক· তুমুল বৃষ্টি থেমে যাবার পর যেমন হঠাৎই নেমে আসে থম। রজত দেখেও দেখল না। অস্পষ্টতার ভিতরে শিখা বউদির পিছনে পিছনে পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ডাক্তারের চেম্বারে। পরিষ্কার গলা মেয়েটির, আমি নিজেই তে বুঝতে পারছি! ঘাসে ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার। ঘুঁষিটা মুখের ওপর পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারটা চিনতে পেরেছিল সে। মৃত্যু আসছে।

অন্ধকারে আড়াল হয়ে যাচ্ছে টুপুরের মুখ। এমন শান্ত, বোঝা যায় না কিছু। হঠাৎই বুকের ভিতরটা চিনচিন করে উঠল রজতের। কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কী? কী? কী? দাঁতে দাঁত ঘষে গেল রজতের একটা সিগারেটের জন্যে হাত ঢোকাল পকেটে, কী ভেবে বের করে আনল আবার।

'কে! সন্দীপ?'

জোরে মাথা নাড়ল টুপুর, সেই একই ভঙ্গি। চোখদুটো দেখা যাচ্ছে না। অস্ফুটে বলল, 'না—'

'তবে?'

'কেন জিজ্ঞেস করছিস এ-সব! আমার ভালো লাগছে না—!'

'বলতে তোকে হবেই—।' রাগে মাটি থেকে গোড়াসুদ্ধ একমুঠো ঘাস

ছিঁড়ে আনল রজত, মুঠোভর্তি হাতটা ছুঁড়ে দিল টুপুরের দিকে।

অল্প সরে গেল টুপুর। অন্ধকারে চোখে পড়ল টান-টান হাতটাকে আবার ঘাসের ওপর ধরে রেখেছে রজত। ভঙ্গিটা চেনা। দেখতে দেখতে শীত এসে গেল শরীরে। আবেগটা উঠে আসছে আবার। জড়ানো গলায় টুপুর বলল, 'অশোক—'

একটু চুপ করে থাকল রজত। তারপর নিষ্ঠুর গলায় বলল, 'অশোক! না তুই নিজেই মারাতে গিয়েছিলি!'

এই মাত্র শব্দ ভেঙে গেল। এমন কি স্তব্ধতাও। ঘাস থেকে ছটফটে হাত তুলে মাথার পিছনের চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরল রজত। অন্ধকারে উঠে আসছে টুপুরের কান্না। নিঃশব্দ বলেই পিঠটা কেঁপে উঠছে অমন। কাঁপুনিটা নিজের মধ্যে টানতে টানতে রজতের মনে হলো নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না--মুখ খুলে গেছে চোয়ালের নীচে ক্ষতটায়, আর অনর্গল বেরিয়ে আসছে রক্ত।

'চুপ কর, টুপুর। তোকে কিছু বলিনি—।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রজত বলল, 'শালা তোকেই দেখেছে, আমাকে চেনেনি! আমি ছাড়ব না--আমিও দেখে নেব। যেখানেই থাকুক, আমি ঠিক খুঁজে নেব—'

'অমন করছিস কেন!' টুপুর হঠাৎ হাতটা টেনে ধরল রজতের, 'আয়, তুই আমার কাছে বোস একটু! যা করার আমিই করব--'

বড়ো ঠাণ্ডা হাত টুপুরের। জুড়োয় না; সর্বাঙ্গ জুড়ে শুধু ছড়িয়ে দেয় ভয়ের মতো একটা কিছু। এই অবস্থায়, অমন ঠাণ্ডা গলায় এতোগুলো কথা কী করে বলতে পারল ও! তবে কি এই কথাগুলো বলবার জন্যেই এতোদিন আড়াল খুঁজছিল টুপুর!

ক্রমশ বসে পড়ে রজত। ক্রমশ নুয়ে পড়ে। রাগটা চলে গিয়ে ক্রমশ একটা অন্ধকার চেপে বসে বুকে। অন্ধকারের ভিতর দিয়েই বহুদূর দেখতে পায় সে। সে-দেখায় রূপ নেই, দৃশ্য নেই কোনো। শুধু পড়ে আছে কার্ফ্যুর রাতের রাস্তা। না, সে বড়ো ভয়াবহ ব্যাপার! সে সহ্য করতে পারবে না।

নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে টুপুর। ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা উঠতে গিয়েও থেমে যাচ্ছে বার বার। দিশেহারার মতো গাছ, ঘাস, ফুটফুটে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ নিঃশ্বাস চাপল রজত। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, কে তুমি? কেন কেড়ে নিতে চাও আমার সবকিছু! কেন বার বার এইভাবে মারছ আমাকে! দ্যাখো আমার দিকে, এখনো শুকোয়নি ঘা। এতো যে মানুষ চারিদিকে, কেন আমাকে তাদের মতো হতে দাও না!

হাহাকারটা ছড়িয়ে পড়ল পাঁজরের খাঁজে খাঁজে। একটা জোনাকি শুধু উড়ে এলো তার চোখের সামনে।

'শোন, টুপুর—', অনেকক্ষণ পরে রজত বলল, 'নিজেকে খারাপ ভাবছিস

কেন! এ-রকম তো কতো মেয়েরই হয় আজকাল!'

টুপুর বসে থাকল। উত্তর দিল না কোনো।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করল রজত। গুছিয়ে নিল নিজেকে। তারপর বলল, 'যা হয়েছে ভুলে যা। এ-সব কিছু না। একটা ছোট্ট অপারেশন করলেই সব সাফ—কেউ টের পাবে না কিছু। সকালে বেরিয়ে বিকেলেই ফিরে যাবি বাড়িতে। কাল তোকে শিখা বউদির কাছে নিয়ে যাবো। ডাক্তার চেনে—'

টুপুর এ-সব কথার কিছু শোনে, কিছুটা ভুলে যায়। মুখ তুলে রজতের দিকে তাকাল সে। কথা বলে যাচ্ছে, শুধু কথা। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ওর ইচ্ছে করল রজতকে ছুঁয়ে দেখতে একটু; আর জিজ্ঞেস করতে, কী দিয়ে তৈরি তুই? কী করে এমন সহজে চলে যাস এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়! ভাবতে ভাবতে শরীরের অন্ধকার থেকে অল্প আলো এসে পড়ল টুপুরের মুখে। ঘাস মাটির গন্ধ থেকে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ও ভাবল, কাল কী হবে জানি না, তার পরে কী হবে—তাও না। তুই যতোই বলিস, হয়তো তোর সঙ্গে দেখা হবে না আর। কিংবা হলেও, এই অন্ধকারটা কি মুছবে কোনোদিন! তবু ভালো লাগছে, রজত, অনেকদিন পরে ভালো লাগছে আমার। তোকে দেখাতে পারব না, একটা পাথর যেন নেমে যাচ্ছে বুক থেকে!

আর একটু পরেই নির্জনতা থেকে আলোয় উঠে এলো ওরা। আরও কিছুটা হাঁটল। কেউই কথা বলল না কোনো। তারপর আরও কিছুটা এগিয়ে রজত বলল, 'ট্যাক্সি চড়বি নাকি?'

'না—'

'না কেন!'

রাস্তার মাঝখানেই ব্যাগ খুলে আঁতিপাতি করে কী খুঁজছে টুপুর। বলল, 'টাকা নেই। সবই ভুলে যাই কেমন!'

'তোর পয়সায় ট্যাক্সি চড়ব কেন!' বুক-পকেটের ওপর এক মুহূর্ত হাত ছুঁইয়ে রেখে রজত বলল, 'হাঁটতে পারব না বলে কাকীমার কাছে ধার নিয়েছিলাম। সেই হাঁটালি!'

ভারটা কমে গেছে, তবু আলোয় এসে লজ্জা লাগছে কেমন। রজত যেন তার অনেকটাই দেখে নিল আজ। আনমনে বুকের ওপর আঁচলটা টেনে নিতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো টুপুরের, আর একটু এগোলেই সেই নার্সিংহোমের রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে একদিন ভোরে একটি তারাকে খসে পড়তে দেখেছিল সে, হঠাৎই চিনতে পেরেছিল নিজেকে। আজ আকাশে অনেক তারা। এখনো চিনছে।

চোখের কোণদুটো অল্প সিরসির করে উঠল টুপুরের। জবাব দিল না।

একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। থামাল রজত। টুপুরকে উঠতে দিল আগে। দূরত্ব বাঁচিয়ে বসে তাকিয়ে থাকল সামনের রাস্তা, লোকজন, গতির দিকে।

তারপর কী মনে পড়ায় ভাঙা চোয়ালটার ওপর হাত বুলিয়ে বলল, 'কতোদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হলো, টুপুর!'

টুপুর জবাব দিল না। জবাব না দিয়েই চোখ তুলে সরে এলো কাছে। তারপর হঠাৎই আগল খুঁজে মুখটা নামিয়ে আনল রজতের বুকে। চোখ নাক ডুবিয়ে নিঃশ্বাস ছুঁইয়ে রাখল শুধু।

'আ-রে! কী করছিস!' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে নড়ে উঠল রজত, 'দেখছে! পাবলিক দেখছে—'

'দেখুক। যে খারাপ তাকে খারাপ ভাবলে কিছু হবে না।' মুখ না তুলেই একটু থেমে বলল টুপুর, 'এতো মারামারি করিস কেন! কোনদিন মরে যাবি!'

কথাগুলো কানে নিল না রজত। প্রায় চব্বিশ বয়স হলো—এতোদিন রাগ চিনেছে, দুঃখ চিনেছে। লজ্জা চেনেনি। ভালো লাগার এই সংস্পর্শটুকু বাঁচিয়ে রেখেও অস্বস্তিতে ছটফট করে পিছনে তাকাল ও। মনে হলো গোটা রাস্তা তার সবকিছু নিয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। ইস্!

ওই যে, দেখা যাচ্ছে ওদের—ওই ট্যাক্সিটায়। না। এইমাত্র হারিয়ে গেল আবার। চারিদিকে এতো ভিড়!

—